সংস্কার সংলাপ

সূচনা সূত্র

রাষ্ট্র, সংবিধান ও শাসন-প্রশাসন

ড. তোফায়েল আহমেদ

বই পরিকল্পনায় : গ্রন্থিক প্রকাশন
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া (প্রিন্টিং প্যাকেজার)

সংস্কার সংলাপ

সুচনা সূত্র

রাষ্ট্র, সংবিধান ও শাসন-প্রশাসন

ড. তোফায়েল আহমেদ

প্র কা শ ন

সংস্কার সংলাপ (সুচনা সূত্র):
রাষ্ট্র, সংবিধান ও শাসন-প্রশাসন

তোফায়েল আহমেদ

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩; মাঘ ১৪২৯
প্রকাশক : গ্রন্থিক প্রকাশন
১১০ আলিজা টাওয়ার (৪র্থ তলা), ফকিরাপুল
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০১৫৮১ ১০০ ০০১, ০১৬৭৬ ৩১৩ ৯৫৭
প্রচ্ছদ : রাজ্জাক রুবেল
অনলাইনে পেতে : www.gronthik.com
ISBN : 978-984-96794-8-6

Sangskar Sanglap (Suchana Sutra)
By : Tofael Ahmed

Publisher : Gronthik Prokashon
Price : **614 ৳ or 714 ₹**
E-mail : pandulipi@gronthik.com

[No part of this book may be reprinted, photographed, photocopied, recorded or reproduced in any from without the written consent of the copyright holder and publisher.
Printed & Bound in the People's Republic of Bangladesh.]

উৎসর্গ

মুখবন্ধ

বহু গ্রন্থের রচয়িতা শিক্ষাবিদ ও শাসন বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ তাঁর সুলিখিত 'সংস্কার সংলাপ' গ্রন্থের মুখবন্ধ আমাকে লেখার দায়িত্ব দেওয়ায় আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। তাঁর নিজের ভাষায় বইটিতে 'চারটি বৃহত্তর বিভাজনের সংস্কার-এর বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম গুচ্ছে পাঁচটি বিষয় অবতরণা করা হয়েছে। প্রথম দুইটি বিষয় হচ্ছে বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে আনুপাতিক বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন পদ্ধতি (Proportional Representation) চালু করা প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে— এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ ব্যবস্থার বদলে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রবর্তনের প্রস্তাব।'

অন্য তিনটি বিষয় হচ্ছে— 'যথাক্রমে জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি, দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোকে রাষ্ট্রপতি সরকারের আদলের স্থলে সংসদীয় কাঠামো রূপান্তর করে একটি একক সিডিউলে সব স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা ও সর্বশেষে অনুপস্থিত, অক্ষম এবং প্রবাসী ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সহজ করার জন্য পোস্টাল ব্যালট সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।'

বইটিতে দ্বিতীয় গুচ্ছে মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক ৭টি প্রবন্ধ, তৃতীয় গুচ্ছে সরকারের নির্বাহী বিভাগের নানা নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে আটটি প্রবন্ধ এবং শেষ গুচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক সাতটি রচনা স্থান পেয়েছে।

সারাবিশ্বে যখন গণতন্ত্রের সংকট চলছে— বিগত পঞ্চাশ বৎসরেও নব্য স্বাধীন বাংলাদেশ যখন নির্বাচনের মতো জরুরি বিষয়েও কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করতে পারেনি, তেমনি একটি সময়ে এই বিরল বইটি জাতিকে নতুন দিক নির্দেশনা দিবে— এটাই প্রত্যাশা।

বইটির ভূমিকায় প্রথম বাক্যটি হচ্ছে 'রাষ্ট্র ও শাসন সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া।' বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের এ প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত হয়—১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। ঐ দিন জাতি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মুজিবনগরের আম্রকাননে ঘোষণা করে। ঐ ঘোষণায় নতুন রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলা হয়েছিল—'In order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity, and social justice.' ঐ ঘোষণাপত্রটি আমাদের শাসনতন্ত্রে ৭ম তফসিলে স্থান পেয়েছে। এটাই জাতির কাছে জাতির চুক্তি। যার প্রবক্তা ছিলেন, প্রাচীন গ্রিক. সফিস্টরা এবং পরবর্তীতে Thomas Hobbes, John Locke, এবং বিশেষভাবে Jean Jacques Rousseau প্রমূখ রাজনৈতিক দার্শনিকরা।

গ্রন্থকারের ভাষায়—'চলমান নির্বাচন পদ্ধতি যা মেজরিটারিয়ান বা First Past The Post (FPTP) system নামে পরিচিত এবং এ পদ্ধতির নির্বাচনই আইন সম্মতভাবে বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতেই ১৯৭০-২০১৮ পর্যন্ত ১২টি সংসদীয় নির্বাচন, প্রায় ৮ বা ৯টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, এবং অসংখ্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো জাতীয় বা স্থানী নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে তা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। ...এর মধ্যে শুধু ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ের চারটি নির্বাচন ছিল একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ঐ চারটি নির্বাচন একটি ভিন্নতর ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভিন্ন একটি ব্যবস্থায় ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে সে ব্যবস্থা আর বলবৎ নেই। যদিও প্রবল জনদাবি আছে, কিন্তু কখন, কীভাবে হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। অপরদিকে নির্বাচনে সনাতনী ব্যবস্থাপনাগত রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত সীমাবদ্ধতা যা ছিল তা এখন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এখন নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন না করে শুধু ব্যবস্থাগত ত্রুটি সারিয়ে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জন করা দুরূহ হবে। তাছাড়া বিদ্যমান সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা বিশ্বের প্রায় ৮৭টি রাষ্ট্র সংস্কার করে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সমতাভিত্তিক, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ সব প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বর্তমানে অনুসৃত সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নির্বাচন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশটি বিবেচনার আহ্বান জানানো হচ্ছে।'

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, বর্তমান ব্যবস্থায় ১৯৯১ সালের ভালো নির্বাচনেও 'এ নির্বাচনে সরকার গঠনকারী দল বিএনপির প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩০.৮১ শতাংশ ও আসন সংখ্যা ছিল ১৪০ বা ৪৬ শতাংশ। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোট ছিল, ৩০.০৮ ও আসন প্রাপ্তি ছিল ৮৮ বা ২৯ শতাংশ। ...সার্বিকভাবে

বিএনপি ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭০ শতাংশ ভোটারের বিপরীতে ১৯৯১ সনে শাসন অধিকার লাভ করে।'

একইভাবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে, 'এ নির্বাচনে ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ ১৪৬ (৪৯%) টি আসন অধিকার করে সরকার গঠন করে।'

'২০০১ ও ২০০৮-এর নির্বাচনে সরকার গঠনকারী বিএনপি ৪০.৯৭ শতাংশ এবং ২০০৮ সনে আওয়ামী লীগ ৪৮.৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে।'

দেখা যাচ্ছে—বর্তমান পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠঅংশ সরকার গঠনে কোনো ভূমিকাই রাখতে পাচ্ছে না। সংখ্যালঘিষ্ঠরা সংখ্যাগরিষ্ঠকে শাসন করছে। এটাকেই John Stuart Mill-এর (যার উদ্ধৃতি বইয়ে দেওয়া হয়েছে) ভাষায়—

> 'Contray to all just government, but, above all, contrary to the principle of democracy which professes equality as its very root and foundation.'

আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় তাই 'Equality' কে রাষ্ট্রের 'Foundation' করা হয়েছে। একটি দেশের ৭০ বা ৬০ ভাগ মানুষকে দেশ শাসন থেকে বঞ্চিত করার চেয়ে আর বড় অবিচার কী হতে পারে। অথচ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় আমরা 'Social Justice' কে রাষ্ট্রের 'Foundation' বলেছি।

এমন একটি অবস্থাকে Howard Zinn তাঁর '*A People's History of the United States*' গ্রন্থে Crisis of Democracy বলতে গিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন—

> President Bill Clinton was reelected in 1996 with a distinct lack of voter enthusiasm. As was true in 1992 (when 19 percent of the voters showed their distaste for both parties by voting for a third-party candidate, Ross Perot), the electorate was clearly not happy about its choices. Half of the eligible voters stayed away from the polls, and of those who did vote, only 49 percent chose Clinton over his lackluster opponent, Robert Dole. One bumper sticker read: 'If God had intended us to vote, he would have given us candidates.'

'সংস্কার সংলাপ'-এর লেখক উক্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। Proportional Representation পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণার প্রতিফলন ঘটেছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের ৮৭টি দেশে এ পদ্ধতিটি কাজ করছে। এমনকি ১৯৭৭ সালের 'The Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka' তে দেখতে পাচ্ছি—তারা এ পদ্ধতিটি

তাদের সংবিধানে ৯৯ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছে। এ পদ্ধতির ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে Karl Loewenstein তাঁর বিখ্যাত '*Political Power and the Governmental Process*' গ্রন্থে লিখছেন—

> 'While the electorate was confined to the upper strata of a relatively homogeneous society, the straight majority technique worked tolerably well. With the advent of mass democracy, it revealed a glaring injustice: the winner takes all, the loser gets nothing. Minorities are discriminated against to the point of being disenfranchised. The remedy was sought in proportional representation, which, at long last, recognized the facts of political life, namely, that elections are operated by the political parties. By theoretical logic, proportional representation is beyond challenge: each party should obtain the number of seats equivalent to the number of votes cast for it in the entire nation.'

তবে এ পদ্ধতির অমঙ্গলের দিকটি তুলে ধরে বলেছেন যে, এর দ্বারা যত না রোগের নিরাময় হয়; তার চেয়ে নতুন রোগের সৃষ্টি হয় বেশি। আমাদের গ্রন্থকারও এ পদ্ধতিটির অপকারিতা সম্বন্ধে তার সাহসিক স্বীকৃতি দিতে ভুলেননি। বলা হয়—'মঙ্গল, অমঙ্গলের নিদান' অমঙ্গলকে তাড়িয়ে দিলে মঙ্গল সমেত উড়ে যাবে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করবে, বিশেষ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, তার ইতিহাস, সদিচ্ছা এবং প্রায়োগিক দক্ষতার উপর। আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটাকে অবশ্যই অনুসরণ করার সুযোগ রয়েছে।

লেখকের দ্বিতীয় প্রস্তাবনা অর্থাৎ এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের পরিবর্তে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রবর্তনের প্রস্তাবও এখন প্রায় জাতীয় দাবি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ধারণা সুপ্রাচীন। ঐতিহাসিক Plutarch জানাচ্ছেন, আইনবেত্তা Solon এই Upper Chamber-এর জনক। Solon খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩০-৫৬০ সময়কালে এথেন্সবাসীর অনুরোধে তাঁর বিখ্যাত '*আইনকোষ*' উপহার দেন। ড্রাকনের দেওয়া আইনের মাধ্যমে নির্যাতিত হওয়ার পর তারা এ নতুন কোডের মাধ্যমে দেশে সুশাসন ফিরে পায়। Solon দ্বিতীয় Chamber-এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। Plutarch এর মতে—

> 'That the state with its two councils should ride, as it were, at double anchor and should therefore be less exposed to the buffeting of party politics and better able to secure tranquility for the people.'

Solon-এর প্রজ্ঞা, বিভিন্ন জাতি গ্রহণ করেছে। আমেরিকার সিনেট এবং ভারতের রাজ্যসভা ইতিহাসে তাদের যোগ্য ভূমিকা রেখেছে। আমাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অবশ্যই একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রয়োজন। লেখকের প্রস্তাবটি জাতি গ্রহণ করবে এটাই প্রত্যাশা।

'পোস্টাল ব্যালট' সম্বন্ধে লেখকের ব্যাখ্যা সুচিন্তিত। আমাদের বৈদেশিক আয়ের একটি বিরাট অংশ আসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কষ্টসাধ্য অর্জন থেকে। তাছাড়াও সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ দল দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশনে কাজ করার কারণে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে না। এ উভয় শ্রেণি ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত। ন্যায়বিচারের দাবি হচ্ছে, তাদের এ অধিকার প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা। পোস্টাল ব্যালট অবশ্যই সময়ের দাবি।

মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে লেখক নিজেই একজন গবেষক এবং প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং এ বিষয়ে তুলে ধরা ব্যাখ্যা সুলিখিত এবং দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল। জাতির কল্যাণে এ প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি।

বইটি সুলিখিত এবং প্রাঞ্জল। বইটির ব্যাপক প্রচার এবং প্রয়োগ কামনা করছি।

বিচারপতি এম এ মতিন

ভূমিকা

রাষ্ট্র ও শাসন সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে তার পিছনে কোনো না কোনো স্বার্থ গোষ্ঠীর চাপ, তাপ, সচেতন উদ্যোগ, প্রভাব-প্রণোদনা সর্বোপরি নাগরিক দাবি এবং বাজনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক দলসমূহের দৃঢ় ইচ্ছা থাকতে হয়। বাংলাদেশের সাংবিধানিক পরিবর্তন, সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সরকারি নীতি পরিবর্তনের বিষয়গুলো দেখলে দেখা যায় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণির ভেতর থেকে একান্ত নিজেদের প্রয়োজনে তা করা হয়। যেমন সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি কিংবা বহুদলীয় থেকে একদলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর, পুনরায় বহুদলীয় ব্যবস্থা ও সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন এসবে জনগণের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হলে প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুব বেশি ছিল না। নব্বইয়ের দশকে নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার প্রবল আন্দোলনে ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার’-এর একটি কাঠামো সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়, তার পিছনে দীর্ঘ সংগ্রাম ছিল। পরপর তিনটি জাতীয় নির্বাচন এ ব্যবস্থাধীনে করার পর তা সংবিধানের আর এক সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। তবে প্রথম থেকে সংবিধানের সংশোধনীগুলোর পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সব সময় শাসক দল বা গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রয়োজন থেকে সংশোধনীগুলো করা হয়েছে। এখন আবার সে পূর্বাবস্থায় তথা তত্ত্বাবধায়ক বা নির্বাচনকালীন সরকারে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন চলছে। এসব পরিবর্তনের যে বৃত্তাকার পরিভ্রমণ বা একই বৃত্তে ঘুরপাক এটা যে শুধুই নির্বাচনকেন্দ্রিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু নির্বাচন ছাড়াও রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় অনেক কার্যকর পরিবর্তন, প্রয়োজন সুশাসনের জন্য নানা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। দীর্ঘ মেয়াদে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের নানা বিষয়গুলো সকল সময়ে অধরা, অনাবৃত ও অনালোচিত থেকেই যাচ্ছে। নির্বাচনের পর নব গঠিত সরকারগুলো পুরোনো কায়দার শাসন ব্যবস্থা সাজিয়ে নেন। এটিই যেন জাতির নিয়তি।

ভালোমন্দ নির্বাচন হয়। কখনও ক্ষমতার পালাবদল হয়। কখনও হয় না। কিন্তু

সুশাসন, স্ব-শাসন এবং জনস্বার্থে রাজনীতি, শাসন ও সরকারে যে সব বিষয়ে উত্তরণ ও উন্নয়ন দরকার রাজনৈতিক শ্রেণির সে সব বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। ২০০৫-২০০৮, এ সময়ে 'সংস্কার' এর এক প্রবল ঝড় এসেছিল। সংস্কারের সঙ্গীতে আকাশ বাতাস মুখরিত ছিল কিছুদিন। ২০০৮-এর নির্বাচনের পর সে ঝড় থেমে বাতাস উল্টো দিকে বইতে শুরু হলো। 'সংস্কার' ও 'সংস্কারবাদী' একটা ঘৃণ্য রাজনৈতিক গালি হয়ে উঠল। ২০১১ সনের মধ্যে নতুন সাংবিধানিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হয় এবং সংবিধান ও রাষ্ট্র বিষয়ক সকল চিন্তা পুরোপুরি একটি ভিন্নতর সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

২০২১-২০২২ থেকে সংস্কারের নানা প্রসঙ্গ নানাভাবে পুনরায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রাজনীতি মূলত এখনও নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিয়েই আবর্তিত। তবে বুদ্ধিজীবী বলতে যাদের বোঝায় তাদের একটি বড় অংশ শুধু অর্থনৈতিক ইস্যু যেমন— মূদ্রা, ব্যাংক, ট্যাক্স, অর্থপাচার, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানি ইত্যাদির মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয়গুলো সামনে আনে না বা আনতে সংকোচ বোধে আড়ষ্ট থাকে। কখনও আসলে তা আবারও নির্বাচনের চোরাগলিতেই ঢুকে পড়ে। তাই পুরোনো কিছু শাসনতান্ত্রিক প্রসঙ্গএখানে নতুনভাবে অবতারণা করা হলো।

এখানে চার পৃথক গুচ্ছে চারটি বৃহত্তর বিভাজনে সংস্কারের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম গুচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম দুটি বিষয় হচ্ছে বর্তমান সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে আনুপাতিক বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন পদ্ধতি (Proportional Representation) চালু করা প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ব্যবস্থার বদলে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রবর্তনের প্রস্তাব। এই দুটি বিষয়ে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য হলে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে। পরের তিনটি বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে না, কিছু বিদ্যমান আইনের পরিবর্তন এবং শাসন বিধি সংস্কার করলেই করা সম্ভব। সে তিনটি বিষয় হচ্ছে যথাক্রমে জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি, দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোকে রাষ্ট্রপতি সরকারের স্থলে সংসদীয় কাঠামোয় রূপান্তর করে একটি একক সিডিউলে সব স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা ও সর্বশেষে অনুপস্থিত, অক্ষম এং প্রবাসী ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সহজ করার জন্য পোস্টাল ব্যালট সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয় গুচ্ছে মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধ, তৃতীয় গুচ্ছে সরকারের নির্বাহী বিভাগের নানা নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে আটটি প্রবন্ধ এবং শেষ গুচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক সাতটি রচনা স্থান পেয়েছে। ধরতে গেলে প্রতিটি রচনাই স্বতন্ত্র এক একটি স্বতন্ত্র মৌলিক চিন্তাকে

আশ্রয় করে বিকশিত। প্রথম চারটি রচনার সাথে চারটি দীর্ঘ পরিশিষ্ট যুক্ত করা হয়েছে। এ চারটির তিনটি পরিশিষ্ট আকারে মূল ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে। রাজনীতি বিজ্ঞান ও প্রশাসনের শিক্ষার্থীদের কাজে লাগতে পারে। সংস্কার যদিও বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় বিষয় নয়, তবুও আশা করি সংস্কার নিয়ে চিন্তা যারা করছেন বা ভবিষ্যতে করবেন তারা কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন।

সংস্কার সংলাপের প্রথম পাঁচটি বিষয় নিয়ে 'ইনিশিয়েটিভ ফর দ্যা প্রমোশন অব লিবারেল ডেমোক্রেসি' ২৫ ফেব্রুয়ারি একটি গোল টেবিল বৈঠক করেছেন এবং সুজন প্রথম গুচ্ছের শেষের বিষয় 'পোস্টাল ব্যালট' নিয়ে ২ মার্চ ২০২৩ ভোটার দিবসের আলোচনায় বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। *দৈনিক প্রথম আলো* ২ মার্চ ২০২৩ পোস্টাল ব্যালট বিষয়ক লেখাটির অংশবিশেষ সম্পাদকীয় পাতায় ছেপেছেন। সে জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি এম. এ. মতিন অনুগ্রহ করে এ বইটির একটি মূল্যবান মুখবন্ধ লিখে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. আমীর মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বইটির আলোচনায় তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। তাঁকে আমার প্রাণঢালা শুভাশীষ।

বইটির নানা পর্বে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কালে কোস্ট ফাউন্ডেশনের আইসিটি শাখার মোহাম্মদ আবারুল ইসলাম ও শাহরুল হোসেন সাগর, টাইপ ফরমেটে এবং একটি ওয়েভ পেইজ তৈরি করতে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রভা অরোরার প্রধান নির্বাহী স্নেহাস্পদ বিধান চন্দ্র পাল যথারীতি আমার পূর্বের সব বইগুলো প্রকাশে নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এবারও গ্রন্থিকের সাথে যোগাযোগও তিনিই করেছেন। ব্যবসায়িক দিক না ভেবে গ্রন্থিকের প্রকাশক রাজ্জাক রুবেল পাণ্ডুলিপি দেখার আগেই প্রকাশে রাজি হয়ে গেছেন। আমি এ দুইজনের কাছে সকল সময়ের জন্য ঋণী।

পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসাবে এ বইটি আমার নাতনি শাজফা বিনতে সরওয়ারের হাতো দিলাম। সে এখনও পড়তে শিখেনি, কিন্তু সর্বক্ষণ আমার পড়ার ঘরে ঘুর ঘুর করে। বইপত্র ওলট-পালট করে। বইটির সংস্কার প্রস্তাবগুলোর কোনোটি কখনও গৃহীত হলে সে প্রজন্মের কিছু উপকার হতে পারে।

বইটির নানা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সচেতন। কিছু সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যেত। সময় ও সম্পদ তাতে বাঁধা। তাই সবার ক্ষমাসুন্দর উদারতা প্রার্থনা করি।

তোফায়েল আহমেদ

সূচিপত্র

প্রথম গুচ্ছ

বাংলাদেশের পূর্ণ গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র, সংবিধান, শাসন-প্রশাসন ও নির্বাচন বিষয়ে পঞ্চশীলা সংস্কার প্রস্তাব

- আনুপাতিক বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন
- দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন
- বি-কেন্দ্রিকরণের জাতীয় নীতি প্রণয়ন
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার : একক তপসিলে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন
- পোস্টাল ব্যালট : অনুপস্থিত, এন.আর.বি. ও প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ

দ্বিতীয় গুচ্ছ

স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসন

- স্থানীয় সরকার : প্রেক্ষিত ও প্রক্ষেপণ
- স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসন : দ্বৈত শাসন আর নয়, চাই একীভূত শাসন কাঠামো
- তুলনামূলক স্থানীয় সরকার : ভারত ও বাংলাদেশ
- মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার
- জেলা পরিষদ কেন খুঁজে পাওয়া যায় না
- উপজেলা পরিষদ জটিলতার অবসান চাই
- গ্রামে হবে সালিশ, উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ আদালত হউক

তৃতীয় ভাগ

সরকারের জন্য কিছু নীতি সুপারিশ

- সরকারি ব্যয় সংকোচন নীতির সঠিক বাস্তবায়ন
- আউট সোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আড়ালে শোষণ-বঞ্চনা
- প্রশাসন ও রাজনীতির বরিশাল উপাখ্যান
- দুর্নীতির দুষ্টচক্র থেকে বের হবার উপায় কী?
- উপরওয়ালাদের সুলুক সন্ধান
- বহুদিন কোনো ডাক পাই না : ডাক বিভাগের সংস্কার চাই
- বাংলাদেশে নাগরিক পেনশন
- বাংলাদেশে দান-অনুদান ও চাঁদা প্রথা : সংকুচিত জন পরিসর অবহেলিত প্রাতিষ্ঠানিকতা

চতুর্থ গুচ্ছ

শিক্ষা ভাবনা

- কোভিড-১৯ : শিক্ষা ক্ষতি পুনরুদ্ধার ভাবনা
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল : কিছু প্রশ্ন
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলের স্বচ্ছতা ও ভর্তি নীতিমালা
- ভর্তি নীতিমালায় কোটাপ্রথা সংবিধান লংঘনের সামিল
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে কেমন হয়!
- শিক্ষাঙ্গণে রাজনীতি নয়, প্রাধান্য পাক শিক্ষা
- বি-রাজনীতিকরণ ও অতি-রাজনীতিকরণের মাঝামাঝি থাকুক আমাদের শিক্ষাঙ্গণ

পরিশিষ্ট

১. List of Countries practice types of Parliament, electoral system with specic proportional representation (PR) system
২. Legislatures of sovereign states : name, types and number of members
৩. Government agencies under Ministries and Divisions in Bangladesh
৪. ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী করার জন্য ১২ দফা ও দেশের সামগ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ছয় দফা প্রস্তাবনা

প্রথম গুচ্ছ

বাংলাদেশে পূর্ণ গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র, সংবিধান, শাসন-প্রশাসন ও নির্বাচন বিষয়ে পাঁচটি সংস্কার প্রস্তাব

বাংলাদেশে পূর্ণ গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র, সংবিধান, শাসন-প্রশাসন ও নির্বাচন বিষয়ে পাঁচটি সংস্কার প্রস্তাব

সূচনা—'গণতন্ত্র' বাংলাদেশি জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, স্বাধীনতার অঙ্গীকার ও আবহমান বাঙালির শাসন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। উপরন্তু ব্যক্তি নাগরিকের মৌলিক ও মানবিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র সর্বতোভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই কোনো অবস্থাতেই যে-কোনো অজুহাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ একজন নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিপন্ন বা হুমকিতে ফেলতে পারে না। বাংলাদেশি জাতিসত্ত্বা বাঙালির হাজার বছরের উত্তরাধিকার এবং পঞ্চাশ বছর পূর্বে (১৯৭২) জাতিরাষ্ট্র হিসেবে সুগঠিত হবার পর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা নতুনভাবে দানা বাঁধতে শুরু করে। একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করেছে। রাষ্ট্র গঠনের শুরুতে যে সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল এখন তা সর্বাংশে যুগোপযোগী তা বলা যায় না। ভাষা আন্দোলন থেকে সত্তর-একাত্তরের মূল চেতনা ও আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে সময় ও বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সে পরিবর্তনসমূহই ২০২৩-২০২৪ সময়ের 'সংস্কার কর্মসূচি' হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। গত দেড় দশক ধরে বাংলাদেশের সাংবিধানিক, শাসনতান্ত্রিক ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের নানা প্রসঙ্গ ও প্রস্তাব জনপরিসরে ঘুরেফিরে আলোচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে (২০২৩) কেন্দ্র করে সংস্কার আলোচনা নতুন গতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে গণপরিসরের বহুল আলোচিত শাসনতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাবসমূহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এখানে পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষত গত দশ বছর ধরে 'সুজন'-এর শাসন সংস্কার প্রস্তাবসমূহ এবং সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এবং বামজোট থেকে যে সব সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলোকেও বিবেচনা নিয়ে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের বিবেচনার জন্য বিশেষভাবে পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করা হলো। প্রথম দুটি প্রস্তাব আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ফোরামে বিগত দশ বছর যাবৎ উঠিয়ে এসেছি। সম্প্রতি এ প্রস্তাসমূহ

আংশিকভাবে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ঘোষণায় স্থান পেয়েছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের একটি প্রস্তাব বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে একাধিকবার আলোচনা করেছে। পরের আলোচনায় জাতীয় বি-কেন্দ্রীকরণ নীতি , স্থানীয় সরকার ও অনুপস্থিত ভোটারদের ভোটাধিকার দানের তিনটি প্রস্তাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ফোরামে ঐ বিষয়গুলো আমি আগেও পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেছি এবং এখনও বিষয়সমূহ সিরিয়াস আলোচনার দাবিদার বলে মনে করি।

যে পাঁচটি প্রস্তাব আলোচনার জন্য তুলে ধরা হয়েছে তা হলো—

১. সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) ভিত্তিতে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান।
২. দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন।
৩. জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি প্রণয়ন ও এ নীতির আলোকে শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস।
৪. একটি একীভূত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আইন ও একক তফসিলে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠান।
৫. ভোটার অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচনে 'পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি' চালু এনআরবি ও প্রবাসীদের ভোটাধিকার চর্চার সুযোগ দান।

এক

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Reresentation) ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন

> 'In a representative body actually deliberating, the minority must of course be overruled; and in an equal democracy, the majority of the people, through their representatives, will outvote and prevail over the minority and their representatives. But does it follow that the minority should have no representatives at all? ...Is it necessary that the minority should not even be heard? Nothing but habit and old association can reconcile any reasonable being to the needless injustice. In a really equal democracy, every or any section would be represented, not disproportionately, but proportionately. A majority of the electors would always have a majority of the representatives, but a minority of the electors would always have a minority of the representatives. Man for man, they would be as fully represented as the majority. Unless they are, there is not equal government ...there is a part whose fair and equal share of influence in the representation is withheld from them, contrary to all just government, but, above all, contrary to the principle of democracy, which professes equality as its very root and foundation.'
>
> The case for a Single Transferrable Vote system, a form of proportional representation, was made by John Stuart Mill in his essay *Considerations on Representative Government*, 1861.

নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক মতানৈক্য ও অস্থিরতার একটি প্রধানতম অনুষঙ্গ। এদেশে কোনো নির্বাচনের পরই পরাজিতরা বিজয়ীদের অভিনন্দিত করতে পারেনি, বিজয়ীরা পারেনি পরাজিতদের আস্থায় নিয়ে শাসন কাজে কোনো অর্থপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারণ করে দিতে। ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় থেকে যেসব নির্বাচন করেছে তা কখনও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয়নি। চলমান নির্বাচন পদ্ধতি যা মেজরিটায়িান বা First Past The Post (FPTP) system নামে পরিচিত এবং এ পদ্ধতির নির্বাচনই আইনসম্মতভাবে বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতেই ১৯৭০-২০১৮ পর্যন্ত মোট ১২টি সংসদীয় নির্বাচন, প্রায় ৮ থেকে ৯টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং অসংখ্য স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচন নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে তা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কথা বাদ দিলেও প্রতিবেশী ভারতের নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা হলেও ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশ বিগত পঞ্চাশ বছরেও বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থার শুধু যে কোনো উন্নয়ন বা উত্তরণ ঘটেনি তা নয়, বরঞ্চ পরিস্থিতি ক্রম অবনতিশীল। এর মধ্যে শুধু ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ের চারটি নির্বাচন ছিল একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ঐ চারটি নির্বাচন একটি ভিন্নতর ব্যবস্থাধীনে অনুষ্ঠিত হয়। 'নির্দলীয়-নিরপেক্ষ-তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের অধীনে ভিন্ন একটি ব্যবস্থায় ঐ নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে সে ব্যবস্থা আর বলবৎ নেই। যদিও প্রবল জনদাবি আছে, কিন্তু কখন, কীভাবে হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা মুস্কিল। অপরদিকে নির্বাচনে সনাতনী ব্যবস্থাপনাগত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত সীমাবদ্ধতা যা ছিল তা এখন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এখন নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন না করে শুধু ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি সারিয়ে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জন দুরূহ হবে। তাছাড়া বিদ্যমান সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা বিশ্বের প্রায় ৮৭টি রাষ্ট্র সংস্কার করে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সমতাভিত্তিক সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ সব প্রেক্ষিত থেকে বাংলাদেশে বর্তমানে অনুসৃত সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নির্বাচন পদ্ধতির সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য সমানুপাতিক প্রতিধিনিত্বের পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশটি বিবেচনার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

পদ্ধতিগত সমস্যার প্রকৃতি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়

পদ্ধতিগতভাবে আমাদের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় 'সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা' বা Simple Majoritarian Principle-এর যে পদ্ধতি, তাতে সারাদেশ ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত থাকে। প্রতিটি এলাকায় একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসনভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে একজন নির্বাচিত হন। এভাবে প্রায় ৩০০ নির্বাচনী এলাকা থেকে কমপক্ষে ১৫০০ প্রার্থীর মধ্য থেকে ৩০০ নির্বাচিত ঘোষিত হন। শুধুমাত্র এক ভোট বেশি পেয়েও একজন নির্বাচিত বিবেচিত হয়। ধরা যাক, কোনো একটি আসনে মোট ভোট ১০০, আর মোট প্রার্থী ৫ জন। সর্বমোট ৮০ শতাংশ ভোট সংগৃহীত হয়ে তা ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে বণ্টন হয়ে গেছে। তিনজন প্রার্থী ২০ শতাংশ করে মোট ৬০ শতাংশ, একজন ১৫ শতাংশ, এবং আর একজন ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এই পদ্ধতিতে যিনি ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তিনি নির্বাচিত ঘোষিত হয়ে যাবেন। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুযায়ী এ নির্বাচন আইনত বৈধ। তবে এখানে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রতিফলিত হয়নি। প্রকারান্তরে সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঁচিশ শতাংশ সংখ্যালঘিষ্ঠের

প্রতিনিধি ৭৫ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভাজিত ভোটারের উপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ থেকে বাঁচার জন্য কোনো কোনো রাষ্ট্র সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্থলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (Absolute majority) নীতি অবলম্বন করেছে। একজন প্রার্থী ৫০ শতাংশ-এর অধিক ভোট (ন্যূনপক্ষে ৫১ শতাংশ) না পাওয়া পর্যন্ত একই নির্বাচনকে বার বার রিপিট করতে হয়। ফ্রান্সসহ অনেক দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এ নীতি অনুসৃত হয়। তারপরও এ নীতির অধীনে যে নির্বাচন তাতে ৪৯ শতাংশ ভোটারের কোনো কার্যকর মূল্যায়ন হয় না। সকল ক্ষমতা বিজয়ীর পকেটে চলে যায়, যাকে বলা হয়, 'winners take all' বিজয়ীর পকেটে সকল ক্ষমতা। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিলের কালজয়ী গ্রন্থের উপরের উদ্ধৃতিটি দেখা যেতে পারে।

নির্বাচনে মাইনরিটির বিজয়!

বৃটেন ২০০৫ সালে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক (Simple majoritarian) নির্বাচনে টনি ব্লেয়ার ২১.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে এবং কানাডায় ২০১১ ও ২০১৫ সালে ৪০ শতাংশ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গঠিত হয়। একসময় যুক্তরাজ্যের মোট ভোটের ৪.৭৭ শতাংশ স্কটিশ ভোট পেয়ে স্কটিশ ন্যাশানালিস্ট পার্টি স্কটল্যান্ডের ৫৬টি আসনে বিজয়ী হয়। অপরদিকে ঐ দেশেই 'ইনডিপেনডেন্ট পার্টি' ১২.৬ শতাংশ ভোট পেয়েও ইংল্যান্ডে শুধুমাত্র একটি আসন লাভ করে। এভাবে পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক একক প্রার্থীর সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিজয়কে যুক্ত করে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন হিসাব করে সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু মোট ভোটের হিসেবে সবসময়ই তা হয় সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন। অথচ গণতান্ত্রিক নীতি হওয়ার অঙ্গীকার ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে যে ভোট ব্যবস্থা তারই বেড়াজালে গণতান্ত্রিক আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশেও আমরা গণতন্ত্রের নামে একটি বিভ্রমসৃষ্টিকারী নির্বাচনী ব্যবস্থায় ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন মেনে নিচ্ছি। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য চারটি জাতীয় নির্বাচনকে এ অসামঞ্জস্যতা বিশ্লেষণের একটি নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সে চারটি নির্বাচন হচ্ছে যথাক্রমে ১৯৯১, ১৯৯৬ (জুন), ২০০১ ও ২০০৮-এর নির্বাচন। এ সব নির্বাচনী ফলাফলের একটি সাধারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়—

১. চারটি নির্বাচনেই নানা রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোট ও প্রাপ্ত আসনের মধ্যে বড় ধরনের অসামঞ্জস্যতা বা গড়মিল।
২. চারটি সাধারভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরও ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালগিষ্ঠরা দেশের সমস্ত ক্ষমতা ভোগ-উপভোগ করেছে।

তাই বর্তমান সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচন ব্যবস্থা যত সুষ্ঠ, শান্তিপূর্ণ ও সম-সুযোগ

(Level playing field) দিয়ে করা হোক, এ পদ্ধতির নির্বাচনের মাধমে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নিশ্চিত করা এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতে কোনোরূপ মূল্য আরোপ সম্ভব নয়।

চারটি ভালো নির্বাচনের বিশ্লেষণ-কীভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠরা শাসন করল

১৯৯১ সালের নির্বাচন — এ নির্বাচনে অংশ নেওয়া পাঁচটি প্রধান দল ও জোটের মোট প্রাপ্ত ভোট ও প্রাপ্ত আসনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এখানে দেখা যেতে পারে। এ নির্বাচনে সরকার গঠনকারী দল বিএনপির প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩০.৮১ শতাংশ ও আসন সংখ্যা ১৪০ বা ৪৬ শতাংশ। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোট ৩০.০৮ শতাংশ ও আসন প্রাপ্তি ছিল ৮৮ বা ২৯ শতাংশ। জাতীয় পার্টির প্রাপ্ত ভোট ১১.৯২ শতাংশ ও আসন সংখ্যা ৩৫ (১২ শতাংশ), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভোট ১২.১৩ শতাংশও আসন ১৮ (৬ শতাংশ) এবং ইসলামী ঐক্যজোটের ভোট ছিল ০.৯৯ শতাংশ এবং আসন একটি। ১৯৯১ সনে বিএনপি আওয়ামী লীগের চেয়ে মাত্র ০.৭৩ শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে আসন বেশি পায় ৫২টি বা ১৩ শতাংশ। একইভাবে জাতীয় পার্টি জামাতে ইসলামী থেকে ০.২১ শতাংশ ভোট কম পেয়েও ১৭টি আসন বেশি পেয়ে যায়। সার্বিকভাবে বিএনপি ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭০ শতাংশ ভোটারের বিপরীতে ১৯৯১ সনে শাসন অধিকার লাভ করে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচন — এ নির্বাচনে ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি (৪৯ শতাংশ) আসন অধিকার করে সরকার গঠন করে এবং বিএনপি ৩৩.৬১ শতাংশ ভোট পেয়ে ১১৬ (৩৯ শতাংশ) আসন নিয়ে বিরোধী দলের আসনে বসে। তবে সরকার গঠনকারী দলের চেয়ে সম্মিলিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে ৬২.৫৬ শতাংশ ভোট থেকে যায়।

২০০১ ও ২০০৮ এর নির্বাচন — এ দুটি নির্বাচনের বিষয়টি আরও কৌতুহরোদ্দীপক। সরকার গঠনকারী বিএনপি (৪০.৯৭ শতাংশ) ও বিরোধী আসনের আওয়ামী লীগের (৪০.১৩ শতাংশ) ভোটের পার্থক্য মাত্র ০.৮৪ শতাংশ। কিন্তু আসনের বিশাল পার্থক্য ১৩১ (৪৪ শতাংশ)। এসবই সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পদ্ধতির তেলেসমাতি। ২০০১ সনে বিএনপি ৪১ শতাংশ ভোট নিয়ে ৫৯ শতাংশের উপর শাসন করে যায়। ২০০৮ সনেও ভোট ও আসনের ব্যবধান একটু বেশি হলেও অসামঞ্জস্যতা এক রকমেরই ছিল। আওয়ামী লীগ ৪৮.৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৩০ (৭৬.৬৬ শতাংশ) আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। বিএনপি-জামাত ৩৭.২০ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ৩২ (১০.৬৬শতাংশ) আসন নিয়ে বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করে। ভোটের পার্থক্য ১১.৭ শতাংশ আর আসন সংখ্যার পার্থক্য ১৯৮ (৬৬ শতাংশ)।

এ পদ্ধতির নির্বাচন আসনভিত্তিক হওয়ায় ভোটের সংখ্যা ও হার বা ভোটার নয়, আসন

প্রাপ্তিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় যেহেতু সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই শেষ কথা, তাই মোট ভোট সংখ্যার বিপরীতে যতই কম হউক সকল ক্ষমতা বিজয়ীর কুক্ষিগত হয়। ক্ষমতাসীনের বাইরের সকল পরাজিত প্রার্থীদের ভোট এদেশের সাধারণ মানুষ 'নস্ট' ভোট হিসেবে গণ্য করে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় প্রতিটি ভোট মূল্যায়িত হয়

নির্বাচন ব্যবস্থার এ ত্রুটি সংশোধন করে নির্বাচনকে সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য রাজনীতি বিজ্ঞানীদের সৃজনশীল প্রয়াস সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation-PR) পদ্ধতির উদ্ভাবন। এ পদ্ধতিতে একটি নির্বাচনে দেওয়া প্রত্যেকটি ভোট কাজে লাগে এবং প্রতিটি ভোট সংসদে সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। তবে সরকার গঠন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বা কয়েকটি দলের কোয়ালিশন করে করতে হয় কারণ একটি নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ও হারের ভিত্তিতে আসন বণ্টন হয়। যদি এ দেশে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাহলে ১৯৯১ সালে ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদের দৃশ্যপটটি কেমন হতো একটি হিসাব করা যেতে পারে। প্রদত্ত মোট ভোটের আনুপাতিক হিসেবে বিএনপি পেত ১৪০ আসনের পরিবর্তে সর্বাধিক ৯৩-৯৫ আসন। একইভাবে আওয়ামী লীগ পেত ৮৮ আসনের পরিবর্তে ৯০-৯৩ আসন। জাতীয় পার্টির আসন থাকত ৩৫, কিন্তু জামাতের আসন ১৮-এর পরিবর্তে ৩৭ হয়ে যেত। বাকি ৪০-৪২টি আসন সিপিবি, আইওজে, ন্যাপ (মু), গণতান্ত্রিক পার্টি, জাসদ, ওয়ার্কারস পার্টি, বাকশাল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা অনুপাতে বণ্টন হতে পারত। বিএনপির এককভাবে সরকার গঠনের পরিবর্তে কোয়ালিশন সরকারের সম্ভাবনা বেশি হতো।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ ও ফলাফল নির্ধারণ কীভাবে হয়?

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনে বিশেষ কোনো আসনের বিপরীতে নির্দিষ্ট কাউকে প্রার্থী করা হয় না। প্রত্যেক দল নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ঘোষিত সময়ের মধ্যে তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। সারাদেশ একটি মাত্র আসন হিসেবে গণ্য হয়। ভোটারগণ প্রার্থীর বদলে দলকে ভোট দিয়ে থাকে। ধরা যাক, সারা বাংলাদেশ যদি একটি নির্বাচনী এলাকা হয়, সে এলাকার ৩০০টি আসনের জন্য ভোটারগণ সকল দলের মধ্য থেকে নিজ নিজ পছন্দের দলকে বাছাই করে সে দলের প্রতীকে তার ভোটটি দিবেন। এভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল কম বেশি ভোট পাওয়ার পর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ও হার অনুযায়ী আসন বণ্টন হবে। বাংলাদেশে ৩০০ আসনকে মোট প্রদত্ত ভোটের সাথে দল ভিত্তিক প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত বের করে

আসন বরাদ্দ করা হবে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধরণ ও আসন বণ্টনের ফর্মূলা

বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীর ৮৭টা দেশে নানা পদ্ধতিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করে নির্বাচন পরিচালিত হয়। মোটামুটি তিনটি পদ্ধতিতে নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন হয়। যথা—

১. মুক্ত তালিকা (Open List)
২. বদ্ধ তালিকা (Close List) এবং
৩. মিশ্র তালিকা (Mixed list)।

মুক্ত তালিকা—এ পদ্ধতিতে সাধারণত একটি জাতীয় সংসদ বা আইন সভায় যত আসন, নির্বাচনের আগে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ঐ ঘোষিত তালিকার প্রথম থেকে যত আসন যে দলের ভাগে পড়বে তারা সে আসনগুলোর প্রার্থীতা পূরণ করে নেবে। যেমন ধরা যাক, বাংলাদেশ যদি মুক্ত তালিকা পদ্ধতি গ্রহণ করে তাহলে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তপসিল অনুযায়ী একটি বিশেষ দিনে স্ব স্ব দলের ৩০০ জন প্রার্থীর তালিকাসমূহ প্রকাশ করবে। ধরা যাক ক, খ, গ, ঘ, ঙ-এ পাঁচটি দল ৩০০ আসনের জন্য ৩০০ জনের ৫টি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল। চ, ছ, জ, ঝ, ও ঞ-এ পাঁচটি দল যথাক্রমে ১০০,৭৫,৫০, ৩০ ও ২০ জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল। নির্বাচনের পর দেখা গেল ক ৩২ শতাংশ, খ ৩০.৫ শতাংশ, গ ১০ শতাংশ ঘ ৭ শতাংশ ও ঙ ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অপরদিকে চ ৪.৫ শতাংশ, ছ ৩.৫ শতাংশ, জ ৩ শতাংশ, ঝ ১.৯ শতাংশ এবং ঞ ১.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে প্রদত্ত মোট ভোট দলের প্রাপ্ত ভোট হার অনুযায়ী ভাগ হবে। সে হিসেবে ক দল পাবে ৯৬ আসন, খ দল ৯১.৫, গ ৩০, ঘ ২১, ঙ ১৮, চ ১৩.৫, ছ ৯.৫, জ ৯, ঝ ৫.৭ এবং ঞ ৪.৮। এখানে ০.৫, ০.৭ ও ০.৮ বিভাজ্য আসন বণ্টণে একটি সমস্যা দেখা যায়। আর অতি ছোট বা ক্ষুদ্র দলকে নিরুৎসাহিত করার জন্য কোনো কোনো দেশে যথাক্রমে ভোট ২, ৩, ৪, ও ৫ শতাংশের কম হলে তাদের কোনো আসন দেওয়া হয় না। সে আসনগুলো দ্বিতীয় রাউন্ডে আনুপাতিক হারে যোগ্য দলগুলোর মধ্যে বন্টিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো দল নির্বাচনের পর তালিকা পরিবর্তন বা তালিকার উপরেরক্রম থেকে নাম বাদ দিয়ে তালিকার নীচের দিক থেকে কাউকে আসন দিতে পারে না।

বদ্ধ তালিকা—বদ্ধ তালিকা পদ্ধতিতে সারা দেশের জন্য একটি তালিকা করা হয় না। অঞ্চল বিশেষ, মাইনরিটি, নানা নৃ-গোষ্ঠীর জন্য পৃথক তালিকা এবং ভোট ও প্রার্থী

তালিকা পৃথকভাবে করা হয়। অনেক সময় কেন্দ্র ও প্রদেশের পৃথক তালিকাও করা হয়।

মিশ্র তালিকা—এই পদ্ধতিতে সমানুপাতিক ও মেজরিটারিয়ান দুই পদ্ধতির এক ধরনের মিশ্রণ করা হয়। কিছু আসন সমানুপাতিক এবং কিছু আসনে সরাসরি নির্বাচন হয়। যেমন নেপালে নিম্ন কক্ষের মোট আসন ২৭৫। সেখানে ১৬৫ আসন FPTP পদ্ধতিতে পূরণ করা হয় এবং ১১০টি আসন সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুসারে পূরণ করা হয়। উচ্চ কক্ষের মোট ৫৯টি আসনের ৫টি সংরক্ষণ করে ৫৪টিতে বদ্ধ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়।

নীতিগতভাবে আনুপাতিক বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাটি গ্রহণ করার পর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে দেশে দেশে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নেপাল ও শ্রীলংকা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার চর্চা শুরু করেছে। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণকারী ৯২টি দেশের মধ্যে মাত্র ৭টি দেশ মিশ্র, দ্বি-স্তর দল তালিকা ও বদ্ধ তালিকা প্রভৃতি পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও ৮৭টি দেশ মুক্ত দল তালিকা পদ্ধতি অনুসরণ করছে। আনুপাতিক বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণকারী দেশসমূহের একটি তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখা যেতে পারে। এখানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নীতির বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োগের তথ্যও দেওয়া আছে।

বাংলাদেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পুরোপুরি চর্চা হয় না তা নয়। আমাদের দেশে সংসদে ৫০ জন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের একটি নিকৃষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যা হচ্ছে জাতীয় সংসদে যে দলের যত আসন সে অনুপাতে নারী আসন ঐ দলগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলো কাদের প্রাপ্য আসনে নারী সদস্য মনোনয়ন দেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজ ও নাগরিক সমাজ বৃহত্তর আঙ্গিকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধারণাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন। নির্বাচনী গণতন্ত্রের ভেতরগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশ এ পদ্ধতির সুফল পেয়েছে। সুফলগুলো নিম্নরূপ—

১. একক দলীয় আধিপত্য ক্রমে হ্রাস পায় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থা একটি স্থিতিশীল রূপ লাভ করে। রাজনৈতিক অঙ্গণে দলীয় বহুত্ববাদিতা (Pluralism) স্থায়ীত্বশীল রূপ পরিগ্রহ করে।
২. এলাকা বা আসন ভিত্তিক পেশীশক্তি ও অর্থশক্তির অশুভ প্রভাব হ্রাস পায় এবং সাধারণ ও জাতীয় নীতি চর্চা নতুন গতি লাভ করে।
৩. জাতীয় সংসদ রাজনৈতিক দল ও মতের সম্মিলিত নীতি চর্চার ফোরামে রূপান্তরিত হয়।
৪. রাজনৈতিক দলে বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আধিপত্য কমে এবং নীতি ও দলের

নীতি-আদর্শ অধিক মূল্যায়িত হয়।

৫. সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলেও সংখ্যালঘুকে উপেক্ষা করা যায় না।
৬. সংসদের বিতর্ক অনেক প্রাণবন্ত হয়। বিনা বিতর্কে কোনো বিল পাশ হতে পারে না।
৭. দলে ও দেশে একক নেতৃত্বের স্থলে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং অঞ্চলকেন্দ্রিক সংকীর্ণ, আঞ্চলিকতাবাদী নেতৃত্বের স্থলে সত্যিকারের জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়।
৮. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায়ও দুই প্রধান দলের দূরত্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়, মতাদর্শের দিক থেকে সবাই পরস্পর কাছাকাছি চলে আসে।
৯. কোনো শক্তিশালী প্রার্থী নির্বাহী বিভাগকে প্রভাবিত করে তার নির্বাচনী এলাকায় অধিক সম্পদের বরাদ্দ নিয়ে গিয়ে নিজস্ব ভোট ব্যাংক তৈরি করা এবং কোনো দুর্বল প্রার্থীর এলাকাকে বঞ্চিত না করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
১০. ছোট বা ক্ষুদ্র দল তাদের বক্তব্য জাতিকে সমস্বরে শোনাতে পারে।

অসুবিধা বা নেতিবাচকতা

১. সরকার গঠনের জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রায়ই পাওয়া যায় না, ফলে প্রায় সময়ই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে দেখা যায়।
২. ছোট দলের কাছে অনেক সময় বড় দলগুলো জিম্মি হয়ে পড়ে।
৩. আপস-সমঝোতা ছাড়া সরকার চালানো অনেক সময় কঠিন হওয়ায় নীতি বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতার স্বার্থে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়।

উপসংহার — সারা বিশ্বে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধারণা দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষত winners take all-এ বাস্তবতার কুফল এবং প্রতিটি ভোটের সম মূল্যায়নের এ পদ্ধতিটি দেশে গণতন্ত্রের নীতিকে সত্যিকারের অর্থে চর্চার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। বাংলাদেশে এ পদ্ধতি চালু হলে গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব সাধিত হয়ে যাবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পেয়ে একক ক্ষমতা চর্চা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও ভোটাধিকার সত্যিকার অর্থে অর্থপূর্ণ হবে। দলীয় স্বৈরতন্ত্র ধীরে ধীরে ভেঙে পড়বে। দলগুলো ভেতর থেকে সভ্য ও সংস্কৃত হবে। দলীয় ফোরামে নীতি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

দুই
বাংলাদেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন

সূচনা — বর্তমান বিশ্বে আইনসভা (legislature) নাই এমন কোনো দেশ নাই। গণতন্ত্র বা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সুষ্ঠু নির্বাচন থাকুক না থাকুক আইনসভা বা সংসদ কিন্তু সব দেশেই আছে। যেমন সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের শেখ বা আমীর শাসিত দেশসমূহেও সংসদ রয়েছে। সেগুলোকে সত্যিকার অর্থে আইনসভা বলা যায় না। কারণ ওখানে কোনো আইন তৈরি হয় না। একইরকমভাবে অনেকগুলো আফ্রিকান দেশ যেখানে নানা উপ-জাতীয় ও গোত্রীয় শাসন এবং ব্যক্তি আধিপত্যের কারণে সংঘাত ও বিরোধ রয়েছে , সে সব দেশেও আইনসভা আছে কিন্তু তা কাজ করে না। উইকিপিডিয়া (en.wikipidia.com/wiki/list of legislature) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উপরে উল্লেখ করা আরব এবং আফ্রিকান দেশগুলোসহ ১৯২টি দেশে আইনসভা বিদ্যমান। তার মধ্যে ১০৫টি দেশে এক কক্ষবিশিষ্ট এবং ৮৭টি দেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে (দেশ সমূহের একটি তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ দেখা যেতে পারে)। গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধ ধারণকারী দেশগুলো যেখানে আইনসভা সত্যিকার অর্থে কার্যকর সেখানকার আইনসভাগুলো দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। এমনকি আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ভারত, ভুটান, পাকিস্তান ও নেপালের আইনসভাসমূহ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। ইউরোপ-আমেরিকার কথা বাদই থাকল। পৃথিবীর সকল উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে দুইটি কক্ষের মাধ্যমে সংসদীয় কর্মপ্রক্রিয়ায় ভারসাম্য আনয়ন করা হয়। সাধারণত, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থেকে যে সুবিধাসমূহ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ —

সুবিধাসমূহ

১. এককভাবে নেতা বা দল সবিস্তারে আলোচনা বা সংসদীয় বিতর্ক ছাড়া কোনো বিল এক দিনে আইনে পরিণত করতে পারে না। দুইটি কক্ষ থাকলে উভয় কক্ষে আলোচনা অপরিহার্য হয়ে যায়। তাতে ভাবনা-চিন্তার প্রচুর সময় পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার সুযোগ অবারিতভাবে ব্যবহৃত হয়।
২. নিম্ন কক্ষে সাধারণত মাঠপর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা এবং উচ্চ কক্ষে বর্ষীয়ান, অভিজ্ঞ ও পেশাগতভাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের আসার ব্যবস্থা থাকায় আইন প্রণয়ন ও সংসদীয় কার্যক্রমে গুণগত উৎকর্ষতা অর্জিত হয়।
৩. সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসরে থাকা প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, আইনজ্ঞ, বিচারপতি, শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সমাজের নানা পেশা ও কর্মে নিয়োজিত সফল ব্যক্তিরা সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নিয়ে গঠনমূলক অবদান রাখতে পারেন।

৪. নিম্ন কক্ষের অতি রাজনীতিকতা, আবেগী সিদ্ধান্ত, সংকীর্ণ এলাকাগত ও আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট সিদ্ধান্ত কমে আসে।
৫. দেশে স্থিতিশীল গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়। সংসদীয় আলোচনা ও বিতর্ক প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ হয়।

অন্যান্য দেশের কিছু অভিজ্ঞতা:

কোনো কোনো দেশে উচ্চকক্ষকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ করে রাখা হয়। শুধু প্রথা, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সম্মান দেওয়ার জন্য উচ্চ কক্ষ রাখা হয়। যেমন বৃটেনে উচ্চকক্ষের ভূমিকা খুবই গৌণ এবং আলাপ আলোচনা বা বিতর্ক খুব ক্ষুরধার নয়। তবে বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষতায় লর্ড সভার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। সে তুলনায় আমেরিকান সিনেট রাজনীতি ও প্রশাসনে অনেক বেশি সক্রিয়। অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সিনেটে নির্বাচন করেন। উচ্চতর রাষ্ট্রিয় পদে নিয়োগ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ, বিশেষত সিনেটের কমিটিগুলো সরকারের জবাবদিহিতা আনায়নে খুবই কার্যকর। রাষ্ট্রপতির অভিশংসনেও উচ্চকক্ষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একশত জন সিনেট সদস্যের বিতর্কের গুণগত মানের কাছে ৪৩৫+২ জনের নিম্ন কক্ষের সদস্যের বিতর্ক নিস্প্রভ মনে হয়। মার্কিন ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি সিনেট সদস্য ছিলেন। নিম্নকক্ষের সদস্যদের কার্যকাল দুই বছর, তবে মেয়াদ শেষে তারা পুনরায় নির্বাচন করতে পারেন। পক্ষান্তরে সিনেট সদস্যগণ প্রতি দুই বছর পরপর ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি দুই বছর পর এক-তৃতীয়াংশ আসন শূন্য হয়। ভারতে লোকসভা ও রাজ্যসভার নির্বাচন পদ্ধতি আলাদা। ভূমিকার দিক থেকে বৃটেনের মতো ভারতেও নিম্নকক্ষ বা লোকসভাই সরকার ও বিরোধীদের কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র। অর্থ বিল ও সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন ছাড়া অন্যান্য আইন প্রণয়নে রাজ্যসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যগুলোর সাথে ইউনিয়ন সরকারের কোনো বৈষম্য দেখা দিলে রাজ্যসভা সেখানে হস্তক্ষেপ করে থাকে। লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫৪৩ এবং রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৪৫। এর মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। লোকসভা ও রাজ্যসভায় বর্তমানে (২০২৩) সম সংখ্যক দল প্রতিনিধিত্ব করে। উভয় কক্ষে দেশের ৩৭টি রাজনৈতিক দলই কম-বেশি প্রতিনিধিত্ব করে। নেপালের নতুর সংবিধানেও উচ্চ কক্ষের বিধান রাখা হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানের উচ্চ কক্ষ সিনেটও বেশ কার্যকর।

বাংলাদেশে উচ্চকক্ষ কেমন হতে পারে:

বাংলাদেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় পদ্ধতি চালু করতে হলে তাকে এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তির একটি সমন্বয় করার প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশের উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১৩০-১৫০ এর মধ্যে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয় হবে। ছোট জেলাগুলো থেকে একজন, মাঝারি জেলা থেকে দুই জন এবং বড় জেলাগুলো থেকে তিন জন সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে পারেন। সে নির্বাচন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবেই হতে পারে। বাকি আসনগুলো পূরণে মনোনয়ন ও পেশাভিত্তিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচন হতে পারে। প্রত্যক্ষ হলে জনগণ সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে এবং নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের নির্বাচন একই দিনে একই তপসিলে অনুষ্ঠিত হওয়াটা ঠিক হবে না। মেয়াদকালের ভিন্নতা ও ভিন্ন তপসিলে নির্বাচন হলে একটি অপরটিকে প্রভাবিত করতে পারবে না। নির্বাচন পরোক্ষভাবে হলে জেলার সকল স্তরের স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, জেলার সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, জেলার বার কাউন্সিলের সভাপতি ও সেক্রেটারি, চেম্বার অফ কমার্স-এর সভাপতি ও সম্পাদক এবং সাংবাদিক সমিতি বা ইউনিয়ন ও প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদকরা উচ্চকক্ষের নির্বাচকমণ্ডলির সদস্য হতে পারেন। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যে পদ্ধতিতেই নির্বাচন হউক উচ্চকক্ষের প্রার্থীর বয়স ও অন্যান্য যোগ্যতা নিম্নকক্ষ থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন হবে। এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের বাইরে অন্তত এক তৃতীয়াংশ আসন অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিভিন্ন পেশায় সফল ও জাতীয় নানা কার্যক্রমে অবদান রাখা ব্যক্তিবর্গের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করলে রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করবেন। কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমেরিকান সিনেট, নেপাল ও পাকিস্তানের উচ্চকক্ষ এবং ভারতীয় রাজ্যসভার অভিজ্ঞতাকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপযোগী করে উচ্চকক্ষ গঠন ও কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা এবং অর্থবিল পাশ করা ছাড়া অন্যান্য সকল সংসদীয় সিদ্ধান্তে দুইকক্ষের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হতে হবে। হাইকোর্টের ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ ও অভিশংসনে এ কক্ষ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন, সরকার স্বীকৃত প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি প্রার্থী বাছাই করে উচ্চকক্ষের বিশেষ কমিটির কাছে পাঠালে কমিটি তদন্ত করে তাদের শুনানি গ্রহণ করে সরকারের কাছে নিয়োগ বা প্রয়োজনে কোনো অভিশংসনের প্রশ্ন দেখা দিলে বরখাস্তের সুপারিশ করতে পারে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধিত হলে বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ও কাজের ধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। জাতীয় সংসদ সদস্যদের আর্থিক ও নানা প্রাধিকারসমূহ পরিবর্তিত হবে। একজন জাতীয় সংসদ সদস্যের সুযোগ-সুবিধাসমূহ হবে সংসদীয় কার্যক্রমের সহায়ক তথা পরিপূরক ও সম্পূরক। জাতীয় সংসদ সদস্যের নির্বাচনে

বা বিশেষ কোনো এলাকায় ভোট ব্যাংক সৃষ্টিতে সহায়ক হয় এমন কোনো কাজে রাষ্ট্রীয় কোনো অর্থায়ন হতে পারবে না। জাতীয় সংসদ সদস্যের সকল কাজ হবে জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে, এখানে দলীয় ও ব্যক্তি বিবেচনা আসতে পারবে না এবং সকল কার্যক্রম হবে সংসদকেন্দ্রিক। দল নির্বাচন করবে দলীয় সদস্যদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা এবং দলীয় শাসন নীতি কাঠামোকে সামনে রেখে। এভাবে রাজনীতি ও দলীয় ব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন উপাদান যুক্ত হবে। রাজনীতির মাধ্যমে ধনার্জন প্রক্রিয়া কম উৎসাহিত হবে। তাছাড়া আইনবিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের কাজকর্মের সুস্পষ্ট বিভাজন রক্ষিত হবে।

তিন

জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি প্রণয়ন : শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রশাসন, বিচার, অর্থ মুদ্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস

সূচনা—সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে আধুনিক রাজনীতি-বিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন ও অর্থনীতির নানা শাখা ও কর্মকাণ্ডে 'বিকেন্দ্রায়ন' বা 'বিকেন্দ্রীকরণ' রাষ্ট্রীয় শাসন, সেবা-সরবরাহ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন ধারণা ও দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সনাতনী রাজনীতি ও লোকপ্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ শুধুমাত্র 'সরকারের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে উপর থেকে নিচে হস্তান্তরকে' নির্দেশ করা হতো। এ হস্তান্তরে তিনটি প্রধান প্রবণতার সমন্বয় হতো। একটি ভৌগোলিক বা অঞ্চলগত, অপরটি ছিল কার্যক্রমগত এবং শেষোক্তটি অর্থায়ন সম্পর্ক বিষয়ক। ভৌগোলিক দিক হলো জাতীয় বা কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন অংশ বা এককে কার্য-ক্ষমতার বিভাজন ও বিন্যাস। কার্যক্রমগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্র যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থ, বাণিজ্য, পূর্ত, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসন, শ্রম, কর্মসংস্থান, বন, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, পানিসম্পদ, জ্বালানি ও খনিজ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় কার্যসমূহ একদিকে সাধারণী প্রশাসনিক বলয় (generalist domain) থেকে বিশেষায়িত সংগঠনে (Specialist domain) ও জনপরিসরে প্রত্যর্পণ, অপরদিকে নিম্ন পর্যায়ের ভৌগোলিক এলাকায় সম্প্রসারণ। সবশেষে ক্ষমতা ও কার্য স্থানান্তরের সাথে সাথে ঐ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন যুগপৎভাবে হতে হবে। সে অর্থ সকল সময়ে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দিতে হবে তা নয়, স্থানীয়ভার সেবার মূল্য, কর, লেভি, ফি ইত্যাদির মাধ্যমেও অর্থায়ন হতে পারে। বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়ায় এখানে প্রদেশ না থাকলেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সীমিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বি-পুঁঞ্জিভূতকৃত সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীর রয়েছে এবং রয়েছে সুবিশাল সাংগঠনিক কাঠামো। সনাতনী বিকেন্দ্রীকরণ ধারণায় অর্থ, বাণিজ্য, ভোক্তা ও সেবাগ্রহীতার পছন্দ-অপছন্দ বিশেষ গুরুত্ব পেত না। বিকেন্দ্রীকরণের আধুনিক ধারণায় ভোক্তা অধিকার ও নাগরিক পছন্দ একটি প্রধানতম স্তম্ভ। ভোক্তার প্রদত্ত মূল্যের সাথে পণ্যমানের সংযোগ ও অনুপাত একটি প্রধানতম বিবেচ্য বিষয় হবে। তাই সরকার গঠন ও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে জনমত একটি প্রধান নির্ণায়ক হবে।

অতি কেন্দ্রায়ন ও প্রশাসনিক কোষ্ঠকাঠিন্য

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্বাহী ও রাজনৈতিক কাঠামো অতি কেন্দ্রায়িত। এটি কোনো নতুন

আবিষ্কার বা নতুন সমালোচনা নয়। কিন্তু এ অবস্থা থেকে উত্তরণের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা নেই। অপরদিকে কেন্দ্রায়ন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তা আর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, ব্যাক্তির খেয়াল খুশি নির্ভর হয়ে পড়েছে। অস্বচ্ছতা আর জনজবাবদিহিতার অভাব সর্বত্র। প্রশাসনিক ক্ষমতার অতি-কেন্দ্রায়ন এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছে, এ অকার্যকর প্রশাসনের একটি বিশেষ প্রকাশ 'প্রশাসনিক কোষ্ঠকাঠিন্যে' (Administrative constipation) রূপলাভ করেছে। প্রশাসন থেকে কোনোকিছুই আর সহজে ডেলিভারি হয় না। মানুষের শরীরে এ জাতীয় সমস্যা দেখা দিলে ল্যাক্সেটিভ দেওয়া হয়। তাতে কঠিন কোষ্ঠ তরলায়িত হয়ে যথাস্থানে ডেলিভারি হয়ে শরীরের সকল স্বাভাবিক প্রবহমানতা ফিরে আসে। আইনের শাসনের অধীনে 'বিকেন্দ্রায়ন' তেমনি একটি মহৌষধ। এটি প্রশাসনিক কোষ্ঠকাঠিন্য নিরসন করে ক্ষমতা ও কর্মযজ্ঞের সতত প্রবাহ দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত করে দেয়। ক্ষমতার চর্চা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয় এবং সকল কাজের সুসম সুফল স্বাভাবিকভাবে সর্বত্রগামী হয়।

বিকেন্দ্রায়নের তত্ত্বীয় ধারণা

জাতীয়ভাবে বিকেন্দ্রায়ন নীতি প্রণয়ন করতে হলে বিকেন্দ্রায়নের তত্ত্বীয় কাঠামোর উপর একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিকেন্দ্রায়ন বা বিকেন্দ্রীকরণের চারটি স্বীকৃত ধরন রয়েছে। যথা—

১. বি-পুঞ্জীভূতকরণ (Deconcentration)
২. অর্পণ (Devolution)
৩. প্রত্যর্পণ (Delegation) ও
৪. বেসরকারিকরণ (Privatization)।

বিকেন্দ্রীকরণের বি-পুঞ্জীভূতকরণ (Deconcentration) ধারণা সরকারের নির্বাহী কাঠামোর অভ্যন্তরে চর্চিত হয়। রাষ্ট্র নানা নির্বাহী আদেশ দিয়ে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, দায়-দায়িত্ব, অর্থ সরবরাহ শাসন কাঠামোর বিভিন্ন একক, স্তর ও সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে বণ্টন ও বরাদ্দ করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কেন্দ্রিক প্রশাসন ও সেবার দায়িত্ব বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক অধস্তন দপ্তরে প্রত্যর্পিত হয়।

অর্পণ বা ডিভ্যলুশান নির্বাহী আদেশে নির্বাহী বিভাগের ভেতরে হয় না। এটি সংবিধানের নির্দেশনার আলোকে আইন সভা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আইন, বিধি বিধান প্রণয়ন, অর্থ সংগ্রহ, করারোপসহ ও আর্থিক, প্রশাসনিক, সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, দায়-দায়িত্ব শাসন কাঠামোর বিভিন্ন একক ও স্তরে প্রদান করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সংস্কার আলোচনায় প্রশ্ন দেখা দিবে, বিকেন্দ্রীকরণ

ধারণার 'অর্পণ' (Devoution) ধারণা বা ধরণটি এখানে যথাযথভাবে কার্যকর কি না। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রদেশ বা স্টেট পর্যায়ে একই প্রক্রিয়ায় ঐ ক্ষমতা অর্পিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া জাপান, জার্মানি, ভারত প্রভৃতি দেশে এভাবে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের একটি আদর্শ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের দেশে যেহেতু প্রদেশ নেই, তাই হয়ত স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিকেন্দ্রায়ন এখানে কীভাবে কতটুকু করা প্রয়োজন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়নি।

বিকেন্দ্রীকরণ ধারণার প্রর্ত্যপণ (Delegation) সাধারণ ব্যবস্থাপনার 'ডেলিগেশন অফ অথরিটি' নয়। এটি একটি ভিন্নতর ধারণা ও প্রক্রিয়া। বিকেন্দ্রীকরণের অধীন *ডেলিগেশনের* আওতায় সাধারণী বিভাগ বা মন্ত্রণালয় স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিশেষ বিশেষ পৃথক বা বিশেষায়িত কার্যাদি সুচারু রূপে সম্পাদনের জন্য বিশেষায়িত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। যেমন—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, ধর্ম, বন ও পরিবেশ, মহিলা ও শিশু, সমাজকল্যাণ, শ্রম, কৃষিসহ নানা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কেন্দ্রিক ৪০০-এর অধিক নানা দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বোর্ড, করপোরেশন, কর্তৃপক্ষ, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, কমিশন, সাংবিধানিক সংস্থা, সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা, ইত্যাদি রয়েছে (সরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকার একটি সারণি পরিশিষ্ট-৩ এ দেখা যেতে পারে)। এই বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান বা এককসমূহ যথা পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, সাংবিধানিক ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ কতটুকু স্বায়ত্বশাসন বা স্বাধীন কর্মপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে, তাদের দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও অবদান কীভাবে কতটুকু মূল্যায়ন হয় এবং মন্ত্রণালয় ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের খবরদারি ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্ক ইত্যাদির বস্তুনিষ্ঠ পূনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠানের সময়োপযোগিতা ও কর্ম উপযোগিতা মূল্যায়ন করে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন আধুনিকায়ন, পুনর্গঠন, সুসমকরণ, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু সংস্থার একত্রিকরণ (merger) ও কিছু সংস্থার বিলুপ্তি।

বেসরকারিকরণ (Privatization) আজকাল বিকেন্দ্রীকরণের একটি কার্যকর পদ্ধতি ও ধরন হিসেবে অতি সমাদৃত হচ্ছে। একসময় রাষ্ট্রের সকল সেবা ও সরবরাহ (Supply and Services) কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য ছিল। সে হিসেবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সদ্য ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত দেশসমূহ জাতিগঠনের অংশ হিসেবে সরকারের আমলা কাঠামোর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নানা সেবা ও উন্নয়ন সংস্থা গড়ে তোলে। কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সরবরাহ, প্রভৃতি কাজের জন্য সরকারি সংস্থা সৃষ্টি করে। কালক্রমে দেখা যায় সরকারি খাতের ঐসব সংস্থার অদক্ষতা, দুর্নীতি ও গণবিরোধী নীতির কারণে সেবা ব্যবস্থা অদক্ষ ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সরকার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সর্বজনীনভাবে অসফল। তাই দেখা যায় আজকাল পরিবহণ ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি

সরবরাহ, টেলিফোন ব্যবস্থাসহ সকল সেবার বেসরকারিকরণ এবং তাতে ভোক্তার পছন্দের পরিসর বেড়েছে, কমেছে সেবামূল্য এবং অবসান ঘটেছে একচেটিয়াত্বের (Monopoly)। অপরদিকে ব্যাংক, বিমা, ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দারিদ্র্য বিমোচন কাজে এনজিওর সম্পৃক্তি, ইত্যাদি অনেক সুফল বয়ে এনেছে। সরাসরি মুনাফামুখী বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম সমর্পন না করেও বেসরকারিকরণের আরও চারটি মধ্যস্থতাকারী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যবহার করা যায়। সে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো হচ্ছে যেমন —

১. দাতব্যায়ন (Philanthropization)
২. মধ্যস্থতায়ন (Intermediation)
৩. মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতায়ন (marketization) ও
৪. বিচ্ছিন্নকরণ (Dispersal)।

দাতব্যায়ন — নানা দানশীল ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগে এদেশে একসময় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রাকারের যোগাযোগ অবকাঠামো এবং চাষাবাদ ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগে সংগঠিত হতো। এসব কাজের হাজার বছরের জনপরিসরে সরকারের সম্পৃক্তি মাত্র বিগত ষাট থেকে সত্তর বছরের ইতিহাস। দেশের বিদ্যমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ এবং নামকরা শতবর্ষি কলেজগুলোর সবই বেসরকারি, ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগের ফসল। অপরদিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মঠ, কবরস্থান, শ্মশান, ঈদগাহ, খেলার মাঠ অনেক কিছুই ব্যক্তি ও সমষ্টির দানশীলতার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। বর্তমানে দানশীলতা, সামষ্টিক উদ্যোগ, ব্যক্তির সমাজসেবার ঐতিহ্যের উৎসাহে ভাটার টান। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সেবা আগ্রাসন ব্যক্তি পরিসরকে সংকুচিত করে দিচ্ছে। রাষ্ট্র এখন মসজিদ-মন্দির ও ধর্মীয় কাজেও অর্থ বরাদ্দ করে। এক শ্রেণির রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রীয় অর্থে এসব কাজ করে বাহবা নিতে চায়। দেশে জাকাত, ফিতরা, সদকার দান খুব সামান্য নয়। এসব উৎসের অর্থ রাষ্ট্রীয়নীতির কারণে বৃহত্তর পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবদান রাখতে অসমর্থ বা অনুৎসাহিত। দানশীলতা ও দাতব্য কর্মকাণ্ডে যেসব সেবার অপার সম্ভাবনা, রাষ্ট্রের সেসব ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে এসে ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত।

মধ্যস্থতায়ন একটি রাষ্ট্র স্বীকৃত উপায়। নির্মাণ কাজে ঠিকাদারি, চুক্তিভিত্তিক নানা কাজ — পিপিপি এসবের আধুনিক উদাহরণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি এবং ক্ষেত্র বিশেষে এনজিও রাষ্ট্রের পক্ষে অনেক কাজ করে থাকে। কিন্তু জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি প্রণীত হলে সে নীতির আওতায় সাব-কন্ট্রাক্টিং, মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ও পিপিপি আরও গতি লাভ করবে। সরকারের সক্ষমতা ও সম্পদের উপর চাপ কমবে। উন্নয়ন কাজের আকার, পরিমাণ ও গতি বাড়বে। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন

কাজের সৃজনশীল ক্ষেত্র।

সর্বশেষ মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতা ও বিচ্ছিন্নকরণ বিষয়ের ক্ষেত্র আরও অনেক বেশি সম্প্রসারিত হতে পারে। মুক্ত বাজারকে কাজ করতে দিলে উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থার অদক্ষতা দুর হয়ে যায় এবং প্রতিযোগিতায় অক্ষম বা দুর্বল উৎপাদক বাজারে টিকতে পারে না, তাতে শেষ পর্যন্ত ভোক্তা উপকৃত হয়। এ ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার প্রতিযোগিতাকে সুস্থ ধারায় বিকাশের জন্য রাষ্ট্রকে অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী রেগুলেটর নিয়োগ করতে হয়। যারা পণ্যের গুণ-মান ও দাম নির্ধারণে সহায়ক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করবে।

বিকেন্দ্রায়ণ নীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য:

জাতীয় বিকেন্দ্রায়ণ নীতি হবে দেশের রাজনীতি, শাসন কাঠামো এবং নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামষ্টিক রূপরেখা (Macro Framework)। সংবিধানের মূলনীতি ও অন্যান্য নির্দেশনা এ নীতিতে প্রতিফলিত হবে। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের সংবিধানটি কেন্দ্রায়িত শাসনের নীতিকে উৎসাহিত করে। এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ, নির্বাচনী ব্যবস্থার গলদ ও প্রধানমন্ত্রীর একনায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে সংবিধান সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাই সংবিধানের চতুর্থ ভাগের নির্বাহী বিভাগ এবং পঞ্চম ভাগের আইনসভা অংশে ব্যাপক পরিবর্তন দরকার হবে। তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার লজ্ঘন রোধ এবং এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করা সমীচীন হবে। অনুরূপভাবে স্থানীয় সরকার আইনের প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্যও গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় সংবিধান ৭৩তম সংশোধনীতে স্থানীয় সরকারের সুরক্ষায় গ্যারান্টি ক্লজের বিধান যুক্ত রয়েছে।

জাতীয় বিকেন্দ্রায়ণ নীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ-বিকেন্দ্রায়ণের কোনো একটি একক ধারণা বা ধরনের বিচ্ছিন্ন বাস্তবায়ন যথেষ্ট এবং যথার্থ নয়। এখানে সবগুলো ধরন ও ধারণার যুগপৎ প্রয়োগ করতে হবে এবং সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে মাত্রা বা ডিগ্রি নির্ধারণ করতে হবে। ধীরে ধীরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আওতা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। রাতারাতি সরকারি সংস্থা ও কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বি-পুঞ্জীভূতকরণ, অর্পণ, প্রত্যর্পণ ও বাজারায়ণ ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারবে না। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের সীমারেখা ও জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট বিধান করে তার কড়াকড়ি মনিটরিং-এর প্রয়োজন হবে। ডেলিগেশন নীতির আওতায় সৃষ্টি করা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর মন্ত্রণালয়ের বাড়তি খবরদারি বা দৈনন্দিন প্রশাসনিক বাড়াবাড়ির অবসান করে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা বাড়াতে হবে। মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন, নীতি সংশোধন, বাস্তবায়ন তদারকিতে সব কাজ সীমাবদ্ধ রাখবে। মন্ত্রণালয়সমূহ আজকাল প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। উপ-সচিব

থেকে সচিব পর্যন্ত সকল পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়। এটি মন্ত্রণালয়ের 'রুলস অফ বিজনেস'-এর পরিপন্থি। মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন তদারক করবে। কিন্তু সরাসরি বাস্তবায়ন করলে তার তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকার সাথে তা সাংঘর্ষিক হয়। এভাবে দেখা যায় অনেক মন্ত্রণালয় অধস্তন দপ্তর, অধিদপ্তর, করপোরেশন, বোর্ড, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে। এখানে বিকেন্দ্রায়নের ডেলিগেশন নীতি ভঙ্গ হয়। তাছাড়া অনিয়মের মাধ্যমে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের যানবাহন ও যন্ত্রপাতির অপব্যবহার করে। এমনও দেখা গেছে কোনো প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামে মন্ত্রণালয়ের কোনো ডেস্ক কর্মকর্তা ঢুকে পড়ে। সেমিনারের প্রবন্ধ থেকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সবই মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তাকে তৈরি করে দিতে হয়, তিনি বিদেশে যাওয়ার সময় তা নিয়ে যান। আজকাল মন্ত্রণালয়ে বেশি সংখ্যায় বা সংখ্যাতিরিক্ত পদবিহিন পদোন্নতিতে ডেস্ক, চেয়ার টেবিল ও কাজ দেওয়ার সংকট নিরসনের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে পদবিহীন পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের ঢালাও প্রেষণ দেওয়া হয়। সে সব কর্মকর্তা ঐ সব পদায়নে কোনো কার্যকর অবদান রাখা দুরে থাকুক একটা বোঝাস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। এসব অপচর্চা বন্ধ করতে হবে। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধস্তন ভাবার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের বিশেষায়িত জ্ঞান অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং তা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। ডিলিগেটেড প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও অধস্তন মানসিকতা পরিহার করে মেরদণ্ড সোজা ও শক্ত করার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিকেন্দ্রায়নের বেসরকারিকরণ নীতিমালা সুচিন্তিতভাবে বাস্তবায়ন হলে সরকার দৈনন্দিন অনেক কাজের ভারমুক্ত হয়ে অনেক বেশি নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকি কাজে মনোযোগী হতে পারবে। সরকারের জনবল কমে সরকারের আকার ছোট ও স্মার্ট হবে। সমাজের সর্বত্র ক্ষমতায়ন হবে ও সমাজের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ক্ষমতা ও কাজের পৃথকীকরণ — সংবিধানের ২২তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে '*রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন*'। এ নীতিটি বিকেন্দ্রীকরণের একটি মূল্যবান নীতি কাঠামোর অংশ। এ নীতি বাস্তবায়ন না হলে মাঠ পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ সঠিকভাবে কাজ করবে না। কেন্দ্রীয় বা উচ্চ আদালত পর্যায়েও সংবিধান নির্দেশিত 'মৌলিক অধিকার' ও 'সর্বজনীন মানবাধিকার' বলবৎ বাধাগ্রস্ত হবে। জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণ নীতির আওতায় বিচার বিভাগেরও কিছু সংস্কার সাধন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। যেমন, জনসংখ্যা, আদালত ও বিচারকের

অনুপাত একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। উচ্চ আদালত শুধুমাত্র ঢাকায় বা নিম্ন আদালত জেলা শহরে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকায় আদালতে সাধারণের অভিগম্যতা বাধাগ্রস্ত। বর্তমানে বিচারালয়ে গমনাগমন বা প্রবেশাধিকার জটিল ও দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রথমে সবার সহজ প্রবেশ (Access) ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তারপর আসবে সুবিচারের প্রসঙ্গ। দেশের সকল আদালতে বিচারকের স্বল্পতা প্রকট। এটি যে-কোনো মূল্যে পূরণ করতে হবে।

বার এবং বেঞ্চ ঢাকার বাইরে উচ্চ আদালত যাতে না যায় সে বিষয়ে অযৌক্তিভাবে কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। বিষয়টি রাজনীতিবিদদের দেখতে হবে। ঢাকার বাইরে অন্তত চারটি হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন জরুরি। দ্বিতীয় বিষয় হলো নিম্ন আদালতকে জেলায় সীমাবদ্ধ রাখা এখন আর যুক্তিযুক্ত নয়। দেওয়ানি ও ফৌজদারি দুটির রেকর্ড, শুনানি ও বিচার উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ের নিম্ন আদালত উপজেলাতেই স্থাপিত হতে হবে। জেলা আদালত মধ্যবর্তী আদালত হিসেবে গণ্য হতে পারে। আদালতের স্তর বিন্যাস নিচ থেকে উপজেলা আদালত, জেলা আদালত, ঢাকার বাইরের চারটিসহ মোট পাঁচটি হাই কোর্ট বেঞ্চ এবং আপিলেট ডিভিশনকে সুপ্রিম কোর্ট নামকরণ করা হউক। ফেডারেল রাষ্ট্র না হলে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট করা যাবে না এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। 'জনগণের অভিপ্রায়' সংবিধান। জাতীয় সংসদ এ বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সংবিধান বিচার এবং নির্বাহী বিভাগকে পৃথকীকরণের বিষয় ২২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছে। কিন্তু আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের যে বিভক্তি তা সম্পূর্ণ অকার্যকর। আইন বিভাগের সদস্য প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী, প্রতি মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীবর্গ ছাড়া বাকি কেউ কোনো নির্বাহী দায়িত্ব পেতে পারে না। কারণ নির্বাহী বিভাগ আইন বিভাগের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহি করে। কোনো জাতীয় সংসদ সদস্য কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও স্থানীয় যে কোনো প্রশাসনিক ও সেবা আদান প্রদানে সরাসরি ভূমিকা নিতে পারেন না। বর্তমানে নানা নির্বাহী আদেশ বলে এবং স্থানীয় সরকার আইনে 'উপদেষ্টা'র যে বিধানসহ নির্বাহী কাজের যত রকমের অফিস আদেশ সব সুপ্রিম কোর্ট সুয়ো-মুটো বাতিল করতে পারে।

বিচার বিভাগ তথা দেশের কোনো আদালত মন্ত্রণালয় থেকে কোনো আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করবে না। দেশে 'আইন, সংসদ ও বিচার বিষয়ক' যে মন্ত্রণালয় আছে তা হবে 'আইন ও সংসদ বিষয়ক' মন্ত্রণালয়। বিচার বিভাগের নির্বাহী কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রধান বিচারপতির অধীনে একটি বিচারবিভাগীয় সচিবালয় থাকবে। সে সচিবালয় থেকে বিচারক নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে। আর্থিক বিষয় দেখার জন্য প্রেষণে অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগ বিচার বিভাগীয় সচিবালয়ে সংযুক্ত থাকবে। হাইকোর্টের একজন বিচারপতি বিচার বিষয়ক সচিবালয়ের প্রধান হিসেবে

কাজ করবেন এবং তিনি সরাসরি প্রধান বিচারপতির কাছে জবাবদিহি করবেন।

এই অধ্যায়ের শুরুতেই 'আইনের শাসন'-এর কথা বলা হয়েছে। আইনের শাসন নিশ্চিতের একটি প্রধানতম হাতিয়ার হবে ক্ষমতার সুষম বিকেন্দ্রীকরণ এবং আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের কাজের পৃথকীকরণ। পৃথকীকরণ নীতিকে বাস্তবায়ন করার পর আসবে রাষ্ট্রের তিন অঙ্গর মধ্যে কাজ ও ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন। রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার প্রধানতম হাতিয়ার সংবিধান। সে সংবিধানের নানা চিহ্নিত সীমাবদ্ধতা সংশোধন করে তার আওতায় নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করেই জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। প্রথম দুটি পদক্ষেপ তৃতীয় পদক্ষেপের পূর্বশর্ত। এ তিনটি নীতিগত সংস্কার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থায়ীত্বশীল, নাগরিক বান্ধব ও কল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনকে নির্বিঘ্ন করবে।

চার

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার : সকল স্থানীয় নির্বাচন একটি একক তপশিলে করা সম্ভব

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন নানা কারণে জটিল, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বর্তমান স্থানীয় সরকার কাঠামো গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা চর্চার অনুকূল না হওয়ায় একদিকে যোগ্য নেতৃত্ব বিকাশে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারছে না, অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা চর্চায় থাকছে না যুগোপযোগী ভারসাম্য। প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে পড়ছে এক ব্যক্তি তথা চেয়ারম্যান বা মেয়র সর্বস্ব এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর একদিকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশাসনিক খবরদারি অপরদিকে উপরের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ দিন দিন বাড়ছে। মেয়র ও চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়ে পড়েছে অতিমাত্রায় ব্যয়বহুল। সদস্য ও কাউন্সিলর নির্বাচন হয়ে পড়ছে সম্পূর্ণভাবে গুরুত্বহীন। তাই আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাঠামোকে সংস্কার করে নির্বাচন পদ্ধতির সহজীকরণ এবং সাংগঠনিক কাঠামোকে ভারসাম্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। বিষয়টি নীতি নির্ধারকদের গভীর মনযোগ দাবি করে।

আমাদের জাতীয় ও স্থানীয় সরকার উভয়ের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। জাতীয় সরকারের নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর পর একবারই হয়, কিন্তু একটি জাতীয় সরকারের মেয়াদের পাঁচ বছর সময়সীমার পাঁচ বছর ধরেই নানা স্তরের স্থানীয় সরকারের অসংখ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। নির্বাচনকাল সকল দেশে সর্বসময়ের জন্যই একটি অস্থিরতার সময়। অস্থিরতা সমাজের ও রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কাজে কম-বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি করেই থাকে। স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচন একটি একক তপশিলে সর্বাধিক একমাস বা পঁয়তাল্লিশ দিন সময় নিয়ে শেষ করা যায়। এ নির্বাচন হবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী ও সময় সাশ্রয়ী। এ নতুন নির্বাচন স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক ও স্থানীয় জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমান ব্যবস্থায় পাঁচটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পৃথক পাঁচটি তপশিলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি তপশিলে ৪৫ দিন করে একটি পাঁচ বছরের সরকারের সর্বমোট ২ শত ২৫ দিন সময় ব্যয় হয়। আর্থিক এবং প্রশাসনিক ঝক্কি-ঝামেলার কথা এ সময় নাই বা বলা হলো। সরকারের সমন্বিত ও পরিকল্পিত উন্নয়ন কাজেও প্রচুর বিঘ্ন ও অপচয় ঘটে। এ পাঁচটি প্রতিষ্ঠান এক একটি জেলার ভৌগোলিক কাঠামোতে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে কাজ করে থাকে। বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচন যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে হয়, তাই ভিন্নভিন্ন সময়ে মেয়াদকাল শুরু ও শেষ হয়। এ কারণে একটি বিশেষ এলাকায় জাতীয় সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অর্থ বছরের বাজেটের সাথে তাল রাখা যায় না। তাছাড়া আন্ত-প্রতিষ্ঠান সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রেও সময়কালের একটি অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। এক সাথে সকল নির্বাচন সম্পন্ন করা গেলে এ দুটি ক্ষেত্রেও একটি শৃঙ্খলা আনয়ন সহজ হতে পারে।

জেলা পরিষদ ছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিজন ভোটার তিনটি করে ভোট দিয়ে থাকেন। পৌরসভা, সিটি করপোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের বেলায় প্রতিজন নাগরিক মেয়র বা চেয়ারম্যানকে একটি, সাধারণ সদস্য বা কাউন্সিলরকে একটি এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য বা কাউন্সিলরকে একটি করে ভোট দিয়ে থাকেন। গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ভোটার এবং সিটি করপোরেশন বাদে সকল পৌর এলাকার ভোটারগণ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের দুই ভাইস-চেয়ারম্যানকে মোট তিনটি ভোট দিয়ে থাকেন। জেলা পরিষদে সাধারণ নাগরিকগণের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না বা সাধারণের ভোটাধিকার নেই। জেলা পরিষদও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত। নতুন প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তা অতি সহজে করা সম্ভব।

ভোটে শৃঙ্খলা বিধান বা সহজীকরণের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো এবং আইন কাঠামোর সামঞ্জস্যতা বিধান প্রয়োজন। বর্তমানে জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক এলাকা নির্বিশেষে প্রতি জেলায় — জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ঐ জেলার উপজেলার সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কারণ প্রতি উপজেলা থেকে একজন সদস্য এবং মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ নারী এবং জেলার অধীন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যন ও পৌরসভার মেয়রগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হন। ২০২২ সনে জেলা পরিষদ আইন ২০০০ সংশোধন করে পরিষদের সদস্য কাঠামোতে পরিবর্তনটি করা হয়। এ পরিবর্তন জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোর মূল অসামঞ্জস্যতার নিরসন করেনি। জেলা পরিষদে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। বর্তমান আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যানসহ তিনজন এবং ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানসহ ১৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জেলায় সাধারণ ভোটারদের ভোটাধিকার নাই। উপজেলা পরিষদের ওয়ার্ডভিত্তিক সদস্য নির্বাচন নেই। শ্রেণি ও আকার অনুযায়ী পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে কাউন্সিলর সংখ্যা কম-বেশি হয়। সেটি পূর্ণমাত্রায় যুক্তিসঙ্গত। অন্য তিনটি তথাকথিত গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও আয়তন বিবেচনায় সদস্য পদে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। পদের ধরণ ও নির্বাচন পদ্ধতিও এক ও অভিন্ন নয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টাপ্লান ২১০০-এর আলোকে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে উত্তরণের উপযোগী উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি সহায়ক স্থানীয় শাসন কাঠামো বিনির্মাণের স্বার্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনর্বিন্যাস

করে ব্যাপক আধুনিকায়ন প্রয়োজন। এই পুনর্বিন্যাসের জন্য মোটা দাগে নিম্নের ৬টি বিষয় সিরিয়াস মনোযোগ দাবি করে।

১. **স্থানীয় সরকারে গ্রাম ও নগরের বিভক্তি ও স্তর সংখ্যা হ্রাস :** প্রশাসনিক, আর্থিক এবং স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারের সঠিক সমন্বয় ও সংহত করার জন্য বহুস্তরীয় স্থানীয় সরকারের স্তর ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা হ্রাস বা সুসমকরণের বিষযটি এখন ভাবার সময় এসেছে। সময় এসেছে গ্রামীণ ও নগর স্থানীয় সরকারের বিভক্তি এখন আর প্রযোজ্য হবে কি-না তা ভাবার। এক সময় সারা বাংলাদেশটাই ছিল একটি গ্রাম। এখন বাংলাদেশের শহর-গ্রামের জীবন-জীবিকা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনেক কাছাকাছি। তেমনি জীবন সংগ্রাম, জীবন চাহিদা এবং জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও অনেকটা কাছাকাছি। দেশে পঞ্চাশ বা ষাট বছর আগের যে গ্রাম, তা আর সে অবস্থা ও অবস্থানে নেই। গ্রামের মানুষ এখন গ্রামে থেকেও শহুরে জীবনযাপন করে। সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, যানবাহন, শিক্ষা, অকৃষি পেশার প্রাধান্য গ্রামীণ জীবনে ব্যাপক পরিববর্তন নিয়ে এসেছে। তাই বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাঠামোতেও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সরকার গ্রাম-শহর বিভক্ত করে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে দিয়েছে সে ব্যবস্থাকে শত শত বছর অবিকল লালন করতে হবে তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তাই এখন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নগর এবং গ্রামের বিভক্তি বিলুপ্তির সময় এসেছে। প্রয়োজন একীভূত একটি একক কাঠামো। তাতে স্তর সংখ্যাও কমবে, কমবে সংঘাত এবং হ্রাস পাবে সরকারের অনুৎপাদনশীল ব্যয়।

২. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি একক আইন বা মাদার ল দরকার :** স্থানীয় সরকারের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি পৃথক আইন এবং পাঁচটি ভিন্ন ও পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো এবং তিনটি ভিন্ন পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তঃ প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের স্বচ্ছ কোনো রূপরেখা নেই। নেই আন্তপ্রতিষ্ঠান কর্ম সম্পর্ক। সমন্বিত কোনো কর্মচারী কাঠামো নেই। কর রাজস্ব সংগ্রহেও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা অনুপস্থিত। এ জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক সকল স্থানীয় সরকারে প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচটি পৃথক আইনের পরিবর্তে একটি একক সমন্বিত আইন কাঠামো বা একটি ফ্রেইমওয়ার্ক ল (Framework law or mother law)। যেমন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে সমন্বিত 'পঞ্চায়েত রাজ অ্যাক্ট'। ভারতে একটি একক আইনের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা মণ্ডল পঞ্চায়েত (ব্লক পর্যায়) ও জেলা পরিষদ গঠিত হয়, একটি অভিন্ন তপশিলে তিন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ও সহযোগিতা নিশ্চিত হয়। পাকিস্তানি সময়ে এক 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৬০' দ্বারা ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল ও মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠিত ও পরিচালিত হতো। একটি আইন কাঠামোতে সবগুলো প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হলে প্রশাসনিক সুবিধা অনেক বেশি। একই আইনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্ম বিভাজন থাকবে আবার সমন্বয়েরও বিধান থাকবে। এখন স্থানীয় সরকারের কার্যকর আইনের সংখ্যা কয়েকশত। এ সব আইন দেখে কেউ কখনও পরিষদসমূহ পরিচালনা করে

না। বেশিরভাগ বিধিবিধানগুলো একটি আর একটির হুবহু নকল, কোনো ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। তাই হয়ত প্রতিনিয়ত সার্কুলার জারি করে স্থানীয় সরকার চালাতে হয়। তাই শত আইন ও সার্কুলারের অরণ্য থেকেও এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুক্ত করে কার্যকর ও যুগোপযোগী একটি আইন কাঠামো প্রতিস্থাপন প্রয়োজন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের একটি মন্দ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেখানে গ্রামীণ ও নগরীয় স্থানীয় সরকার দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীন। কারণ রাজ্যে মন্ত্রীর পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করলে বেশি বেশি নেতাকে মন্ত্রী করা যায়। সেখানে কোথাও মাটির উপরের পানি ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য দুইজন জল সম্পদ মন্ত্রীর পদ সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছিল। বাংলাদেশ সে তুলনায় ভালো আছে। ভারতের কেন্দ্রেও নগরীয় ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে।

৩. **রাষ্ট্রপতি আদলের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির স্থানীয় সরকার কাঠামো :** জাতীয় সরকারের আদলে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংসদীয় পদ্ধতিতে পুনর্গঠন প্রয়োজন। তাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে অনেকগুলো সুফল পাবে। ক. পুরো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সদস্য বা কাউন্সিলরদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। খ. মেয়র ও চেয়ারম্যান পদ প্রত্যাশীরা সবাই প্রথমে কাউন্সিলর এবং সদস্য হবেন। ফলে কাউন্সিলর এবং সদস্য পদের নেতৃত্বের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। পরিষদের সাধারণ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটিসমূহ কার্যকর অবদান রাখতে পারবে। গ. চেয়ারম্যান বা মেয়রগণ সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন এবং জাতীয় সরকার বা অন্য সরকারি কর্মকর্তা নয়, পরিষদের কাছে জবাবদিহি করবেন। ঘ. দলীয় প্রতীকের নির্বাচন সত্যিকার অর্থে সংসদীয় পদ্ধতির অধীনেই অর্থবহ হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে সদস্য ও কাউন্সিলরগণ দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করবেন। নির্বাচনের পর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দলীয় সরকার গঠিত হবে। ঙ. নির্বাচনের পর দল বদলের অবকাশ থাকবে না। চেয়ারম্যান বা মেয়রের অপসারণ ও বাজেট অধিবেশন ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে সকল সদস্য স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। চ. সিটি অথবা সকল পরিষদের সকল সাধারণ অধিবেশনে মেয়র বা চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন না। কাউন্সিল বা পরিষদ নির্বাচনের পর পর প্রথম অধিবেশনে সকল সদস্য বা কাউন্সিলরগণ একজন 'সভাপতি' বা সভাধিপতি নির্বাচন করবেন। সভাপতি বা সভাধিপতির ভূমিকা হবে জাতীয় সংসদের স্পীকারর মতো। তিনি চেয়ারম্যান বা মেয়রের সাথে পরামর্শক্রমে, ৪০ শতাংশ সদস্যদের অনুরোধে অথবা স্ব-বিবেচনায় পরিষদ বা কাউন্সিলের অধিবেশন আহবান করবেন। ছ. এক একটি অধিবেশন এক নাগাড়ে তিন দিনের বেশি স্থায়ী হবে না। আলোচ্যসূচির উপর ভিত্তি করে সভাপতি অধিবেশনের সময়সীমা নির্ধারণ করবেন। জ. পরিষদ বা কাউন্সিলই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং মেয়র বা চেয়ারম্যান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় 'প্রধান নির্বাহী' হিসেবে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। ঝ. মেয়র বা চেয়ারম্যান তার পছন্দনীয় কাউন্সিলর বা সদস্যদের মধ্য হতে জাতীয় সরকারের মন্ত্রী পরিষদের অনুরূপ পাঁচ বা অনধিক সাত জনের একটি নির্বাহী কমিটি করতে পারবেন। তারা পরিষদের পূর্ণকালীন অফিস হোল্ডার হিসেবে

গণ্য হবেন এবং পরিষদ বা কাউন্সিলের বিভিন্ন দপ্তরের পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করবেন। সে হিসেবে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবেন। ঞ. কাউন্সিল বা পরিষদে একটি স্বীকৃত বিরোধী দল, বিরোধী দলীয় নেতা ও 'ছায়া নির্বাহী সভা' (Shadow Executive Council) থাকবে। ট. বিরোধী নেতা ও সভাধিপতি বা সভাপতির পদমর্যাদা হবে মেয়র বা চেয়ারম্যানের এক ধাপ নিচে। ঠ. একটি পরিষদ বা কাউন্সিলের পদমর্যাদাক্রম হবে নিম্নরূপ—মেয়র বা চেয়ারম্যান, সভাপতি বা সভাধিপতি, পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা, স্থায়ী কমিটির চেয়ার এবং সাধারণ সদস্য ও কাউন্সিলর এবং, ড. মেয়র, চেয়ারম্যান, সভাধিপতি, বিরোধী দলীয় নেতা ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে বেতন-ভাতা পাবেন। অন্য সকল সাধারণ সদস্যগণ সার্বক্ষণিক অফিস করবেন না, তাই তারা সভায় অংশগ্রহণের জন্য শুধু সম্মানী পাবার অধিকারী হবেন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও খণ্ডকালীন কোনো ব্যবস্থা নেই। কেউ কাজ করুক না করুক, সভায় যোগদান করুন আর নাই করুন, সবাই সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে ভাতা পান।

৪. **নারীর আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থায় আবর্তন পদ্ধতি প্রবর্তন :** নতুন ব্যবস্থায় নারীর সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা চক্রাকারে আবর্তন প্রক্রিয়ায় পুনর্গঠিত হতে পারে। বিষয়টি কিছুটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মতো, তবে আমাদের সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইব না থাকায় বাংলাদেশে নারীর আসন সংরক্ষণটা আরও সহজ হবে। প্রথমত প্রতিটি কাউন্সিলে বা পরিষদের মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হবে। এ সংরক্ষণ সাধারণ আসনের অতিরিক্ত আসন হিসেবে নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি ওয়ার্ড সংরক্ষণ। এ আইন কার্যকরের পর প্রথম নির্বাচনে যে সব ওয়ার্ড সংরক্ষিত হবে, সে সব ওয়ার্ডে কোনো পুরুষ প্রার্থী নির্বাচন করবেন না। শুধুমাত্র নারীরাই ঐ আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। দ্বিতীয় নির্বাচনে সেগুলি উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং উন্মুক্ত ওয়ার্ডে নারী-পুরুষ সবাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। দ্বিতীয় নির্বাচনে পুনরায় এক-তৃতীয়াংশের আর এক গুচ্ছ নতুন ওয়ার্ড সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত হবে। একই রীতিতে শুধুমাত্র ঐ এলাকার নারীগণ সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তৃতীয় নির্বাচনে পুরো পরিষদ এলাকার সংরক্ষিত ওয়ার্ডের আবর্তন বা রোটেশন শেষ হবে। একটি ওয়র্ডের একজন নারী প্রতি তিনটি নির্বাচনের একটিতেই শুধু সংরক্ষিত আসনের সুবিধা পাবেন। বাকি দুটি টার্ম সবার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। আদিবাসী ও নানা নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ঐসব সম্প্রদায়ের নারীদের এ সংরক্ষিত নারী আসনের বিশেষ সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় সারা পরিষদ এলাকার নারীগণ পর্যায়ক্রমে এ সুযোগ নিতে পারবেন। পুরুষ ও নারীর একই ওয়োর্ডের যে সংঘাত এতদিন বিদ্যমান ছিল, তা আর থাকবে না। এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য ৫ বছরের পুরো কার্যকালব্যাপী একটি ওয়ার্ডে কাজ করার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া উপযুক্ত নারীগণ দলের মনোনয়নে চেয়ার বা মেয়র, সভাধিপতি, বিরোধী দলের নেতা ইত্যাদি পদে নির্বাচিত হবারও সুযোগ পেতে পারবেন।

৫. **একক তপশিলে সকল প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন :** যদি সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থানীয়

সরকার ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয় তাহলে নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যয় সাশ্রয়ী, সময় সাশ্রয়ী এবং সহজতর হয়ে পড়বে। প্রথমত, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ এ দুটি পরিষদকে ওয়ার্ড ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে। প্রতিটি উপজেলার অধীন ইউনিয়ন সমূহের প্রতিটিকে তিনটি উপজেলা ওয়ার্ডে বিভক্ত করা যায়। এভাবে একটি উপজেলায় সর্বোচ্চ ৪৫ এবং সর্বনিম্ন ৩০টি ওয়ার্ড হতে পারে। একই রকমভাবে একটি জেলায় যত উপজেলা প্রতিটি উপজেলাকে তিন ওয়ার্ডে ভাগ করা যায়। প্রতি তিন ওয়ার্ডের একটি ওয়ার্ড নারীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং আবর্তক পদ্ধতিতে তার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিয়ন ও পৌরসভায় বর্তমান ওয়ার্ড সংখ্যাকে জনসংখ্যা ও ভোটার সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা দরকার। ইউনিয়ন পরিষদে প্রতি ৩০০ থেকে ৩৫০ ভোটার বা ১০০০ জনসংখ্যা পিছু একটি ওয়ার্ড করতে হবে। কোনো ইউনিয়নকে জনসংখ্যার কারণে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজন নেই। জনসংখ্যা বেশি হলে ওয়ার্ড বাড়বে। নির্বাচন যখন একটি একক তপশিলে হবে তখন প্রতিটি ইউনিয়নের ভোটার ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করে তিনটি ব্যালট পাবেন। একটি ব্যালট জেলা পরিষদ সদস্যের, একটি ব্যালট উপজেলা পরিষদ সদস্যের এবং একটি ব্যালট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের। প্রতিজন ভোটার তিনটি পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডের ভোটার। এক সাথে একদিনে তিনটি পরিষদের নির্বাচন শেষ হবে। পৌরসভার একজন ভোটার একই প্রক্রিয়ায় তিনটি ভোট দিয়ে দিবেন। সিটি করপোরেশনের ভোটারগণ শুধু দুটি ভোট দিবেন। একটি ভোট সিটি করপোরেশনের তার নিজের ওয়ার্ড সদস্যকে এবং অপর ভোটটি জেলা পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যকে। এভাবে নির্বাচনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোট হবে নিজ নিজ কাউন্সিল বা পরিষদের অভ্যন্তরে। সাধারণ নির্বাচনের সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি পরিষদ বা কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন হবে। সে অধিবেশনে সভাধিপতি, মেয়র ও চেয়ারম্যান এবং বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচিত হবে। নির্বাচনের পর মেয়র এবং চেয়ারম্যানগণ আইন নির্দেশিত পন্থায় 'নির্বাহী কমিটি'র সদস্য নিয়োগ করে দপ্তর বণ্টন করবেন। পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত হবে। এ সব সুপারিশের আলোকে ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃবৃন্দ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ১২ দফা একটি দাবিনামার খসড়া প্রস্তুত করেন। খসড়া দাবিনামাটি পরিশিষ্ট-৪ এ দেখা যেতে পারে।

৬. **গ্রামীণ পৌরসভাগুলোর বিলুপ্তি** : জেলা পর্যায়ের পৌরসভাগুলো বাদে বাকি উপজেলা ও গ্রামীণ বাজারকেন্দ্রিক পৌরসভাগুলো বিলুপ্ত করে পৌর কার্যক্রমগুলো উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে বণ্টন করে প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা সংহত করা যায়। সর্বোচ্চ ২ বর্গমাইল এলাকা যেখানে উপজেলা ও ইউনিয়ন বিদ্যমান সেখানে পৌরসভা হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিছু পৌরসভা গঠন করা হয়েছে। সে পৌর সভাসমূহ সেবা প্রদান এবং রাজস্ব আহরণের দিক থেকেও সম্পূর্ণ অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এজাতীয় পৌরসভাসমূহ সরকারের রাজস্বের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। তাই প্রযোজ্যক্ষেত্রে বি-পৌরকরণ

(De-municipalization) করতে হবে।

উপসংহার — গণতন্ত্রের অঙ্গীকারে স্বাধীন হওয়া এদেশের মানুষ সবসময়ই গণতন্ত্রের জন্য যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের একটি মহত্তম প্রয়াস নির্বাচন। তাই এদেশের গণতন্ত্রের ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ আশাবাদী। বর্তমান কালের রাজনৈতিক সংকট শুরু নির্বাচনকে ঘিরে। গণতন্ত্রের পথে নির্বাচন সাময়িক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তা অবশ্যই অপসারিত হবে। আমরা গণতন্ত্র চর্চার সোনালি দিনে ফিরে যেতে পারব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধশত বর্ষপূর্তির পর জরাজীর্ণ, পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিহীন ও প্রায় অকার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও ব্যাপক অব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাস ও ব্যয়বহুল স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থার ব্যাপক ও মৌলিক সংস্কার আশা করি।

পাঁচ

জাতীয় নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালট এবং এন.আর.বি. ও প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চাই

আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্র চর্চায় দুটি বিষয়ে দেশে দেশে বিপুল উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এক. নির্বাচন ব্যবস্থায় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধারণার প্রয়োগ এবং দুই. ভোটার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উদারভাবে 'পোস্টাল ব্যালট' ব্যবস্থা চালুকরণ।

পোস্টাল ব্যালট কী?

ভোটের দিন শারীরিকভাবে সরাসরি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটদানে অসমর্থ ভোটারদের জন্য ডাকযোগে ভোটদানের অন্যতম প্রধান উপায় পোস্টাল ব্যালট। নির্বাচনী তপশিল ঘোষণার পরপর একটি সময়সীমার মধ্যে ভোটারদের একটি অপশন দেওয়া হয়। যারা সরাসরি ভোট কেন্দ্রে না এসে ডাকযোগে বা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত অনলাইন বা ম্যানুয়েল পন্থায় ভোট দিতে আগ্রহী তাদের পৃথক একটি নিবন্ধন করা হয়। এই নিবন্ধিত ভোটারগণ ভোটের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে কমিশন নির্ধারিত একটি ফরমে অগ্রিম ভোট দান করতে পারেন।

দেশে দেশে পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি

পোস্টাল ব্যালট বা দুর-ভোটদান পদ্ধতি (Remote Voting System) নানা কারণে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হচ্ছে। কারণসমূহ—

১. আজকাল জীবন-জীবিকা ও নানা পেশাগত কারণে মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে তার স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থানের বাইরে থাকছে। যার ফলে ভোটের ঐ সময়ে অনেকের পক্ষে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোটদান সম্ভব হয় না।
২. অনুপস্থিত ভোটারদের একটি বড় অংশ এন.আর.বি. বা প্রবাসী শ্রমিক, যাদের পক্ষে কেন্দ্রে এসে সরসরি ভোটদান সম্ভব হয় না।
৩. অনেকের বয়স, শারীরিক অসমর্থতা ও যাতায়াতের অসুবিধা সরাসরি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
৪. ভোটকেন্দ্র সকল সময় নিরাপদ জায়গা নয়। ভোটকেন্দ্রসমূহে সন্ত্রাসের কারণে মানুষের আহত ও নিহত হবার ভয় রয়েছে। ভোটের জন্য মৃত্যু ঝুঁকি মানুষ কেন নিবে? তাই অনেকে কেন্দ্রের কাছাকাছি থেকেও ভয়-ভীতির কারণে কেন্দ্রমুখী হয় না।
৫. বাংলাদেশে বিগত অন্তত দুটি নির্বাচনে মানুষ ভোট কেন্দ্রে গিয়েও নিজের ভোট নিজে দিতে পারেনি। তাই মানুষ ভোটকেন্দ্রবিমুখ হয়েছে।

উপরের এ অবস্থাসমূহর মিলিত যোগফল মানুষের এখন ভোটকেন্দ্রবিমুখতা। ভোটকেন্দ্র বিমুখ মানে নির্বাচন বা রাজনীতিবিমুখতা নয়। উপরে উল্লেখিত পাঁচটি কারণ-এর উপযুক্ত প্রতিকার হলে মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত হবে। কুমিল্লার বিগত তিনটি সিটি নির্বাচনে (২০১২, ২০১৭ ও ২০২২ একটি বিশেষ এলাকায় ভোটার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর আমি একটি অনুসন্ধানী জরিপ পরিচালনা করি। ভোটের আগের দিন, ভোটের দিন এবং ভোটের পরের দিন নির্দিষ্ট কিছু বাড়ি ও পরিবারে গিয়ে তাদের কে কে সেন্টারে গেলেন, কারা গেলেন না, না গিয়ে থাকলে কেন এবং গিয়ে থাকলে কেন গেলেন, এ চারটি বিষয় জানার চেষ্টা করি। তিনটি নির্বাচনের নির্দিষ্ট থানা বা পরিবারগুলোর ভোটাচরণ তিনটি ভিন্নরূপ নিয়েছে। ২০১২ সনে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোর প্রায় ৭০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রে যায়নি। তাদের কেউ কেউ ভোটের পূর্বদিন রাতে শহর ছেড়ে পিকনিকও করেছেন। ২০১২ সনে কুমিল্লা শহরে ভোটের আগেরদিন কেমন জানি ভূতুড়ে জনপদের মতো মনে হচ্ছিল। বিকাল থেকে শহর ফাঁকা হয়ে যায়। সর্বত্র একধরনের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। কোটবাড়ি এলাকায় জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে র‌্যাব এটি বাড়ি অবরোধ করে রাখে। তাই পরদিন 'ভদ্রলোক' শ্রেণির মানুষের বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রে যায়নি। কোনো কোনো পরিবারের অপেক্ষাকৃত কম বয়সিরা কেন্দ্রে গেলেও বয়স্ক পুরুষ এবং সকল বয়সের নারীরা কেন্দ্রমুখো হয়নি। ২০১৭ সনে কোনো ভীতিকর পরিস্থিতি ছিল না। তবুও মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবার সমূহের পুরুষ ৬০ শতাংশ এবং মহিলাদের ৮০ শতাংশ কেন্দ্রবিমুখ ছিল। ২০২২ এর পরিস্থিতি ২০১৭ এর তুলনায় মারমুখী ও সংঘাতপূর্ণ থাকায় কেন্দ্রবিমুখতা বেড়ে যায়। অনেকে শহরের বাসায় অবস্থান করেও কেন্দ্রমুখো হয়নি। এটি মোট ভোটের ফলাফলেও প্রতিফলিত হয়েছে। ভূতুড়ে অবস্থার মধ্যেও ২০১২ সনে ৭২-৭৫ শতাংশ ভোট পড়ে। ২০১৭ সনে তা ৬২ শতাংশ এবং ২০২২ সনে ৫৭ শতাংশ এসে ঠেকে (আহমেদ ও পাল, *নগরায়ণ ও নগর সরকার*, ২০১৮)।

কোনো বিশেষ এলাকার ভোট বিশ্লেষণ যদিও এ লেখার প্রতিপাদ্য নয়, তবু একটি পর্যবেক্ষণ প্রকাশ হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, বাংলাদেশের সামাজিক শ্রেণিভিত্তিক ভোটে অংশগ্রহণ বিশ্লেষণে দেখা যাবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত লোকজনের চেয়ে নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গের মানুষের ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ বেশি। প্রার্থীগণের ভোট কৌশলও তাদের ঘিরে রচনা করা হয়। তাদের কেন্দ্রে আনার জন্য অনুপ্রেরণামূলক কর্মকাণ্ড থাকে। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর অবস্থা বিপরীত, সাধারণত অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও পেশাজীবিদের মধ্যে ভোটে অংশগ্রহণের প্রবণতা বেশি। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে কেন্দ্রবিমুখতা আরও অনেক বেশি এবং বিদ্যমান অবস্থায় ভবিষ্যতে তা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। ভারতেও একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃতভাবে কম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কম বিত্ত ও নিম্নবর্গের মানুষের ভোটে অংশগ্রহণের হার বেশি। রাজনৈতিক দলগুলো নানা পপুলিস্ট স্লোগান দিয়ে তাদের বেশি ভোটে উৎসাহী করার চেষ্টা করে থাকে।

বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থার কথা বাদ দিলেও সাধারণের ভোটদানের সহজ পদ্ধতি বিশেষত অনুপস্থিত ভোটারদের ভোটদান নিশ্চিত করার জন্য পোস্টাল ব্যালটের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী বাড়ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সীমিতভাবে ডাকযোগে ভোটদান ব্যবস্থা অনেক পুরোনো। যেমন সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তা এবং বিদেশে অবস্থানরত সুনির্দিষ্ট কিছু নাগরিকের জন্য এতদিন পোস্টাল ব্যালট উন্মুক্ত ছিল। বাংলাদেশেও সীমিতভাবে ডাকযোগে ভোটদানের আইন আছে (অনুচ্ছেদ ২৭, জন প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, যা ২০১৯ সনে সংশোধিত, অনুচ্ছেদ ৮(৩) ও (৫), ভোটার তালিকা আইন ২০০৯, যা ২০১৯ সালে সংশোধিত)। সশস্ত্র বাহিনী, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও অন্যান্য কর্মীগণের জন্য এ অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে খুব এটা আগ্রহ দেখা যায় না, তাই বস্তুত এই পদ্ধতি চর্চা খুবই সীমিত।

সীমিত পোস্টাল ব্যালট চর্চাকারী দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নরওয়ে, ফিলিপাইনস, স্পেন প্রর্ভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য। ক্রমাগতভাবে বর্ধিত পোস্টাল ব্যালট চর্চার দেশ হিসাবে সুইটজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। ২০১৯ সালে ৯০ শতাংশ সুইস অনুপস্থিত ভোটার হিসেবে দেশে বাসস্থান বা দেশ-বিদেশের কর্মস্থল থেকে ভোট দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো, অরিগন, হাওয়াই, উটাহ, এবং ওয়াশিংটনে ২০১৬ সালে ২৫ শতাংশ এবং ২০২০ সালে ৫৮ শতাংশ মানুষ ডাকযেগে ভোট দেয়। অন্যান্য রাজ্যেও ডাকভোটের দাবি জোরালো হচ্ছে। বৃটেনে ২০১৭ সনের নির্বাচনে ইংল্যান্ডে ১৮.২ শতাংশ, স্কটল্যান্ডে ১৯.৪ শতাংশ, ওয়েলসে ১৯.৪ শতাংশ এবং আয়ারল্যান্ডে ১.৯ শতাংশ পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০-এর নির্বাচনের পর ফ্রান্সে পোস্টাল ভোটের দাবি জোরালো হচ্ছে।

বাংলাদেশে পোস্টাল ব্যালটের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে পোস্টাল ব্যালট ভোটার অংশগ্রহণ বৃদ্ধির একটি অতি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। কেন্দ্র দখল, বুথ দখল, কেন্দ্রভিত্তিক নানামুখী সন্ত্রাস সমাজের শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ মানুষগুলোকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে খুব একটা উৎসাহিত করে না। ভোটকেন্দ্রে আসার ঝুঁকিমুক্ত একটি বিকল্প দিলে তারা নিঃসন্দেহে সেটি লুফে নিবে। তাছাড়া সরকারি-বেসরকারি চাকুরির কারণে, দুরবর্তী কর্মস্থলে অবস্থান, অসুস্থতা, শারীরিক অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে যারা ভোটকেন্দ্রে আসতে অপারগ তাদের জন্য পোস্টাল ব্যালট একটি অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া ভোটে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির ব্যাপারে আন্তরিক হলে এটি করা ছাড়া নির্বাচন কমিশনের অন্য কোনো ভালো পথ নেই।

আমার পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব একটি ত্রূটিমুক্ত পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থা আমাদের দেশে অন্তত ৩০ শতাংশ প্রকৃত ভোটারের ভোটে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে পারে।

কীভাবে পোস্টাল ব্যালট চালু করা যায়

আইনগতভাবে আইনের সংশ্লিষ্ঠ অংশ (গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ২৭ এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ঠ অংশ সংশোধন করে সীমিত অংশগ্রহণের বর্তমান বিধান রহিত করে এ পদ্ধতি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলে আইনগত প্রতিবন্ধকতা নিরসন হয়। এখানে একদিকে কিছু ব্যয় ও ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব বাড়বে। আবার অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলাসহ অন্যান্য ব্যয় সাশ্রয় হবে। প্রথমত নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে নির্বাচনের অন্তত দুইমাস আগে থেকে পরিকল্পিতভাবে পোস্টাল ব্যালটের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এই দুই মাসের বিশেষ কর্মকাণ্ডের প্রথম ধাপ হবে পোস্টাল ব্যালটে আগ্রহী ভোটার নিবন্ধন। এ নিবন্ধনের একটি প্রতীকি ফি নির্ধারণ করা যেতে পারে। নিবন্ধনের জন্য অনলাইনে ফরম ছেড়ে দিতে হবে। ছবি, ভোটার নম্বর ও এনআইডি নম্বর দিয়ে লোকজন নিবন্ধনের আবেদন করবে। দ্বিতীয় ধাপ হবে এ নিবন্ধিত ভোটারের পৃথক একটি তালিকা করে তা জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে প্রেরণ ও সাথে সাথে যুগপৎভাবে ভোটারদের কাছে তার পোস্টাল ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রমাণপত্র পাঠাতে হবে। এ প্রমাণপত্রসহ একজন ভোটার তার বাছাইকৃত কেন্দ্রের ব্যালট পেপার চাইলে নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ হবার সাথে সাথে কমিশন ব্যালট পেপার পাঠাবেন। এ ব্যালট পেপার একজন ভোটার নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত তিন কর্মদিবস পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পাওয়া মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএস দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করবেন। শেষ ধাপ হচ্ছে ভোট গণনা। সরসরি অনুষ্ঠিত ভোটের ফলাফল গণনা শেষে মাঠের চুড়ান্ত ফলাফল রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছার পর প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্টদের সম্মুখে সংশ্লিস্ট নির্বাচনী এলাকার সকল পোস্টাল ব্যালট গণনা করবেন। প্রতিটি ভোট নিবন্ধিত পোস্টাল ভোটারের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখবেন। এভাবে ফলাফল চুড়ান্ত হবে।

এ ব্যবস্থা চালু হলে নির্বাচন কমিশন বুথ দখল, এলাকাভিত্তিক সন্ত্রাস, মানুষ এবং যন্ত্র বিষয়ক জটিলতা ইত্যাদি থেকে অনেকটা ভারমুক্ত হবেন এবং দেশে ভোট গ্রহণের মোট সংখ্যা ও হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এন আর বি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার প্রায়োগের সুযোগ দিন

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ১৩ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি ৩০ লক্ষ বাংলাদেশি পৃথিবীর নানা দেশে কর্মরত। তাছাড়াও এদেশের অনেক

নাগরিক বিভিন্ন কারণে বিদেশে অবস্থান করেন কিম্বা দ্বৈত নাগরিক হিসেবে নিবন্ধিত। বাংলাদেশের বৈদেশিক দূতাবাসে কর্মকর্তারাসহ এসব বাংলাদেশিরা কখনও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না। নির্বাচনী আইন ও ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতায় এ ভোটাধিকার হরণ সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার সামিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ দেশে এ বিষয়ে কেউই কোনো কথা বলছেন না। নির্বাচন কমিশনের কর্ম তালিকায়ও এ জাতীয় কোনো বিষয়ের এজেন্ডা নেই।

দেশে এখন বৈদেশিক মুদ্রার প্রকট সংকট। এ সময়ে আমরা এন.আর.বি. ও প্রবাসীর প্রেরিত অর্থের জন্য আহাজারি করি। তারা প্রতি বছর প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলারের সমান রেমিটেন্স পাঠান। কিন্তু প্রবাসীদের ভোটাধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে সরকারের এ উদাসীনতা ক্ষমার অযোগ্য। প্রবাসী শ্রমিক বা এন.আর.বি. বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিদের আমাদের দূতাবাসের মাধমে নির্বাচন কমিশন একটি বিশেষ ব্যবস্থায় অবশ্যই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দিবেন। নতুবা নির্বাচন কমিশন প্রকৃত ও বৈধ ভোটারদের ভোটধিকার ক্ষুণ্ণ করে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ের মুখোমুখী হবেন।

দ্বিতীয় গুচ্ছ

স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসন

স্থানীয় সরকার : প্রেক্ষিত ও প্রক্ষেপণ

'A nation may establish a free government but without municipal institutions it cannot have the spirit of liberty.'

Alexis de Tocqueville

পৃথিবীর আদিমতম সরকার-ব্যবস্থা ও সরকার-কাঠামো হচ্ছে 'স্থানীয় সরকার', যার উত্তরাধিকার যুগে যুগে নানাভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। তখনও সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে মূলত 'স্থানীয়' এবং তার পরিসর ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এককালের ক্ষুদ্র 'নগর-রাষ্ট্র' এখন অনেক গ্রাম, নগর, জনপদ, অঞ্চল, দেশ, জাতি নিয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্র। সমসাময়িককালে তাই 'সুশাসনে'র প্রয়োজনে রাষ্ট্রসমূহ তার বৃহত্তর আঙ্গিকের ভেতরেও ক্ষুদাকারের 'স্থানীয়তা'কে কিছু কিছু পরিসর ছেড়ে দিচ্ছে। উনবিংশ শতক থেকে স্ব-শাসন ও সু-শাসন দুই সূত্রেই আধুনিক সরকারসমূহের একটি বিশিষ্ট 'স্থানীয়' আদল ও কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। সু-শাসনের ধারণার জনপ্রিয়তার সাথে সাথে 'স্থানীয়তা'র কদরও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমা উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ও রাষ্ট্রসমূহ তাদের পুঁজি বিকাশের মূল সমসাময়িককালে তাই 'সুশাসনে'র প্রয়োজনে রাষ্ট্রসমূহ তার বৃহত্তর আঙ্গিকের ভেতরেও ক্ষুদাকারের 'স্থানীয়তা'কে কিছু কিছু পরিসর ছেড়ে দিচ্ছে। উনবিংশ শতক থেকে স্ব-শাসন ও সু-শাসন দুই সূত্রেই আধুনিক সরকারসমূহের একটি বিশিষ্ট 'স্থানীয়' আদল ও কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে।সুশাসনের ধারণার জনপ্রিয়তার সাথে সাথে 'স্থানীয়তা'র কদরও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মকাণ্ডের সাথে জাতীরাষ্ট্র ও স্থানীয় রাষ্ট্রের কাজ ও দায়িত্বের এক ধরনের বিভাজন করে নিয়েছে। জাতীরাষ্ট্র সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়া সমসাময়িককালে তাই 'সুশাসনে'র প্রয়োজনে রাষ্ট্রসমূহ তার বৃহত্তর আঙ্গিকের ভেতরেও ক্ষুদাকারের 'স্থানীয়তা'কে কিছু কিছু পরিসর ছেড়ে দিচ্ছে। উনবিংশ শতক থেকে স্ব-শাসন ও সু-শাসন দুই সূত্রেই আধুনিক সরকারসমূহের একটি বিশিষ্ট 'স্থানীয়' আদল ও কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। সুশাসনের ধারণার জনপ্রিয়তার সাথে সাথে 'স্থানীয়তা'র কদরও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। (production system) তথা পুঁজি ব্যস্থাপক (Executive Committee of the Bourgeiose)

হিসেবে কাজ করে। আর স্থানীয় রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার সে পুঁজির পক্ষে সামাজিক পুনরুৎপাদন কার্যাবলি সম্পন্ন করে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ও জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পূরক ও পরিপূরক। উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা ১৮৮২ সালের দিকে যখন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন, সমসাময়িক সময়ে গ্রেটব্রিটেনের মূল ভূখণ্ডেও হুইগ ও ইউটিলিটারিয়ান বিতর্কের ফসল হিসেবে উদার গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। কিন্তু ভারতে একই বিতর্কে উদারনৈতিক ধারা পরাজিত হয়। এখানে ঔপনিবেশিক শাসনের উপযোগী একটি বশংবদ রাজনৈতিক কাঠামো গঠিত হয়। যা এখানে একটি বিকৃত ও বিকলাঙ্গ স্থানীয় শাসনের জন্ম দেয়। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পর ভারত-পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের গন্তব্য পৃথক হয়ে যায়। ভারতীয় সংবিধানে ড. অম্বেদকার শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের বিধান সংযোজন না করলেও নেহেরু এবং এস.কে.দে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্টের মাধ্যমে গান্ধির পঞ্চায়েত ব্যবস্থার স্বপ্নটি জাগিয়ে রাখেন। প্রায় ৪৫ বছর পর ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে তা একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকার লাভ করে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান নানা সাংবিধানিক অনিশ্চয়তার ঘূর্ণাবর্তে এ বিষয়ে মনঃসংযোগে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে পাকিস্তানের গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়ে তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র আদলে একটি নতুন একনায়কতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করে যেখানে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে মূল ভূমিকায় রাখা হয়। ১৯৭২-এ প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রশাসনের সকল এককে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের বিধান করলেও ভিন্ন আদলে পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। বাংলাদেশ যদি আধুনিক ও কার্যকর স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে চায় তাহলে অভিজ্ঞার প্রথম পাঠ হিসেবে ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪তম সংশোধনীসমূহ সতর্কভাবে অধ্যয়ন প্রয়োজন। ভারতে এ সংশোধনী কার্যকর হবার পর প্রায় ত্রিশ বছর গত হয়েছে। এ ত্রিশ বছরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তার প্রভাবসমূহ দেখা যেতে পারে এবং বাংলাদেশ একটি উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি বা কমিশন করে সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে।

পটভূমি— 'সরকার ব্যবস্থা' (Governmental System)-র বিদ্যমান ধারণা মানব মানসে উদয়ের পূর্ব থেকে মনুষ্য সমাজে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার একটি রূপ, কাঠামো ও আদল তৈরি হয়ে যায়। সেটি যতই প্রাচীন, আদিম, অগঠিত হোক, ঐ কাঠামোই ছিল মানুষের আদি শাসন কাঠামো, যার উত্তরাধিকার যুগে যুগে নানাভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। তা সেই আদিম পশু শিকারি, মৎস্য শিকারি, পশু পালক, যাযাবর, যুথবদ্ধ 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ', কৌম সমাজ তা যাই হোক, তা ছিল মূলত একটি ক্ষুদ্র এলাকা জুড়ে তাদের জীবনযাত্রা সম্পৃক্ত একটি স্বাভাবিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা। প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামোর আদি রূপ ছিল এই ব্যক্তি-গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত 'স্থানীয়

শাসন'। একটি যুথ প্রধান, দল প্রধান বা একজন বা এক দল শক্তিশালী ব্যক্তির অধীনে জীবনযাত্রাকে চালিয়ে নেওয়ার এ নিয়মই ছিল তখনকার শাসন। ধীরে ধীরে উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রম সম্পর্ক ও পুঁজির বিকাশ হয়। শিকারি ও পশুপালক হয় কৃষক। কৃষির সাথে দাস শ্রম যুক্ত হয়ে পত্তন ঘটে দাস সমাজ ও সামন্ত সমাজের। তখনও সমাজ ও রাষ্ট্র থাকে মূলত 'স্থানীয়' এবং তার পরিসর ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কৃষি সভ্যতা বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে বা প্রয়োজনে কেউ হয়ে যায় দাস শ্রমিক, কেউ দাস মালিক। কৃষি আরও বিকশিত হলে কৃষির ভেতর থেকেই পত্তন ঘটে শিল্প সভতার। কৃষি সভ্যতা বিকাশের একটি পর্যায়ে গড়ে ওঠে কুশলী শিল্পী-কারিগর গোষ্ঠী। শিল্পী-কারিগরদের সাথে বণিকের মেলবন্ধনেই গড়ে ওঠে 'নগর'। নগরে গড়ে ওঠে শিল্প-কল-কারখানা। এভাবে রাষ্ট্র-সমাজ বড় হতে থাকে। রাষ্ট্র অবশেষে একটি অধিপতি শ্রেণির করতলগত হয়। রাষ্ট্রের একটি শ্রেণি-চরিত্র প্রকাশ পায়, সাথে পরিবর্তিত হয় তার আদল, রূপ, কাঠামো ও বিস্তৃতি। স্থানীয়তা জাতীয়তার এবং জাতীয়তা বহুজাতীয়তার প্রভাবাধীন হয়। আদিম সাম্যবাদীযুগ, দাসযুগ, সামন্তযুগ পেরিয়ে বণিক যুগ, পুঁজিবাদী যুগ এবং হয়ত এখন আমরা উত্তর-পুঁজিবাদী যুগে বাস করছি। কিন্তু ক্ষুদ্র-স্থানীয়তা পরিহার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়তার একটি পরিসর সবাই সর্বত্র লালন করি।

এককালের ক্ষুদ্র 'নগর রাষ্ট্র' এখন অনেক গ্রাম, নগর, জনপদ, অঞ্চল, দেশ, জাতি নিয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্র। সমসাময়িককালে তাই 'সুশাসনে'র প্রয়োজনে রাষ্ট্রসমূহ তার বৃহত্তর আঙ্গিকের ভেতরেও ক্ষুদ্রাকারের 'স্থানীয়তা'কে কিছু কিছু পরিসর ছেড়ে দিচ্ছে। উনবিংশ শতক থেকে স্ব-শাসন ও সু-শাসন দুই সূত্রেই আধুনিক সরকারসমূহের একটি বিশিষ্ট 'স্থানীয়' আদল ও কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। সুশাসনের ধারণার জনপ্রিয়তার সাথে সাথে 'স্থানীয়তা'র কদরও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে কেন্দ্রীয় বা জাতি-রাষ্ট্র দুর্বল হয়নি, বরঞ্চ তাতে জাতি-রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে। কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র থেকে বিকেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র অধিক সক্ষম ও শক্তিশালী, এটি একটি ধ্রুব সত্য হিসেবে প্রমাণিত। আধুনিক উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রসমূহ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্রের পৃথক ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। 'জাতি-রাষ্ট্র' মূল পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া (Capitalist Production Process) নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করে এবং 'স্থানীয় রাষ্ট্র' (Local State) সামাজিক পুনরুৎপাদন (Social Reproduction) প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করে। সামাজিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল কাজ হলো পুঁজিবাদী সমাজ ও উৎপাদন কাঠামো স্থিতিশীল ও পুঁজির স্বার্থে ব্যয় সাশ্রয়ী রাখা। স্থানীয় রাষ্ট্র তথা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তারা স্থানীয়ভাবে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তাসহ যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করায় শ্রমিকের মজুরি ব্যবস্থার উপর মালিকের বাড়তি চাপ কমে, তাই

বলা হয় ব্রিটিশ স্থানীয় সরকার একজন নাগরিকের 'মাতৃ জঠর থেকে গোরস্থান পর্যন্ত সকল সেবা স্থানীয় রাষ্ট্র তথা স্থানীয় সরকারের আওতায় দিয়ে থাকে।'

ব্রিটিশ স্থানীয় রাষ্ট্র একজন নাগরিকের পুরো জীবনচক্রব্যাপী নানা প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করে তাতে পুঁজিপতির শ্রম ব্যয় কম হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য আর্ন্তজাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভালো করতে পারে। সামাজিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে পুঁজিপতি শ্রেণির জন্য অব্যাহতভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক, শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির যোগান নিশ্চিত হয়। শ্রমিক অসন্তোষ সহনীয় মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য শ্রমিকের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যোগাযোগ-যানবাহন, পেনশন, সামাজিক নিরাপত্তা, বিনোদন প্রভৃতি সামাজিক ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা স্থানীয় রাষ্ট্র দেখাশুনা করে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে শুধু অর্থ যোগান দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। নানা সামাজিক সমস্যার জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র চাপ, তাপ ও ভারমুক্ত থাকে। মোটকথা, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্র পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক হয়ে কাজ করে। পরস্পরের তাপ ও চাপ ভাগাভাগি করে গ্রহণ করায় সমাজ স্থিতিশীল থাকে।[১]

কর্ম ও দায়িত্বের সুসম ও ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন হলে কর্ম সম্পাদন দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়। সব দায়িত্ব একক স্কন্ধে বহনের ফলাফল হয়, পরিশেষে অনেক কর্ম অসম্পাদিত বা অর্ধ-সম্পাদিত থাকে। উন্নত পশ্চিমা সমাজে নগর শাসনের স্ব-শাসিত কাঠামো তাই অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাই দেখা যায় ব্রিটিশ রাজনীতির দুইটি ধারা— একদিকে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে 'হোয়াইট হল' দখল অপরদিকে স্থানীয় নির্বাচনের রাজনীতির মাধ্যমে 'টাউন হল' দখল। জাতীয় রাষ্ট্র ও স্থানীয় রাষ্ট্রের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা-কর্তৃত্বের ভাগাভাগি এমনভাবে করা হয় তারা কেউ কারও প্রতিদ্বন্দী নয়, অপরিহার্যভাবে পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ধারণা, এতে অর্থ-সম্পদ, সময় ও শক্তি সাশ্রয় হয়। জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়, স্থানীয় ও জাতীয় গণতন্ত্র উভয়ই শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র পুঁজির নির্বিঘ্ন বিকাশের স্বার্থে সুশাসনকে অপরিহার্য মনে করে। সুশাসনের অন্যতম উপায় হিসেবে স্ব-শাসিত বিকেন্দ্রায়িত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সক্ষম ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সে সুশাসনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পশ্চিমা উদারনৈতিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ বিশেষত জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮৫৯), অ্যালেক্সিস ডি. টকিয়াভেলি (১৮৩৫), হ্যারল্ড লাস্কি (১৯৩১), জেরেমি বেনথাম, সিএইচ উইলসন (১৯৪৮) প্রমুখ দার্শনিকগণ জাতীয়

১. Tofail Ahmed (2012) Decentralisation and the Local State: A study on the political Economy of Local Governance in Bangladesh, Agamee, Dhaka, PP-66-73.

গণতন্ত্র বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে স্থানীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে একটি প্রধান উপজীব্য হিসেবে ভেবেছেন। সমাজে স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠশালা হিসেবে স্থানীয় সরকারকে মূল্যায়ন করেছেন।[২] ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ যে স্থানীয় শাসনকাঠামো ভারতে চালু করে তাতে সত্যিকার অর্থে বৃটেনের স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও আদল কোনোটারই প্রতিফলন ঘটেনি। এখানে রাজ অনুগত তথা রাজ কর্মচারী অনুগত বশংবদ একটি স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি ভেতরগতভাবে প্রকৃত অর্থে গুরুত্ব পায়। বৃটেনে তৎকালে 'হুইগ ও ইউটিলিটারিয়ান'দের দ্বন্দ্ব ভারতে এসে 'মনরো এবং কর্নওয়ালিশ' স্কুলের দ্বন্দ্বে রূপে প্রকাশ পেলেও উদারভাবাপন্ন 'মনরো স্কুল' ভারতে পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের সংকীর্ণ কর্তৃত্ববাদী ধারাটি জয়লাভ করে। তৎকালে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে মেকলের প্রাচ্য পদ্ধতি ও বেন্টিঙ্কের পাশ্চাত্য পদ্ধতির দ্বন্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমূখরা ভারতীয় হয়েও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষ অবলম্বন করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার যে সুফলটা পাওয়া যায়, স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে তৎকালীন কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বিষয়টি সেভাবে উপলব্ধি করেননি।[৩] শুরুতেই ভারতের স্থানীয় শাসন কাঠামো ও কার্যক্রম দুটোই বিকৃত ও বিকলাঙ্গ পথেই বিকশিত হতে থাকে এবং পশ্চিমা উদার গণতান্ত্রিক ধারার চর্চা ব্যাহত হয়।

ভারতে স্বাধীনতার পর গান্ধির 'গ্রাম স্বরাজ' আন্দোলন, জওহরলাল নেহেরুর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আধুনিক রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও এস.কে.দে. (নেহেরু মন্ত্রীসভার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার) নামক আমেরিকা প্রবাসী এক বাঙালির অবদানে ভারতে 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট'-এর পথ ধরে গান্ধির পঞ্চায়েত ব্যবস্থার স্বপ্ন তার অনুপস্থিতিতেও একটি ভিন্নতর গতি ও মাত্রা লাভ করে। যদিও ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা ড. বি.আর. আম্বেদকার স্থানীয় সরকার বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সংবিধানে যথাযুক্ত স্থান দেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভারতে পঞ্চায়েত প্রথা শক্তিশালী করা হলে তাতে কর্তৃত্ববাদী ব্রাম্মণ্যবাদি শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। দলিতসহ সকল নিচু বর্ণের মানুষ সাংবিধানিকভাবে উচ্চবর্ণের শাসনের একটি স্থায়ী ফাঁদে পড়ে যাবে। ভারতের রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে উদার ও বামদের সফলতার হাত ধরে স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চায় 'স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, উড়িষ্যাসহ বেশ কিছু বাম ও অ-বাম শাসিত রাজ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখার পর ১৯৮৯ সালে কংগ্রেস সরকার লোকসভায় একটি বিল পেশ করে। বিলটি লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ হলেও রাজ্যসভায় পরাস্ত হয়। কংগ্রেস তখন সংসদ বাতিল করে নতুন নির্বাচন দিলে ভিপি সিং-এর নেতৃত্বে 'ইউনাইটেট

২. B.C Smith (1985), Decentralisation : Territorial dimension of the State, Allen and Unwin, London
৩. Nazmul Abedeen ( ) Local administration in India, Pakistan and Bangladesh, NIPA, Dhaka

ফ্রন্ট’ সরকার পুনরায় বিলটি সংসদের মুখোমুখী করে। একমাসের মাথায় ভিপি সিং সরকারের পতন হলে পুনরায় বিলটির ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সনে নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হবার পর বিলটি পুনরায় ওঠানো হয়। দীর্ঘ আলোচনা এবং অনেক পরিবর্তনের পর ২২ ডিসেম্বর ১৯৯২ সনে লোকসভায় বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় এবং পরের দিন একইভাবে রাজ্যসভায়ও বিলটি পাশ করা হয়। তারপর সারা ভারতের রাজ্য বিধানসভাগুলোর অর্ধেকের বেশি এ বিল রেটিপাই করার পর রাষ্ট্রপতি ২০ এপ্রিল ১৯৯৩ সনে সংশোধনী বিলে স্বাক্ষর করেন, এটি আইনে পরিণত হয় এবং ‘ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী-১৯৯২’ হিসেবে গেজেটভূক্ত হয়। একইভাবে সম্পূরক আরও একটি সংশোধনী ৭৪তম সংশোধনী হিসেবে পাশ করা হয়। এভাবে সাংবিধানিকভাবে স্থানীয় সরকারের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ভিত্তি ভারতে গঠিত হয়। তবে তা ছিল অনেকদিন ধরে অনেক লোকের চিন্তা, কর্ম ও সংগ্রমের ফসল।[৪]

ভারতের নানা স্তরের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক চিন্তকগণ এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন লেখালেখি ও আন্দোলন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাসু, উড়িষ্যার নবীন পটনায়ক, কেরালার ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদ, কর্ণাটকের নাজির সাহেব এ বিল রচনা ও এর পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টিতে অবদান রাখেন। প্রবীণ কংগ্রেস রাজনীতিবিদ এবং সে সময়কার ইউনিয়ন পঞ্চায়েত মন্ত্রী মণি শংকর আয়ার মন্ত্রী হবার পূর্বে এবং মন্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভায় সকল দল সর্বসম্মতভাবে সংবিধানের এ সংশোধনী বিল পাশ করে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এ সংশোধনী বলে ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কতকগুলো মৌলিক পরিবর্তন এবং স্থানীয় সরকারের স্বপক্ষে কিছু ‘গ্যারান্টি কল্জ’ (Clouse) যুক্ত হয়। ভারতে স্থানীয় সরকার রাজ্য সরকারের অধীনস্থ হস্তান্তরিত বিষয়। স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন সমূহ স্ব স্ব রাজ্যের বিধান সভায় পাশ করা হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধনের পর সকল রাজ্যের জন্য সংবিধানের স্থানীয় সরকার বিষয়ক সাংবিধানিক বিধানসমূহ মানা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। নতুবা রাজ্যস্তরের বিধানসভার সদস্যগণ বাংলাদেশের মতো স্থানীয় সরকার নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে নতুন শক্তিকেন্দ্র হিসেবে সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানে অনেক আপোষরফা করা হয়েছে। বিশেষত স্থানীয় সরকারের জেলা ও ব্লক পর্যায়ের এককে তাদের সদস্যপদ দান ও ভোটাধিকার প্রয়াগের বিধান তার একটি উদাহরণ। ভারতে স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নরূপ:[৫]

৪. George Matthew (2002) Panchayati Raj: FromLagislation tomovement, Concept Publishing House, New Delhi.

৫. Mani Shankar Aiyar (2005) Panchayat Raj : TheWay Forward in L G Jain (Ed) Decentralisation and Local Governance, Orient Longman, New Delhi, PP-63-79.

১. ভারতীয় ইউনিয়নভূক্ত প্রতিটি রাজ্যে গ্রাম, মধবর্তী পর্যায় ব্লক বা মণ্ডল ও জেলা এ তিন পর্যায়ে পাঁচ বছর মেয়াদী নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পরিষদ থাকবে। শুধু ২০ লক্ষের কম জনসংখ্যা সম্বলিত রাজ্যসমূহে স্ব স্ব বিধান সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুই স্তর স্থানীয় সরকার হতে পারবে।
২. পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জবাবদিহিতা ও নজরদারির জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ‘গ্রাম সভা’ বা ‘গ্রাম সংসদ’ গঠিত হবে।
৩. সংবিধান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শাসন ইউনিট যথা কেন্দ্র বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সরকার (পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান ও পৌর এলাকা)-এর কর্ম এলাকা ও বিষয় বিভাজন করে পৃথক চারটি বিষয় তালিকা করে দিয়েছে, যথা—ফেডারেল বিষয়াবলি, রাজ্য সরকারের বিষয়াবলি, স্থানীয় সরকারের বিষয়াবলি এবং যৌথ বিষয়াবলি বা কনকারেন্ট সাবজেক্ট। এভাবে রাষ্ট্রের তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাজের বিষয়সমূহের পরিষ্কার বিভাজন রয়েছে। এভাবে স্থানীয় সরকারের জন্য ২৯টি বিষয় নির্ধারণ করা আছে, যেখানে রাজ্য সরকার বা ইউনিয়ন সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।
৪. অর্থায়নে ন্যায্যতা ও সামঞ্জস্যতা বিধানের জন্য প্রতি পাঁচ বছর পরপর রাজ্য পর্যায়ে ‘স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন’ গঠিত হবে। এ কমিশনের সুপারিশের আলোকে রাজ্য সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করবে।
৫. প্রতিটি জেলায় একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (District Planning Authority) গঠিত হবে। যার সভাপতি থাকবেন জেলা পরিষদ সভাপতি এবং সদস্য-সচিব হবেন জেলার কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট (DC & DM)। এ কর্তৃপক্ষ জেলার সকল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও অর্থায়ন মূল্যায়ন ও মনিটরিং করবে।
৬. নারী, সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইব-এর জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ ও তা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে। নারীর জন্য সদস্যপদ, সহ-সভাপতি ও সভাপতির পদও সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে একটি একীভূত আইনের অধীনে গঠিত হয় এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে। একীভূত আইনের কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ নির্বাচন একটি একক তপশিলে অনুষ্ঠিত হয়। তবে সব রাজ্যে সমানভাবে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সাথে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে তা বলা যাবে না। তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে ভারতে অ্যাকাডেমিক ও রাজনীতিবিদরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় এবং প্রতিনিয়ত এর নানামুখী উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশ উপমহাদেশের বিভক্তি ও স্বাধীনতার পর পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তান হিসেবে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌর কমিটি বা মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের

উত্তরাধিকার নিয়ে স্থানীয় সরকার শুরু করলেও প্রদেশ ও কেন্দ্রের সরকার ও সংবিধান নিয়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার কারণে স্থানীয় সরকারের বিষয়টির উপর স্পষ্ট আলোচনা শুরু হয়নি। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের বিধান করা হলেও সেটি কার্যকর হয়নি। ১৯৫৯ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর ১৯৫৬-এর সংবিধান বাতিল হয়। সামরিক ফরমানে দেশ চলতে থাকে এবং ১৯৬২ সনে সামরিক সরকার কর্তৃক একটি 'সংবিধান' প্রণীত হয়। সে সংবিধান ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মূলনীতিসমূহের আমূল পরিবর্তন করে সর্বময় ক্ষমতার আধার একটি 'রাষ্ট্রপতি শাসিত' সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করে। সর্বজনীন ভোটাধিকার বিলুপ্ত করে একটি নতুন নির্বাচনী পদ্ধতি সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে পূর্ব বা ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভোটদানের (৪০ হাজার + ৪০ হাজার) = ৮০ হাজার মৌল একক বা ৮০ হাজার নির্বাচক মণ্ডলি (etectoral college)-র রূপরেখার অধীনে একটি নতুন রাজনৈতিক (শাসন) কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। যার নাম দেওয়া হয় 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Deocaracy)। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে চার স্তরের একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে সারা পাকিস্তান একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে আংশিক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। সে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ছিল শুধুমাত্র ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য বা মেম্বার নির্বাচন। এই নির্বাচিত মেম্বার বা সদস্যরাই সারা পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীন মোট পাঁচটি নির্বাচনে নির্বাচক মণ্ডলি হিসেবে ভোট দিতেন। তাঁরা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, জেলা কাউন্সিলের সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (East Pakistan Provincital Assembly), জাতীয় পরিষদের সদস্য (Pakistan National Assembly) এবং দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। আর চার স্তরের স্থানীয় সরকার সমূহ ছিল মূলত ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল। থানা ও বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল পুরোপুরি সরকারি কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত। থানা কাউন্সিলের সভাপতি থাকতেন এসডিও এবং সংশ্লিষ্ট থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) হতেন ভাইস-চেয়ারম্যান। জেলা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন, তবে চেয়ারম্যান ছিলেন পদাধিকার বলে ডেপুটি কমিশনার। বিভাগীয় কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার।

১৯৫৮ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ উত্তরাধিকার হিসেবে যে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড ব্যবস্থা ছিল তা মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা থেকে জনপ্রতিনিধিত্ব ও কার্যক্রমের দিক থেকে ছিল অনেক অগ্রসর, গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় সমস্ত জাতীয় রাজনীতির ভার ক্ষুদ্র, অসহায় ও রাজনৈতিকভাবে অসংগঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যের উপর অর্পিত হয়। দেশের বাকি জনগণ ভোটাধিকার বঞ্চিত রাখা হয়। এ দুর্বহ রাজনীতির ভার তারা শেষ পর্যন্ত বইতে ও সইতে পানেননি।

ড. আখতার হামিদ খানের ভাষায়—

> আয়ুব গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর মতো মাস্টার বিল্ডার হতে চেয়েছিলেন, মাও-এর সে রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ, সংগঠন ও দূরদর্শিতা তাঁর ছিল না। তিনি স্থানীয় সরকারের ভেড়ার উপর জাতীয় রাজনীতির ষাঁড়কে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে নিরীহ ও দুর্বল ভেড়া মারা যায়।[৬]

১৯৭০-এ জনগণ ভোটাধিকার ফেরত পায়। ১৯৭০-এ প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্বজনীন ভোটধিকার প্রয়োগ করার পর সংখ্যারিষ্ঠতা পাওয়া দল নিখিল পাকিস্থান আওয়ামী লীগকে আইনতভাবে প্রাপ্য ক্ষমতা হস্তান্তরের অস্বীকৃতির কারণে ১৯৭১-এর পূর্ববাংলার মানুষ রুখে দাঁড়ালে সেখানে একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ যুদ্ধে জয় লাভ করে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ ও রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। ১৯৭২-এর ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তৈরি হয় সংবিধান এবং ১৯৭৩ সালে নতুন সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন হয়। বাকি বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে ১৯৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার গঠিত হয়নি। জেলা পরিষদের ভৌত ও সাংগঠনিক অবকাঠামো থাকলেও স্থানীয় সরকার সংস্থা হিসেবে জেলা পরিষদকে পুনর্গঠন করা হয়নি। বিভাগীয় কাউন্সিলের স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটে। থানা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল কোনো কাঠামো সৃষ্টি না করে নানাভাবে সরকরি সার্কুলার দিয়ে তা চালানো হয়। ১৯৮২ সালের পর থেকে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে দশ বছর থানা পর্যায়ে 'উপজেলা পরিষদ' চালু হয় ও কার্যশীল থাকে। ১৯৯১ সনে বিএনপি সরকার গঠন করে উপজেলা বাতিল করে। বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাতে কোনো আপত্তি করেনি। বিলুপ্ত হবার ১৮ বছর পর ২০১০ থেকে আবার আওয়ামী সরকার উপজেলা পরিষদ চালু করে। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর প্রথমবারের মতো ২০১৬ সালে জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়। এখন দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এ তিন স্তরের স্থানীয় সরকার চালু আছে। নগর অঞ্চলে চালু আছে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন।

ব্রিটিশের বিকৃত ও বিকলাঙ্গ স্থানীয় সরকার ও শাসন যা, ভারতে চালু করা হয়, স্বাধীন ভারতবর্ষ সেখান থেকে বের হবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং অন্তত ৪৫ বছর পর সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে একটি নিজস্ব নতুন পথ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান ব্রিটিশের বিকলাঙ্গ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে। তার নাক, মুখ, হাত, পা সব ঠিক রেখে একটি চোখ কানা করে দেয় এবং তার মাথাটি কেটে ফেলে। সে শুধু একদিকে দেখতে পেত কিন্তু কোনো কিছু চিন্তা করার মতো মাথাটি তার ছিল না। তাদের হয়ে সকল চিন্তার দায়িত্ব ছিল সরকারি কর্মকর্তাদের। তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয় তারা শুধু আয়ুব খান আর মুসলিম লীগ ছাড়া আর কিছু যেন দেখতে, শুনতে ও বুঝতে পারত না এবং স্থানীয় আমলারা

৬. TheWorks of Akhter Hamid Khan , Vol -3, BARD , Comilla (1986).

তা নানাভাবে নিশ্চিত করতেন।

স্বাধীনতার পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নতুন রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামোতে তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। বাঙালি রাজনৈতিক নেতা এবং আমলারা ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানর রেখে যাওয়া 'জুতা পায়ে এবং টুপি মাথায়' দিয়ে একই কায়দায় শাসন কার্য চালানোতে অনেক স্বাচ্ছন্দ বোধ করতে লাগলেন। ক্ষমতা ও কাজ সবাইকে নিয়ে সবার সাথে নির্বাহের ধারণা দ্রূত ভুলে গিয়ে সকল ক্ষমতা এককভাবে হস্তগত করার একটি নেশা জাতির অধিপতি (elite) শ্রেণির একটি মনোরোগ বা অবসেশনে পরিণত হয়। স্থানীয় কোনো ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে উঠুক, সমাজে বহুত্ববাদিতার বিকাশ হউক, শত ফুল ফুঠে উঠুক, সবার হাতে শক্তি ও মাথায় সৃজনশীল বুদ্ধি জাগ্রত হউক তা উপলব্ধি করার মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সদিচ্ছা নতুন নেতৃত্ব দেখাতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর রচিত ১৯৭২-এর সংবিধানে স্থানীয় সরকারের যে শাসন কাঠামো, ভূমিকা ও আইনগত ব্যবস্থার নির্দেশনা দেওয়া হয় (১৯৭২-এর সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ) তা পুরোপুরি উপক্ষিত থাকে। সকল প্রশাসনিক স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার গঠনের নির্দেশনা থাকলেও শুধুমাত্র ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। বাকি উপরের তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় এবং ঐ তিনটি স্তর বা এককে আমলা আশলা শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। স্বাধীনতার পর ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রেও আয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিধানগুলোই কার্যকর থাকে। যাকে বলা যায় 'নতুন বোতলে পূরাতন মদ'। দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হলেও ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা সমূহে আয়ুর প্রণীত 'রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি' বহাল রাখা হয়। ভারতের সংবিধান সংশোধন বিতর্কে স্থানীয় সরকারের কাঠামো বিষয়ক বিতর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাঠামো যেহেতু সংসদীয়, তাই স্থানীয় সরকার কাঠামোও হতে হবে সংসদীয়। তাই সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানগণ সরাসরি নির্বাচিত না হয়ে সদস্যদের মাধ্যমে, সদস্যদের মধ্য হতে, সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ আইন ১৯৭৩-এর বেশির ভাগ ধারা, উপধারা মৌলিক গণতন্ত্র আইনের 'অবিকল নকল'। স্বাধীনতা ও সংবিধানের মূল দর্শনকে ধারণ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পুনগঠিত হয়নি। 'বিসমিল্লায় গলদ' দিয়ে যে স্থানীয় শাসনের সূচনা এখন বারে বারে তার পুনরাবৃত্তি ও জটিলতা। তার উপর বিকৃতিকে বহু গুণ বৃদ্ধি করেছে পর পর দুটি সেনা শাসন (জিয়া ও এরশাদের আমল ১৯৭৬-১৯৯০ সময়কাল)। ১৯৯১-এর পরিবর্তনের পর জনমনে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা জাগিয়ে তা আবারও ধীরে ধীরে 'স্বৈরতান্ত্রিকতা'র চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার দর্পণে বিষয়টিকে দেখলে তাকে নৈরাশ্যজনক ও অন্ধকার যুগের পুনঃসূচনা বলা যায়।

দেশ এখন স্বাধীনতার ৫০ বছর পার করছে 'স্থানীয় সরকার'-এর অলীক ও ভ্রমাত্মক স্বপ্ন কল্পনার এক বিমূর্ত সময়। জন-অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নির্বাসিত। জনবান্ধব ও ত্যাগী নেতৃত্ব পাবার সকল পথ রুদ্ধ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্থানি সামরিক ও বাংলাদেশি সামরিক একনায়কতান্ত্রিক ও অ-সামরিক স্বৈরশাসনকালসমূহে যে বশংবদ স্থানীয় সরকার কাঠামো ছিল এবং আছে তাতে যতটুকু গণতন্ত্র ও জন অংশগ্রহণ-এর নাম-গন্ধ অবশিষ্ট ছিল, বাংলাদেশের ২০১০ পরবর্তী বেসামরিক নির্বাচিত সরকারের শাসনকালে তার ছিটে ফোঁটাও আর থাকল না, এটি ছিল কল্পনারও অতীত। কিন্তু বাস্তবে তাই হলো।

২০১৬ এবং ২০২১ সালের দুটো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করলে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদগুলোর রাজনৈতিক ও সামাজিক অপ্রাসঙ্গিকতা ও অন্তঃসারশূন্যতায় আর আশাবাদী হবার কোনো অবকাশ নেই। উপজেলা পরিষদ কার্যত অকার্যকর। সাম্প্রতিককালের উপজেলা পরিষদ নিয়ে উচ্চ আদালতের দুটি রায়, পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা দেখলেই তা বোঝা যায়, এটিও কাজ করছে না। জেলা পরিষদ কার্যত কাজ-কর্মহীন একটি বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং মূলত একটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব পূনর্বাসন কেন্দ্র। জেলা পর্যায়ের কোনো সরকারি দপ্তরের সাথে তার কোনো সংযোগ নেই। নেই এ প্রতিষ্ঠানের কোনো জনসম্পৃক্ততা। স্থানীয় নির্বাচনে এত খুন-জখম ও নির্বাচনী অনিয়ম ও সন্ত্রাস, তা নিয়ে সরকার উচ্চবাচ্য করছে না। দেশের বুদ্ধিজীবী-গবেষকগণ কনসালটেন্সিতে ব্যস্ত, বাকি বুদ্ধিজীবীরা হতভম্ব-হতবুদ্ধি। জনগণ নির্বিকার ভয়ার্ত ও বিস্মিত দর্শক।

এখন এরকম একটি অবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে, স্থানীয় সরকারের এ দশা সম্পর্কে সরকার, রাজনীতিবিদ, আমলা, বুদ্ধিজীবী এবং স্থানীয় সরকারের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে কি-না। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকলে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার তাড়না অন্তত সবাইকে তাড়া করত। এখন আপাতত সে রকমের কোনো লক্ষণ স্পস্ট নয়। তারপরও বলা য়ায়, আমাদের রাজনীতিবিদ ও অ্যাকডেমিয়া ভারতের স্থানীয় শাসন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন একান্তভাবে কাম্য। এ পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে একটি নতুন বিপ্লব সাধন করতে পারে। সে লক্ষ্য নিম্নে কটি সুপারিশ দেওয়া হলো। এগুলো ইতিপূর্বে আমার এবং আরও অনেকের গবেষণায় এসেছে।[৭]

১. দেশের খ্যাতনামা অ্যাকডেমিক ও রাজনীতিদিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিশন গঠন করে স্থানীয় শাসন (Local Governance Reform) সংস্কারের বিষয়ে একটি বিশেষায়িত সুপারিশ সরকার গ্রহণ করতে পারে।

৭. Tofail Ahmed (2016) Bangladesh : Reform Agenda for Local Governance, Prothoma Prokashan, Dhaka

২. দেশে যেহেতু সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আদল, কাঠামো কার্যপদ্ধতি সংসদীয় পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্গঠিত হউক। তাতে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচিত হবে।
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারি প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর দ্বৈত ভূমিকার অবসান ঘটিয়ে একীভূত একটি শাসন ও সেবা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণীত হউক।
৪. স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হউক। এখন দেশের পরিকল্পনা কাঠামোতে জাতীয়-স্থানীয় কোনো যোগসূত্র নেই।
৫. স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন ও অর্থায়নের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক অর্থায়ন ও পরিকল্পনা চালু করা হউক।

উপসংহার : উন্নত পুঁজিবাদী সমাজ ও দেশসমূহের বিকেন্দ্রায়িত স্থানীয় শাসন ও সেবা পদ্ধতি ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনার একটি কারণ, আমাদের অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ে সহায়তা করা। বি.আর. আম্বেদকার যে কারণে ভারতীয় সংবিধানে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের বিপরীত অবস্থান নিয়েছিলেন, আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার তথা তৃণমূলে বর্তমানে (২০১৪-২০২১) সেরকম একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তৎকালীন ভারতের বর্ণভেদ প্রথা ও দলিত নিপীড়ন প্রভৃতিকে সামনে রেখে গ্রাম ও গ্রাম স্বরাজ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—'a sink of localism' and 'a den of narrow mindness' আমাদের ২০১৬ এবং ২০২১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যে চিত্র তা কোনোভাবে স্থানীয় গণতন্ত্রের কোনো সুখকর চিহ্ন বহন করে না। সহিংস 'চর দখলের মহোৎসব'-এর মতো একটি অবস্থা। শত মানুষের মৃত্যু ও হাজার মানুষ জখম হচ্ছে। নির্বাচন মানে একটি খুন-জখমের মৌসুম! তাই বলে এটিকে একটি অনিশ্চিত এবং আরও একটি অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় না। জাতি হিসেবে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ আমাদের বের করতে হবে। সে জন্য উপরের পাঁচটি সুপারিশ পত্রস্থ করা হলো, এ সুপারিশগুলো যথাযথ মনোযোগ পেলে আমাদের স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হতে পারে।

দ্বৈত শাসন আর নয়, চাই একীভূত শাসন কাঠামো

রাজনীতি-বিজ্ঞানের ভাষায়—শাসন ব্যবস্থার বিন্যাসে রাষ্ট্র শাসনের প্রকৃতিগত বিশ্লেষণে বাংলাদেশ একটি 'এককেন্দ্রিক' রাষ্ট্র। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল সরকারের আদলে এখানে কোনো রাজ্য বা প্রদেশ নেই। কিন্তু শাসন সুবিধার জন্য শাসন ব্যবস্থার বিন্যাসে সৃষ্টি করা হয়েছে নানা অঞ্চলকেন্দ্রিক 'শাসনকেন্দ্র'। এই আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্রগুলোকে সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে 'প্রশাসনিক একক' (administrative Unit) বলা হয়। দেখা যায় উপর থেকে নিচে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি করপোরেশনগুলোকে আইনের মাধ্যমে প্রশাসনিক একক ঘোষণা করা হয়েছে। এসব এককসমূহ সে অর্থে এক একটি শাসন কেন্দ্র। বাংলদেশের সংবিধান এসব শাসনকেন্দ্রের দায়িত্ব রাজনৈতিকভাবে নির্বাহের জন্য সৃষ্টি করেছে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনয়ন করা হয়েছে স্ব স্ব প্রশাসনিক একককে পদায়িত প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী দায়িত্বে নিয়োজিত জন-আধিকারিক (Public servant)-গণকে এবং তাদের স্ব স্ব সংস্থাসমূহকে। সাংবিধানিকভাবে এটিই বাংলাদেশের স্থানীয় স্ব-শাসন কাঠামা। বাস্তবে সংবিধান সম্মত সে কাঠামো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে স্থানীয় শাসন অঙ্গণ হয়ে উঠেছে নৈরাজ্যপূর্ণ। জনস্বার্থ এখানে উপেক্ষিত, গোষ্ঠী ও কোটারি স্বার্থই প্রধান্য বিস্তার করে চলেছে।

স্থানীয় শাসন কাঠামোর স্বরূপ

বাংলাদেশে একটি স্থানীয় স্ব-শাসন কাঠামো জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত কাঠামোগতভাবে (Structurally) সুগঠিত। কিন্তু কার্যক্রমগতভাবে (functionally) নানারকমভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ। এ অসঙ্গতিসমূহই এদেশের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থাকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করছে। এখানে প্রতিটি এককে কাঠামো ও কার্যক্রমগতভাবে একটি 'দ্বৈত শাসন' ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি স্তর বা এককে একটি নির্বাচিত স্থানীয় সরকার এবং পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের নানা মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তর-অধিদপ্তরের অধস্তন এক একটি অনু-বিভাগ। যেমন—উপজেলা পর্যায়ের এককে সাধারণ প্রশাসন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রাণী সম্পদ, সমাজসেবা, প্রকৌশল, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, ভূমি প্রশাসন, ভূমি নিবন্ধন, সমবায়, পল্লি উন্নয়ন ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় তেইশ থেকে ত্রিশটি অনু-দপ্তর। একই রকমভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে রয়েছে নয়টি মন্ত্রণালয়ের তেরোটি দপ্তরের প্রায় শতাধিক সরাসরি সরকারি বেতনভূক কর্মচারী। উপজেলা ও ইউনিয়ন মিলিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নানা স্তরের স্থানীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা উপজেলাভেদে যোলোশো থেকে আঠারোশো। পাশাপাশি উপজেলায় নির্বাচিত যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তার নাম

উপজেলা পরিষদ এবং অনুরূপভাবে ইউনিয়নে রয়েছে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ। এদের কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা তিন থেকে পাঁচজন। জেলা পর্যায়ে সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের 'জেলা দপ্তর' রয়েছে উপজেলা ও ইউনিয়নের মতো রয়েছে একটি নির্বাচিত জেলা পরিষদ। কিন্তু জেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তরসমূহ জেলা পরিষদের সাথে সম্পর্ক-বিহীন। বিভাগীয় পর্যায়েও সাধারণ প্রশাসন ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রায় সাতাশটি অধস্তন দপ্তর। এখানে কোনো নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নেই।

দ্বৈত শাসনের রূপ ও ধরন

তিনটি প্রশাসনিক এককে মন্ত্রণালয় ও নানা দপ্তরের যে সব কর্মকর্তা–কর্মচারী তারা মূলত তাদের স্ব স্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে স্থানীয়ভাবে কাজকর্ম করে থাকে। ইউনিয়ন ও জেলায় নির্বাচিত পরিষদের সাথে সরকারি কর্ম সম্পাদনকারী দপ্তর সমূহের কার্যকর কোনো সংস্রব নেই। উপজেলা পরিষদ আইনে আঠারোটি সরকারি দপ্তরকে পরিষদে ন্যস্ত করে একটি বিধান করা হয়, তা এখন আইনে থাকলেও বাস্তবে আর কার্যকর নয়। দৃশ্যত এ তিনটি স্তরের এককে একটি দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিরাজমান। একদিকে নির্বাচিত স্থানীয় পরিষদসমূহের শাসন, অপরদিকে সনাতনী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাগণের শাসন। এটিকে প্রশাসনিক পরিভাষায় বলা হয় 'প্রশাসন' যেমন—উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ইত্যাদি। তবে এ শব্দগুচ্ছের আইনগত ভিত্তি যদিও দুর্বল, কিন্তু চর্চাটি দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষার সংস্কৃতি কায়েমি রূপ পেয়ে যাচ্ছে। যেন রেল লাইনের দুটি সরু ধাতব পথ, চিরদিন পাশাপাশি তবু একে অপরের সাথে মেশে না। এ দ্বৈত ব্যবস্থাটি দৃষ্টিগ্রাহ্য ও দৃষ্টিকটু। কিন্তু শুধু দ্বৈত শাসন বললেও এখানে সমস্যার সম্পূর্ণটি বলা হয় না। এখানে আরও অদৃশ্য অনেক শাসন সূতা ও সূত্র রয়েছে।

স্থানীয় শাসন ও সেবার অদৃশ্য সুতা ও সূত্র

দৃশ্যমান দ্বৈতশাসনের পর যুক্ত হয় আরও দৃশ্য-অদৃশ্য কতিপয় অঙ্গুলির ইশারা ও নির্দেশনা। যাকে চলতি প্রশাসনিক চর্চায় বলা হয় 'উপরের নির্দেশ'। সে নির্দেশ উপেক্ষার কোনো অবকাশ কারও থাকে না। সেটি স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন যার কথাই বলুন। দেশের সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সংসদ সদস্য সে রকম একজন উপরওয়ালা। তিনি যখন যা নির্দেশ, আদেশ ও অনুরোধ করবেন আইন কানুন পাশে সরিয়ে রেখে তা প্রতিপালিত হয়। তার সাথে যুক্ত হয় ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের কিছু আদেশ, নির্দেশ ও অনুরোধ। তারাও এ অধিকারের একটি অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রশাসন বিশেষত, সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ ও সেবা–সরবরাহের সকল দপ্তর সে আদেশ, নির্দেশ ও অনুরোধ গ্রহণ করে থাকে।

এখানে প্রশাসনের যে 'অনুরোধের আসর' বা আছর, তা কিন্তু সব সময় বিনা পয়সায় হয় তা নয়। এখানে বিস্তর টাকা–পয়সার লেনদেন আছে। এখানে ছোট বড় টেন্ডার, সরবরাহ থেকে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের সহায়তা সব কিছুর একটি অদৃশ্য লেনদেনের নিয়ম আছে। সে অলিখিত নিয়মাবলি লিখিত সরকারি আদেশের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

সমাধান সূত্র কী হতে পারে?

সহজ ও সরল সমাধান সূত্র হবে সংবিধান নির্দেশিত পথে 'দ্বৈততা, ত্রৈততা ও বহুগম্যতার চির অবসান। একীভূত ও সমন্বিত একটি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রচলন। প্রশাসনিক এককের সকল স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের একটি সমন্বিত শাসন-কাঠামো পুনর্গঠন জরুরি। উপরের সরকারি আদেশে নয়, অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনার অধীনে সকল স্থানীয় সম্পদ ও সরকারি সম্পদ কাজে লাগানো হবে। সকল সরকারি দপ্তরের স্থানীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। সেজন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও সনাতনী প্রশাসনের বর্তমান বিন্যাসকে পরিবর্তন করে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নতুন একীভূত একটি কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। যার কিছু নমূনা ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীতে পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ এ লক্ষ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের 'স্থানীয় শাসন কমিশন' করে সে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। এ বিষয়ে একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার জাতি আশা করে।

তুলনামূলক স্থানীয় সরকার : ভারত ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ এবং ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত—উভয়ই দেশের তৃণমূলের সংগঠন হলেও আকার, আয়তন, প্রতিনিধিত্বশীলতা, উন্নয়ন ও অর্থপ্রবাহ, রাজনীতি, গণতন্ত্রচর্চা ও নির্বাচনী ব্যবস্থা এক নয়। স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপমহাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। চাণক্য বা কৌটিল্যের (৩৭০-২৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) 'অর্থশাস্ত্রে' তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী সময় আধুনিক যুগে বিশেষত ব্রিটিশ শাসনকালে বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে জেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ত একটি বিধিবদ্ধ কাঠামো পুনর্গঠিত হয়। সেই পুনর্গঠনের দীর্ঘ কালপরিক্রমায় বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম একটি একীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর আওতাভুক্ত হয়। একই রকমভাবে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে গড়ে ওঠে নগর ও নগর শাসন ব্যবস্থা। ১৯৪৭ সালের পর ভারত ও পাকিস্তানের যাত্রা পৃথক হয়ে যায়। ভারতের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় এ উপমহাদেশের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও পাকিস্তান সেই ধারাবাহিকতা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালের পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশেও পাকিস্তানি উত্তরাধিকারের সেই বিযুক্ত ধারাই অব্যাহত রয়েছে।

ভারত একটি বিশাল দেশ। এখানে আঞ্চলিক ও সামাজিক ভিন্নতার সহস্র ধারা। এরমধ্যেও অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসনের একটি নমনীয় একীভূত কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের পর থেকে সারা ভারতের সব অঙ্গরাজ্যে তিন স্তরবিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার এবং এক স্তরীয় নগর সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। সেই ব্যবস্থাধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা মণ্ডল পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হয়েছে। নগরগুলোতে গঠিত হচ্ছে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন। বলতে গেলে কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ পার্থক্য নেই। আমাদেরও ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ নিয়ে তিন স্তরবিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে। রয়েছে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন ব্যবস্থা। কিন্তু পার্থক্য যা, তা হচ্ছে কার্যকারিতা, বিষয়বস্তু, অর্থায়ন, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চর্চায়। অঞ্চলবিশেষে ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতার প্রকৃতি ও গুণ-মানে পার্থক্য রয়েছে। যদি উৎকর্ষের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, তাহলে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় শামিল করা যায়। তিন কোটি ১৮ লাখ (২০০৫) জনসংখ্যার কেরালায় ৯৯৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৫২টি ব্লক পঞ্চায়েত, ১৪টি জেলা পরিষদ, ৫৩টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, পাঁচটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে একই সময়ে আট কোটি জনসংখ্যার জন্য যথাক্রমে তিন হাজার ৩৬০টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৩৩টি ব্লক পঞ্চায়েত,

১৮টি জেলা পরিষদ, তিনটি নগর পঞ্চায়েত, ১১৭টি পুরসভা ও ছয়টি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রয়েছে। বাংলাদেশে একই স্তরীভূত কাঠামোতে আছে চার হাজার ৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯৭টি উপজেলা পরিষদ, ৩১৯টি পৌরসভা ও ১১টি সিটি করপোরেশন। সঙ্গে ৬৪টি জেলা পরিষদ থাকার কথা।

ভারতের সঙ্গে আমাদের স্তরকাঠামো এক হলেও আরও বহু বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমত, ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন ও কার্যকারিতায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোনো অঙ্গরাজ্যই ১৯৯৩ সালের পর থেকে এই বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের পরে স্থানীয় সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সরকার কাঠামো হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী শাসন ও উন্নয়নের বিষয়গুলো কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকারের অর্থায়নব্যবস্থা স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় করার জন্য রাজ্যভিত্তিক স্থানীয় সরকার 'অর্থ কমিশনের' বিধান সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনার সঙ্গে স্থানীয় সরকারগুলোর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা দাঁড় করানো হয়েছে। সংবিধান জেলা পরিকল্পনা কাউন্সিলের মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনাগুলো সমন্বয় ও অর্থায়নের একটি কাঠামো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের বিকাশের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলোর কোনোটিই কার্যকর নেই।

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ এবং ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত—উভয়ই দেশের তৃণমূলের সংগঠন হলেও আকার, আয়তন, প্রতিনিধিত্বশীলতা, উন্নয়ন ও অর্থপ্রবাহ, রাজনীতি, গণতন্ত্রচর্চা ও নির্বাচনী ব্যবস্থা এক নয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্যসংখ্যা জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে ৫ থেকে ২৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কমবেশি সাতজন কর্মচারী রয়েছে। তাদের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট গড়ে এক কোটি রুপি।

কেরালায় প্রতি ৩০০ ভোটারের জন্য একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্যসংখ্যা জনসংখ্যা অনুযায়ী ৭ থেকে ১৭ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে ১৭টি সরকারি দপ্তর গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত হওয়ায় কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ২৭ জনে উন্নীত হয়। কেরালার বাজেটও গড়পড়তা এক কোটি রুপির মতো। উভয় রাজ্যেই পঞ্চায়েতপ্রধান এবং উপপ্রধান সার্বক্ষণিক বেতনধারী কর্মকর্তা হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের আয়তন ও জনসংখ্যা কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলনায় ৫ থেকে ১০ গুণ। কিন্তু এখানে আয়তন ও জনসংখ্যা-নির্বিশেষে সব ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসংখ্যা (৯ + ৩) ১২ জন। সভাপতি বা চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। প্রতি ইউনিয়নে সার্বক্ষণিক কর্মচারী মোটে একজন। চেয়ারম্যান

ও সদস্যদের দায়িত্ব সার্বক্ষণিক, খণ্ডকালীন বা স্বেচ্ছামূলক — কোনটি তার কোনো স্পষ্ট বিধান নেই। নামে গ্রাম পুলিশ হলেও ১০ জন চৌকিদার এবং দফাদারের নিযুক্তি ও দায়িত্ব পালন একইভাবে অস্পষ্ট। বর্তমানে অর্থপ্রবাহ বেড়েছে। তবে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ ২৫ থেকে ৩০ লাখের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতে তৃণমূলের স্থানীয় সরকারের বিচার বিভাগীয় কোনো বিধিবদ্ধ দায়িত্ব নেই। সেখানে বিরোধ মীমাংসার অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা থাকলেও বিচারক্ষেত্রে পুলিশ ও নিম্ন আদালতের ওপরই আইনশৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থা ন্যস্ত। আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিরা তাঁদের কার্যকর কর্মসময়ের একটি বড় অংশ সালিস-বিচারে ব্যয় করে থাকেন। কারণ আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ আইন দ্বারা গ্রাম আদালত হিসেবেও স্বীকৃত।

পশ্চিমবঙ্গ-কেরালায় গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ আমাদের আগেই শুরু হয়েছে। আমাদের ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সরকারি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠান, যদিও এটি ইউনিয়ন পরিষদ অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে আত্তীকৃত।

সংরক্ষিত আসনে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও দুই দেশের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলাদেশে নারী সদস্যদের একটি নির্বাচনী এলাকা থাকলেও সুনির্দিষ্ট কর্ম-এলাকা নেই। ভারতে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধির কর্ম-এলাকা ও নির্বাচনী এলাকা এক। সেখানে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকেই নারীদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আছে।

ভারতে বাংলাদেশের উপজেলা ও জেলা সমপর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ব্লক পর্যায়ের পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা থাকে এবং সেই নির্বাচনী এলাকা থেকে উভয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে সদস্যদের ভোটে ওই দুই পর্যায়ের সভাপতি বা প্রধান নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা — উভয় রাজ্যেই সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই সংগঠনের প্রধান বা সভাপতি নির্বাচিত হন। তাই ভারতজুড়ে পঞ্চায়েত বা পুরসভা নির্বাচন মানেই সদস্য বা কাউন্সিলর নির্বাচন এবং সে নির্বাচনগুলো সব সময় দলভিত্তিক মনোনয়নের মাধ্যমেই হয়। কলকাতা সিটি করপোরেশনে কাউন্সিলরদের পরোক্ষ ভোটেই ১৪০ কাউন্সিলরের একজন মেয়র বা করপোরেশনের নির্বাহী কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গের বিধায়করা, যথা — বিধানসভা, লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পদাধিকারবলে সদস্য হিসেবে গণ্য হন এবং সদস্য হিসেবেই তাঁরা পরিষদের কার্যে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা নিয়ন্ত্রক বা নির্বাহী হিসেবে কোনো কাজ করতে পারেন না। ব্লক ও জেলা

পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারী ও বিভাগগুলো কর্মক্ষেত্রে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য যেমন বজায় রাখে, তেমনি আবার প্রতিটি পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশ নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে চলছে। এখানে আইন কাঠামো, সংগঠন, অর্থায়ন, কর্ম বণ্টন, পরিকল্পনা, জনবল, রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, দৃষ্টিভঙ্গির অনুদারতা-বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান। এগুলো থেকে উত্তরণের জন্য পুরো ব্যবস্থায় প্রয়োজন আমূল সংস্কার। এ ক্ষেত্রে ভারতের কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগতে পারে।

অনুলিখন : চন্দন চৌধুরী

মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সংস্কার

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনেকটাই কেটেছে। যাঁরা নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন, তাঁদের বিবেচনার জন্য কিছু বিষয় তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। বিষয়গুলো অতীতে নানা দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে নানাভাবে এসেছে। কিন্তু অর্থবহ কিছু করা হয়নি। নির্বাচন উপলক্ষে বিষয়গুলো আবারও সামনে আনা উচিত। বিষয়গুলো দুটি প্রধান অংশে ভাগ করে করণীয়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করানো হলো। প্রথমে মাঠ প্রশাসন সংস্কার বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। তারপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো ও আইনের সংস্কার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন সংস্কারবিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনায় আসতে পারে।

মাঠ প্রশাসন বিষয়ে প্রথমে বলতে হয়, ভারত উপমহাদেশে বিভাগ, জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত যে মাঠ প্রশাসন কাঠামো রয়েছে, তা মোটের ওপর ১৭৬৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে উন্মেষ ও বিকাশ লাভ করে। পাকিস্তানের ২৪ বছর ও বাংলাদেশের ১৯৮০ সাল পর্যন্ত-এর মূল কাঠামো ও কার্যপ্রণালিতে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে যা ছিল, বস্তুত এখনো তা-ই আছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো মাঠ প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল না। ১৯৮০-র দশক থেকে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তা দৃশ্যত মৌলিক ও ইতিবাচক মনে হলেও অবশেষে নেতিবাচকতায় পর্যবসিত হয়। যেমন মান উন্নীত থানা, উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি, মহকুমা স্তরের প্রশাসনিক এককের বিলুপ্তি, জেলা ও বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি। একপর্যায়ে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি একটি নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। এককের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা, সরকারের রাজস্ব ব্যয় ও জমি হুকুমদখল করে সুবৃহৎ সরকারি স্থাপনার সংখ্যা। কিন্তু জনসেবার গুণ ও মান আনুপাতিক হারে বাড়েনি; বরং জনজবাবদিহি ও জনসম্পৃক্ততা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। জনপ্রশাসন ও গণপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, কার্যক্রম ও অর্থায়নের সীমানা-পরিধি-সমন্বয়-সহযোগিতা একটি বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়ে।

মাঠ প্রশাসনে আমলা-কামলা বা সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব, একই প্রকৃতির কাজের জন্য একাধিক সরকারি দপ্তর, তাদের মধ্যে ক্ষমতা, অর্থ ও কাজের দ্বন্দ্ব, পদমর্যাদাগত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি দিন দিন প্রকটতর হতে থাকে। প্রকৌশলী, চিকিৎসক ও কৃষিবিদেরা বিসিএস সাধারণ ক্যাডারের কর্তৃত্ব সহজে মানতে চান না। কিন্তু সচিবালয় প্রশাসন সব সময়ই সমন্বয়ের নামে সাধারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তার হাতে অন্য সবার নিয়ন্ত্রণ রেখেই দেয়। উপজেলা থেকে নিচের দিকে বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ) ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ সরকারি বেতন-ভাতা-

পেনশনধারী জনবল রয়েছে। জনবল ও আর্থিকসংশ্লিষ্টতার পরিমাণে বা পরিমাপে সেবাপ্রাপ্তির কোনো মূল্যায়ন নেই। একটি উপজেলায় একই মন্ত্রণালয়ের বা ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের একাধিক দপ্তর একই ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। যেমন—স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সমান্তরালভাবে চলছে। একই মন্ত্রণালয়ের পল্লি উন্নয়ন বিভাগের সমবায় সংগঠনের জন্যও দুটি দপ্তর—যথা সমবায় অধিদপ্তর ও পল্লি উন্নয়ন বোর্ড পৃথকভাবে কাজ করে। সমাজসেবা, যুব, মহিলা, শিশু, আনসার-ভিডিপি, বিআরডিবি প্রভৃতি দপ্তরের কাজের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাত নেই। তারা একই কাজ ভিন্ন ভিন্ন নামে বা প্রকল্পের অধীনে করে থাকে। অনেকের অর্থবহ কাজ না থাকায় ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নানা কাজে বেগার খাটে। অনেকে কর্মস্থলে প্রায় অনুপস্থিত থাকেন। অনেক দপ্তরে পদায়িত কর্মকর্তাই নেই। অন্য উপজেলার কর্মকর্তা চলতি বা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ চালান। এ ব্যবস্থা মোটামুটি নিয়মে পরিণত হয়েছে।

উপজেলায় একটি সুবিধা হচ্ছে, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা সবাই একই ক্যাম্পাসে অফিস করেন। উপজেলা পরিষদের নামকওয়াস্তে একটি নজরদারিও আছে। জেলায় তা-ও নেই। জেলার সরকারি দপ্তরগুলো জেলা শহর জুড়ে বিস্তৃত। জেলা পরিষদের সঙ্গে যেমন জেলার উন্নয়ন দপ্তরগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি ডেপুটি কমিশনারকে 'জেলা প্রশাসক' বলা হলেও জেলার সার্বিক প্রশাসনে সে দপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা হয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে। ওই সভায় সবাই আসেন না। জেলা পরিষদের নির্বাচিত সভাপতি থাকলেও এ ক্ষেত্রে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী, জেলা প্রশাসকের কর্মতালিকায় ৫০২টি কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জেলাভেদে পার্থক্য হলেও একজন জেলা প্রশাসক কমবেশি ৯০-১০০টি কমিটির সভাপতি। তাছাড়া, জেলার সব সরকারি ভূ-সম্পত্তির কার্যত মালিক জেলা প্রশাসক। ভূমি রাজস্ব আদায় ও জমির রেকর্ড তাঁর জিম্মায়। এই ভূ-সম্পত্তির মধ্যে খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি আছে। এ দেশে জলাভূমি বেদখল, অপদখল বা ভূমিদস্যুতা ইত্যাদি সর্বজনবিদিত। জেলা প্রশাসকেরা সরকারের ভূ-সম্পদ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেননি। এটিই তো তাঁদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হওয়ার কথা। দেশের প্রতিটি জেলায় কী পরিমাণ সরকারি জমি কখন, কীভাবে বেহাত হয়েছে, তার মূল্যায়ন দরকার এবং অপদখল-বেদখল থেকে সরকারি জমির সুরক্ষা একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার একাধারে ভূমি মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নির্দেশ গ্রহণ করেন। এছাড়া অন্যান্য উন্নয়ন, সেবা ও রেগুলেটরি বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করে থাকেন। তাছাড়া, জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্যাবলির একটা মুখ্য দায়িত্ব জেলা

প্রশাসকের ওপরই বর্তায়। এভাবে দীর্ঘকাল ধরে 'জেলা প্রশাসন' নামের এ কাঠামোটি সর্বকাজের কাজি হয়ে সুনির্দিষ্টতা, সঠিক কার্যকারিতা ও মনঃসংযোগবিন্দু হারিয়ে ফেলেছে। তাই জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ এবং জেলার সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রমগুলোর ভূমিকা, কার্যক্রম, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। কর্মবণ্টন সঠিক ও সুষম এবং জবাবদিহি সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

অন্যদিকে কোনো রকম কমিটি বা কমিশন ছাড়াই দেশে বিভাগের সংখ্যা বেড়েই চলছে। ভারতে প্রায় ১৭টি রাজ্যে বিভাগীয় স্তরটি নেই। ব্রিটিশ আমলে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ঔপনিবেশিক জেলা প্রশাসনকে তদারকির জন্য বিভাগীয় কমিশনারের পদটি সৃষ্টি হয়। ১৯৪০-এর দিকে গঠিত 'রয়্যাল কমিশন অন ডিসেন্ট্রালাইজেশন' প্রশাসনিক একক হিসেবে 'বিভাগ' বিলুপ্তির সুপারিশ করে। ইতিমধ্যে সড়ক, রেল ও আকাশপথসহ সব ধরনের যোগাযোগব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। তাই এ যুগে আর বিভাগের প্রয়োজন নেই। অথচ এ দেশে এই অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক স্তরের জন্য রাজনৈতিক আগ্রহ আকাশচুম্বী।

মাঠ প্রশাসনকে দক্ষ, লক্ষ্যাভিমুখী, সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ করা প্রয়োজন। 'সকল কাজের কাজি' ধরনের প্রশাসকের যুগ বাসি হয়েছে। এখন কাজ হবে সুনির্দিষ্ট, ফলাফল পরিমাপযোগ্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হবে দ্রুত ও ব্যয়সাশ্রয়ী। এ ছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করা প্রয়োজন তা হলো, প্রশাসন ও রাজনীতির পৃথকীকরণ। কোনো পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী কোনো স্থানীয় বা জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ গ্রহণ করবেন না। সরকারি কর্মচারীরাও রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কোনো বিশেষ অনুগ্রহ চাইতে পারবেন না। সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি চাকরিবিধি অনুযায়ীই হবে। সরকারি কর্মচারীদের দলসংশ্লিষ্টতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। দলীয় রাজনীতির হস্তক্ষেপ থেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ব্রিটিশ শাসনের ৭০ বছর পরও মাঠ প্রশাসন-কাঠামো প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার না হওয়ায় তা বহু ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল, কালক্ষেপণকারী, অপচয়ী ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তার ওপর রাজনীতি ও প্রশাসনের সীমারেখা মুছে যাওয়ায় নিরপেক্ষ ও পেশাদার প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বেসরকারি খাতের বিকাশের কারণে সরকারি বহু দপ্তরের কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে পড়েছে। যেমন—ডাক বিভাগ, বিএডিসি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, জনশক্তি উন্নয়ন, নারী উন্নয়নসহ অনেকের সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের প্রবল প্রতিযোগিতা। এখানে অসুস্থ প্রতিযোগিতার বদলে সুস্থ সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

জাতীয় ও স্থানীয় মাঠপর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই কিছু দপ্তর ও বিভাগের বিলুপ্তি বা একত্রীকরণ প্রয়োজন। যেমন একই মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দুটি পৃথক অধিদপ্তরের

বিষয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ব্রিটিশ সময়ের দপ্তর, এলজিইডি ১৯৮০-এর দশকে সৃষ্ট। একইভাবে সমবায় অধিদপ্তর ১৯০৪ সালের প্রতিষ্ঠান আর বিআরডিবি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সৃষ্টি করা হয়। তাদের কাজের যে ধরন, তাতে পৃথক দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এখন সময় হয়েছে এগুলোর সুষমভাবে একত্রীকরণের। কিছু সরকারি দপ্তর বিলুপ্ত বা অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়। আর যেসব বিষয়ে বেসরকারি খাত অধিক দক্ষ ও ব্যয়সাশ্রয়ী, সেসব খাতে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার সঠিক ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। তবে এসব সিদ্ধান্ত কখনো নির্বাহী আদেশে হওয়া উচিত নয়। তাই এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে এসব বিষয় বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হোক। নির্বাচনী অঙ্গীকারে মাঠ প্রশাসন সংস্কারের অ্যাজেন্ডা স্থান পাক। নির্বাচনের পর একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে মাঠ প্রশাসন সংস্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

নিখোঁজ জেলা পরিষদকে দৃশ্যমান করুন

জেলা পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও আধুনিক স্থানীয় সরকারের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র সময় থেকে মোগল শাসনকাল পর্যন্ত এ দেশে আধুনিক জেলার প্রতিরূপক একটি প্রশাসনের সদম্ভ উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সমরের পর থেকেই আধুনিক জন-অংশগ্রহণমূলক ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল একটি কাঠামোর উন্মেষ ও বিকাশ শুরু হয়। ১৮৮৫-১৮৯০-এর মধ্যে পূর্ব বাংলার অনেক জেলায় 'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড' গঠিত হয়। শুরুতে 'ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর' জেলা পরিষদগুলোর সভাপতি থাকলেও ধীরে ধীরে মনোনীত নন-অফিশিয়াল সদস্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণের পথ সুগম হয়।

১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের সংস্কার উদ্যোগ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময়, এরমধ্যে যদি কোনো জনসংগঠন জনসেবার দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সক্ষমতায় বিকশিত বলে ধরে নেওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে 'জেলা বোর্ড'। ব্রিটিশ শাসনামলে জেলা বোর্ড গ্রামীণ সড়ক, প্রাথমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, দাতব্য চিকিৎসালয়, পশুচিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, সুপেয় পানির ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্ব পালন করত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে জেলা পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক প্রশাসন কাঠামো তৈরির প্রয়াস শুরু হয়। যেমন ১৯৭৫ সালে 'জেলা গভর্নর' পদ্ধতি, বিএনপি আমলে 'জেলা মন্ত্রী' এবং জাতীয় পার্টির সময় একজন জাতীয় সংসদ সদস্যকে চেয়ারম্যান এবং মনোনীত সদস্য ও কর্মকর্তা সদস্য নিয়ে একটি জেলা পরিষদ চালু করা হয়, যা ১৯৯১ সালের পর পরিত্যক্ত হয়। এভাবে জেলা পরিষদ ভবন, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সহায়-সম্পদ প্রভৃতি থাকলেও এটি জনপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল দীর্ঘদিন অকার্যকর ও অবহেলিত। প্রেষণে নিয়োজিত একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এটির পাহারাদারির কাজ করে গেছেন এবং ডেপুটি কমিশনার ও জেলার সাংসদেরা এটির ওপর কর্তৃত্ব করেছেন।

২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার নতুন জেলা পরিষদ আইন পাস করে। ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বর জেলার সিনিয়র রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকে ৬১ জন প্রশাসক নিয়োগ করে নতুন আইনে জেলা পরিষদ কাজ করতে শুরু করে। ২০১৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ২০০০-এর অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং চেয়ারম্যানসহ ২১ সদস্যের জেলা পরিষদ কাজ শুরু করে। ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কাজের যে অভিজ্ঞতা, তা থেকে জেলা পরিষদের কাজের বহু চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়, যেগুলোর আশু সমাধান প্রয়োজন। অন্যথায় এ সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান গতিশীলতা হারিয়ে অকার্যকর ও স্থবির হয়ে পড়বে।

২০১১ সালের আগের জেলা পরিষদের কথা বাদ দিয়ে এই ৯-১০ বছরের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়নের একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো হিসেবে জেলা পরিষদ পুনর্গঠন সময়োপযোগী ও সফল উদ্যোগ। স্থানীয় নেতৃত্বের ক্ষমতাচর্চার এ পরিসরের ১০ বছরের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনাকে নতুনভাবে যাচাই করার সময় আগত। ২০২১ সালের দ্বিতীয় নির্বাচনের আগে এখনকার মধ্যবর্তী সময়কে বাংলাদেশের জেলা পরিষদগুলোর একটি যুগসন্ধিক্ষণ বা ক্রান্তিকাল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই ভবিষ্যতে বিবেচনার জন্য বর্তমান জেলা পরিষদের কিছু সমস্যার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১. বাংলাদেশের এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় যদি কেন্দ্র থেকে প্রান্তে কোনো ধরনের ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়নের প্রশ্ন আসে, তার প্রধান একক হবে জেলা। জেলা মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু দীর্ঘদিন জেলা, বিভাগ ও উপজেলা–এ তিনটি এককের সাধারণ, রেগুলেটরি, উন্নয়ন ও সেবা প্রশাসন ব্যবস্থার কোনো নির্মোহ মূল্যায়ন হয়নি। ১৯৪০ সালের 'রয়েল কমিশন অন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসেন্ট্রালাইজেশন'-এর পর পাকিস্তান বা বাংলাদেশে বারবার নির্বাহী আদেশে নানা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকতার বিবেচনায় নিরপেক্ষ ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে কোনো কমিটি/কমিশন কাজ করেনি। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে (১৯৭২-৭৩) গঠিত কমিটির যে সুপারিশ, পরবর্তীকালে তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে ডেপুটি কমিশনারকে বাংলায় 'জেলা প্রশাসক' বলা হলেও সত্যিকারের 'জেলা প্রশাসন' বলে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। জেলাজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার পৃথক নানা দপ্তর। সেসব দপ্তরের সবাই পৃথক ম্যান্ডেটসহ মন্ত্রণালয়ের অধীনেই কাজ করে থাকে। সরকারের চারটি বিশেষ প্রকৃতির যে দপ্তরগুলো (সাধারণ, রেগুলেটরি, সেবা ও উন্নয়ন) তাদের পারস্পরিক কর্ম-সম্পর্ক এবং সত্যিকারের অনুভূমিক সমন্বয় ও যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। জেলায় সরকারের সব কর্মকাণ্ডের মাঠপর্যায়ে কোনো কেন্দ্রবিন্দু নেই। জেলার নিজস্ব কোনো ভিশন বা পরিকল্পনা নেই। কিছুটা অত্যন্ত শিথিলভাবে ডিসি এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সাংসদেরা অথবা জেলার কোনো মন্ত্রী থাকলে তিনি তাৎক্ষণিক কোনো কোনো নির্দেশনা দপ্তরগুলোকে দিয়ে থাকেন। নতুবা প্রতিটি দপ্তর তাদের নিজ নিজ নিয়মেই পরিচালিত হয়। এ রকম একটি অবস্থায় দেশে গঠিত হলো জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদ এই অবস্থায় একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে খুঁজে পায় না। যেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরে এক ছোট্ট তরি। একদিকে রাজনৈতিকভাবে এমপি-মন্ত্রী, প্রশাসনিক দিক থেকে ডিসি-এসপিসহ সব সরকারি দপ্তর, নিচে উপজেলা ও ইউনিয়ন। আইনগতভাবে কারও সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক নেই, শুধু জেলার এমপিরা যথারীতি উপজেলা ও জেলা পরিষদের উপদেষ্টা। উপদেষ্টারা একটি কাজই জেলা পরিষদকে দিয়ে করান, তা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ। আইনগতভাবে জেলা

পরিষদের সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ তথা মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সম্পর্ক নেই। মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়া জেলা পরিষদ কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে না। জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা উন্নয়ন সমন্বয়ে ডেপুটি কমিশনার কিংবা জেলা পরিষদ কারও কার্যকর ভূমিকা নেই।

২. জেলার অন্যান্য সরকারি উন্নয়ন ও সেবা দপ্তরের সঙ্গে জেলা পরিষদের কার্যকর আইনি সম্পর্কও ঐচ্ছিক। উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ পৃথক আইনবলে গঠিত এবং জেলা পরিষদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্ব-ব্যাখ্যাত নয়।

৩. জেলা পরিষদ নির্বাচনের পরও জেলা পরিষদ ও মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কে পরিবর্তন আসেনি। ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ নির্বাচিত পরিষদ প্রতিষ্ঠার আগে যা ছিল, তা-ই অনুসরণ করা হচ্ছে।

৪. জেলার ভূমি উন্নয়ন করের ১ শতাংশ অর্থই জেলা পরিষদের স্থানীয় আয়ের মূল উৎস। দীর্ঘদিন অকার্যকর থাকায় জেলা পরিষদের অনেক সম্পদ বেহাত, অপদখল ও বেদখল হয়ে আছে। এগুলো উদ্ধারের বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন অতিরিক্ত কিছু অর্থ। বেহাত হওয়া সম্পদ উদ্ধার করে ওই সব সম্পদের উন্নয়ন করা গেলে জেলা পরিষদগুলো অনেক বেশি লাভবান হতে পারে।

৫. জেলা পরিষদগুলো অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তার কারণে ভেতর থেকেও দুর্বল হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে এটিও উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মতো ভাগাভাগির সংস্কৃতিতে একাকার হয়ে যাবে। তিনটির (ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা) কোনো পরিষদই পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা করে না। তিনটি পরিষদ যৌথভাবে বা কোনো একক পরিষদ এককভাবেও কোনো বড় টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করে না। পরিষদের উন্নয়ন তহবিল পূর্বপরিকল্পনার অধীন কোনো প্রকল্পে ব্যয়ের পরিবর্তে তহবিলের প্রাপ্ত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করেই তার ভিত্তিতে প্রকল্প রচনা হয়। এটিকে স্থানীয় পরিষদের সদস্যরা তাঁদের অধিকার মনে করেন। এটি একটি বিকৃত উন্নয়ন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের ১৩ জন সদস্য, উপজেলা পরিষদ সব ইউপি চেয়ার, দুই ভাইস চেয়ার এবং চেয়ারম্যান মিলে কমবেশি ১৫ জন এবং নির্বাচনের পর থেকে জেলা পরিষদেরও ২১ জনের মধ্যে ভাগাভাগির সেই সংস্কৃতিতে গা ভাসানো শুরু হয়েছে। ফলে ভাগের মা গঙ্গা পাচ্ছে না। টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে ব্যাহত। মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন নির্দেশনাও পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে এমপি-মন্ত্রীদের নিজস্ব প্রকল্প।

জেলা পরিষদের দ্বিতীয় নির্বাচনের আগে জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ সম্ভাব্য সংশোধনীগুলো পর্যালোচনা করা উচিত। প্রয়োজন বিধি ও পরিপত্রগুলোর অনেক সংশোধন। ২১ সদস্যের এ পরিষদের চার বছরের অভিজ্ঞতার কার্যকর মতবিনিময় হোক এবং খোলাখুলি আলোচনার পর আইন, বিধিবিধান, পরিপত্র এবং পরিষদের নিজস্ব চর্চার ক্ষেত্রে কোথায় কী পরিবর্তন দরকার, তা ভালোভাবে চিহ্নিত হোক এবং সময় থাকতে সংশোধিত হওয়ার পর দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক—এটিই প্রত্যাশা এবং সময়ের দাবি।

উপজেলা পরিষদ জটিলতার অবসান চাই

সম্প্রতি উপজেলা পরিষদ নিয়ে মাননীয় বিচারপতি মো. মজিবুরর রহমান মিয়া ও মো. কামরুল হোসেন-এর আদালত থেকে পাঁচজন জনপ্রতিনিধির গত ৭ (২০২০) ডিসেম্বরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৬ জানুয়ারি উপজেলা পরিষদ আইনের 'ধারা ৩৩ কেন অসাংবিধানিক হবে না' এ মর্মে রুল জারি করা হয়। সরকার এ পরিপ্রেক্ষিতে 'উপজেলা পরিষদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিধিমালা-২০১০' সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করলেও মাঠে তা কার্যকর হচ্ছে না। এবিষয়ের এক সম্পূরক শুনানিকালে রুলের পূর্ণাঙ্গ রায়ের পূর্বে উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি বিভাগের নথিপত্র নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে চেয়ারম্যানের কাছে উপস্থাপনের আদেশ দেওয়া হয়। উচ্চ আদালতে ১৫ জুনের দায়ের করা অপর এক রীটের আদেশে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি এস.এম. মনিরুজ্জামান উপজেলা পরিষদ ভবনের 'সাইন বোর্ড' যথাযথভাবে লিখা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদেরও নিরাপত্তা দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। এ দুটি আদেশ উপজেলা পরিষদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতা ও সম্মান পুনরুদ্ধারে একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তবে উপজেলা পরিষদ তথা এ মধ্যবর্তী স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি নামে বহাল থাকলেও কার্যত অচল। তাই পূর্ণাঙ্গ শুনানির পর উচ্চ আদালতের এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আদেশ আশা করি। এরকম কোনো আদেশ হলে, তা স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংবিধানের অঙ্গীকারকে পুনপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। শুধু উপজেলা পরিষদ নয়, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ কোনো ক্ষেত্রেই আইন করা এবং আইন কার্যকর করা উভয়ক্ষেত্রে পদে পদে সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাই উপজেলা পরিষদ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রায় অপর প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও একটি যুগান্তকারী নযির হিসেবে প্রতিভাত হবে।

২০২২ সালের ৭ নভেম্বর উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো। ১৯৮২ সনের ২৩ ডিসেম্বর 'স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ-১৯৮২' জারি হয় এবং একই বছরের ৭ নভেম্বর থেকে এটি কার্যকর হয়। এ অধ্যাদেশের অধীনে পর্যায়ক্রমে 'মানোন্নীত থানা' প্রশাসন সৃষ্টি করে নতুন আদলে আটটি পর্যায়ে 'থানা পরিষদ' গঠিত হয়। তখন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন অফিসার 'থানা নির্বাহী কর্মকর্তা' ও অন্তর্বর্তিকালীন বা অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসেবে কার্য পরিচালনা করতেন। ১৯৮৪-র শেষ দিক থেকে থানা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয় এবং এ নির্বাচনকে ঘিরে নানা রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সে সময় থেকে এ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির নানামুখী সমস্যার শুরু। নানা প্রকার ও প্রকরণে সে সমস্যাসমূহ লতায়-পাতায় বৃদ্ধি পেয়ে

প্রতিষ্ঠানটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। এখন এটি মোটামুটি একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান। অবশ্য মাঝখানে ১৯৯২ সন থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সতেরো বছর এ পরিষদ বিলুপ্ত ছিল। কুদরতে এলাহি পনির বনাম বাংলাদেশ মামলায় প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের রায়ের পরও সরকারসমূহ প্রায় বিশ দফা সময় নিয়েও পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে নতুন আইন করে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

বর্তমান পরিষদের অকার্যকরতার উপাদানগুলো সবার মোটামটি জানা, কিন্তু সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেই। প্রথম এবং প্রধান কারণটি 'রাজনৈতিক'। আইন প্রণেতা এমপিগণ তাদের নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি বা সমকক্ষ নেতৃত্ব সহ্য করতে পারেন না। তাই সংবিধানসম্মত না হলেও স্থানীয় সরকারের আইন ও শাসন কাঠামোকে তারা দুর্বল রাখতে বদ্ধপরিকর।

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২৫(১) বলে প্রতিজন জাতীয় সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনি এলাকার উপজেলা পরিষদের 'উপদেষ্টা'। পৃথিবীর কোথাও কোনো আইন বা বিধিতে উপদেষ্টার উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়ার কোনো নযির নেই। বাংলাদেশের উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক। ধারা ২৫(২) পরিষদের সকল সরকারি যোগাযোগ উপদেষ্টাকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কাজের পৃথকীকরণকে জোরালোভাবে সমর্থন করে। এখানে 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান' সমূহ সংবিধানের শাসনবিভাগ অংশের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হয়েও আইন বিভাগের সদস্যদের অযাচিত হস্তক্ষেপমুক্ত নয়। উপজেলা পরিষদ অকার্যকরের দ্বিতীয় রাজনৈতিক কারণটি হচ্ছে রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোনয়ন বাণিজ্য এবং ভোটারবিহীন নির্বাচন। বিনা ভোটের নির্বাচনে ভোট বৈতরণী পার হওয়া বেশীর ভাগ নেতারা জনসম্পৃক্ত নন। তারা অনেক ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতাহীন স্বেচ্ছাচারী আমলার চেয়েও অনেক গুণ বেশি ভয়ংকর হয়ে যান।

অকার্যকারিতার দ্বিতীয় উপাদান 'ত্রুটিযুক্ত আইন ও প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা'। প্রথমে আইন প্রসঙ্গে বলা যায়, ধারা ১৩, ২৫, ২৬, ২৯ ও ৩৩-এর উদাহরণ এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ১৯৯৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ সনের ৩০ জুন সংশোধিত আকারে পুনরায় জারি করা হয়। নিম্নে দফা বা ধারাওয়ারি এ আইনের কিছু অসঙ্গতি তুলে ধরা হলো।

১. আইনের ১৩ ধারার বিধানাবলির অপব্যবহার করে অনেক চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যানকে রাজনৈতিকভাবে হেয় বা হেনস্থার অনেক নযির ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হেনস্থার শিকার সাময়িক বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তিগণ আদালতের আদেশে স্বপদে পুনর্বহাল হয়েছেন। তাই এ ধারাটি পুনর্বিবেচনার বা সংশোধন প্রয়োজন।

২. ধারা ২৫(১) বলে প্রতিজন জাতীয় সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনি এলাকার উপজেলা পরিষদের 'উপদেষ্টা'। পৃথিবীর কোথাও কোনো আইন বা বিধিতে উপদেষ্টার উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়ার কোনো নযির নেই। বাংলাদেশের উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক। ধারা ২৫(২) পরিষদের সকল সরকারি যোগাযোগ উপদেষ্টাকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কাজের পৃথকীকরণকে জোরালোভাবে সমর্থন করে। কিন্তু বিগত ১৫ বছর-এর কোনো প্রতিকার নেই।

৩. ধারা ২৬ পরিষদের গণতান্ত্রিক চরিত্র বিকাশ এবং একটি সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উপজেলা পরিষদ আইন 'উপজেলা পরিষদ'কে সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী করেছে, 'চেয়ারম্যান'কে নয়। চেয়ারম্যান বা অন্য কেউ পরিষদের পক্ষে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সে ক্ষমতা প্রযোগ করবে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, চেয়ারম্যানগণ পরিষদকে অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়াল খুশি মতো নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে পরিষদে আলোচনা হয় না বা পরিষদের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা হয়। উপজেলা পরিষদের গাড়ির ব্যবহারে চেয়ারম্যানের একাধিপত্য, ভাইস চেয়ারম্যানদের কার্যহীন করে রাখা, নিয়মিত অফিস না করা, আইন বহির্ভূতভাবে সরকারি যানবাহন ব্যবহার, অফিসে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানো, ইত্যাদি অভিযোগ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাধারণ। এসবের কোনো প্রতিবিধান হয় না।

৪. ধারা ২৪(২) অনুসারে পরিষদকে হস্তান্তরিত দপ্তরের কর্মকর্তাদের বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন (Annual Performance Report-APR) লেখার দায়িত্ব দেওয়া আছে। পরিষদে আলোচনা করে তা চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানদের লেখার কথা। এ পর্যন্ত ১৩ বছরে (২০২৩) কোনো পরিষদ এ কাজটি করেনি। নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের এ প্রতিবেদনের আওতায় না আনা পরিষদ ও চেয়ারম্যানদের ব্যর্থতা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, নির্বাহী কর্মকর্তা এবং চেয়ারম্যান সবাই পৃথক ও যৌথভাবে এ জন্য দায়ী। কারণ এটি একটি ইচ্ছাধীন অবহেলা যা দেখেও না দেখার ভান করে।

৫. ধারা ২৯ অনুসারে উপজেলা পরিষদের ১৮টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হবার কথা। ইউনিয়ন পরিষদসহ দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কমিটির বিধান থাকলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে উপজেলা পরিষদের আইন সংশোধন করে 'স্থায়ী' শব্দটা কেটে দিয়ে শুধু 'কমিটি' করে দেওয়া হয়। যার ফলে এ কমিটি তার গুরুত্ব হারিয়েছে। এ 'কমিটি'র সভা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কোনো সহযোগিতা করে না। ফলে বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের অর্থ ব্যয় ও কার্যকলাপের কোনো জবাবদিহিতা নেই।

৬. ১৯৯৮ সালের মূল আইন যা ২০০৯ সালে পুনঃকার্যকর করা হয় তাতে ধারা ৩৩-এ বলা হয়, 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের সচিব হইবেন এবং তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।' এটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও বোধগম্য বিধান ছিল। ২০১১ সালে একটি সংশোধনী এনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে 'সচিবে'র দায়িত্ব

থেকে অস্বচ্ছভাবে সরিয়ে আনা হয়। উপরন্তু 'মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা' হিসেবে নতুন সৃষ্ট পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, আবার দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তখন থেকে আর সচিব নন। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে একজন সচিব থাকেন। উপজেলা পরিষদে কোনো সচিব নেই। 'সাচিবিক দায়িত্ব' মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার পালন করার কথা। কিন্তু উপজেলা পরিষদের সাচিবিক কাজের যে ব্যাখ্যা-বর্ণনা 'উপজেলা পরিষদের (কার্যক্রম বাস্তবায়ন) বিধিমালা-২০১০ দেওয়া আছে কোনো উপজেলা পরিষদেই ইউএনওগণ একাজগুলো বিধি মোতাবেক করেন না। নির্বাহী কর্মকর্তার উপর বর্তায় এরূপ দায়িত্ব যেমন, সভার 'কার্যপত্র' লেখা, সভার সিদ্ধান্তের ফলোআপ ও বাস্তবায়ন মনিটরিং, মাসিক সাধারণ সভা ও রেগুলেটরি বিভাগগুলোর 'ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা'র জন্য প্রতিটি বিভাগের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন, কমিটি (স্থায়ী কমিটি)-র সভা অনুষ্ঠানে সহায়তা ও কমিটির সভার সুপারিশসমূহ নিয়মিত মাসিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন ইত্যাদি কাজগুলো যে হয় না তা দেশের যে কোনো উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী দেখলেই তা বোঝা যায়। এ কার্যবিবরণী ডেপুটি কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার, ডিএলজি এবং মন্ত্রণালয়ের উপজেলা সেল নিয়মিত পান। তারা কেউ কী কোনোদিন এসব বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেছেন? উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার যে কর্মতালিকা তার মধ্যে আঠারোটি কাজ উপজেলা পরিষদের সাথে করার কথা। 'বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন' এবং 'বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন' এ তার প্রতিফলন থাকার কথা। যারা এসব লিখেন, তারা কী বিষয়গুলো কখনও খোঁজ নিয়েছেন?

৭. উচ্চ-আদালত সঙ্গতকারণে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগকে নোটিশ করেছেন। উপজেলা পরিষদ আইনের ধারা ২৪(৩)-এ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপর একটি গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ বিভাগ একটি কমিটি করে সময়ে সময়ে উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত কর্মকর্তা ও দপ্তরগুলোর সমস্যা সমাধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমার জানা মতে ২০১০ থেকে ২০১৪-এ সময়ের মধ্যে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে দুটি সভা করা সম্ভব হয়। একটি সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, কর্মকর্তা-কর্মচারী ন্যস্ত হলেও ঐ দপ্তরগুলোর তহবিল উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত হয়নি। অবিলম্বে হস্তান্তরিত বিভাগগুলোর তহবিল পরিষদে ন্যস্ত করা উচিত। ১৯৮৩ থেকে ১991 পর্যন্ত তাই হয়েছে। ২০১০ থেকে চালু হওয়া পরিষদের বেলায় তা আর কার্যকর হয়নি। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ তাদের সভার সিদ্ধান্তের কোনো ফলোআপ করেননি। ২০১৫ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত কোনো সভা করেছেন কি-না তাও জানা যায়নি।

আদালতের যে আদেশ, সকল নথি চেয়ারম্যানের দপ্তরে নিস্পত্তি হতে হবে বলে বলা হয়েছে, সেটি কার্যকর হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত দপ্তরগুলোর অর্থ ব্যয়ের প্রস্তাব পরিষদে আসে না। কর্মকর্তা হস্তান্তরিত হলেও দপ্তরগুলোর 'অর্থ ও কর্ম' পরিষদের আইনকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে, হস্তান্তর করা হয়নি। পরিষদে হিসাব, অর্থ ও সাচিবিক দায়িত্ব পালনের

কোনো কর্মকর্তা নেই। উপজেলা পরিষদ হলো তিন খুঁটির ঘর—এমপি, চেয়ারম্যান ও ইউএনও। যে খুঁটি দুর্বল সেদিকে এ ঘর হেলে পড়ে। সরকার চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও ইউপি চেয়ারম্যানদের ভালো বেতন-ভাতা দিচ্ছেন। নির্বাচন একতরফা হওয়ায় কোথাও জবাবদিহির হাঙ্গামা নেই। তারা এদিক থেকে ভালোই আছেন। উচ্চ আদালত এখন জনগণের শেষ ভরসা স্থল। তাই উচ্চ আদালতের আদেশ ও পর্যবেক্ষণে উপজেলা পরিষদ তথা স্থানীয় সরকারের সার্বিক চিত্রটা উঠে আসুক, দেশবাসী সেটি দেখার জন্য উৎসুক।

গ্রামে হবে সালিস, আদালত হোক উপজেলায়

৫ সেপ্টেম্বর '২২ *প্রথম আলোয়* 'কার্যকর গ্রাম আদালতের প্রত্যাশা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে। বিচার ও আইন-আদালত কোনো জনতুষ্টির (পপুলিস্ট) বিষয় নয়। এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'গ্রাম আদালত' নামক যে প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় এবং প্রতিবার মেয়াদ শেষে কিছু কিছু সুপারিশ নিয়ে সরকারের দরজায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কড়া-নাড়ানো হয়, তাতে বাংলাদেশের সংবিধান, বিদ্যমান ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো এবং গ্রামীণ সালিস-বিচার সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রেক্ষাপট পুরোপুরি বিবেচনায় নেওয়া হয় না। এখানে তড়িঘড়ি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বা নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আবহমানকাল ধরে প্রকল্প ছাড়াই গ্রামে একটি 'সালিস ব্যবস্থা' চলে এসেছে, এখন আর প্রকল্প ছাড়া তা কেন চলবে না। এখন গ্রাম আদালতের স্বার্থে প্রকল্প না প্রকল্পের স্বার্থে আদালত, তা বুঝতে কষ্ট হয়।

পৃথিবীর কোথাও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আদালতকে যুক্ত করা হয় না। আদালত একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থা সংযুক্ত নয়। তবে কমিউনিটি পর্যায়ে সালিসপ্রথা বিদ্যমান আছে এবং থাকবে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমল থেকে সে সালিসপ্রথার ধারাবাহিকতা ছিল। ১৯৭৬ সালে সামরিক সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে আগের সালিসি ব্যবস্থাকে 'আদালতে' রূপান্তরিত করে। সত্যিকার অর্থে 'গ্রাম আদালত' বলতে যা বোঝায়, এখানে তা গ্রাম এবং আদালত কোনোটাই নয়। দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি, যিনি ইউনিয়ন পরিষদের 'চেয়ারম্যান' হন, তিনিই হন পদাধিকারবলে এ আদালতের প্রধান বিচারক। অন্য দুজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, তাঁরাও নির্বাচিত ব্যক্তি। নির্বাচিত ব্যক্তিরা যে কাজের জন্য নির্বাচিত, তাঁরা সে কাজটি ভালোভাবে করুন। তাঁরা আদালত বসিয়ে বিচারও করবেন, দেশের সংবিধান সে দায়দায়িত্ব কোনো নির্বাচিত সংস্থাকে দেয়নি। আদালতের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কোনো সংস্থার নামের আগে-পিছে 'আদালত' লেখা যায় বলেও জানা নেই।

তা ছাড়া 'স্থানীয় সরকার' সংবিধানে শাসন বিভাগের অন্তর্গত বিষয়। স্থানীয় সরকারের ওপর আদালতের এখতিয়ার নেই, আদালত কার্যক্রমেও স্থানীয় সরকারের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ থাকুক সেটি কেউ চাইতে পারে না। সংবিধান শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে দিয়েছে এবং এ বিধান দেশে এখন পুরোপুরি কার্যকর। কোনো প্রকল্পের গবেষণায় রাজনৈতিক দলের প্রতীকে নির্বাচিত একটি সংস্থা বিচারকার্যে অতিশয় কার্যকর প্রমাণিত হলেও নয়। তাহলে সংবিধান, দেশের ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন এবং দীর্ঘদিনের বিচারপ্রক্রিয়ার অনুসৃত নীতি ভঙ্গ হয়।

তাঁরা উভয় পক্ষের সম্মতিতে সালিস-মীমাংসা ও এডিআর ইত্যাদিতে অংশ নিতে পারেন, কিন্তু আদালত বসিয়ে বিচার করতে পারেন না। গ্রাম আদালতের নামে যে আইন, তা বর্তমান সংবিধানসম্মত নয়। আদালতে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদপ্রার্থী হওয়ার শর্ত হিসেবে তাঁদের আইনবিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক নয়। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁরা কীভাবে বিচারক হয়ে যান? তার ফলে অনেক ন্যায়বিচারের ব্যত্যয় ঘটে (মিসক্যারিজ অব জাস্টিজ) হয়। এগুলো দেখার কেউ নেই। অনেকে ইউএনওদের এসব দেখার কথা বলেন। সত্যিকার অর্থে ইউএনওর কাজের কোনো শেষ নেই। এ বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে বিচার কাজের প্রতি সুবিচার হবে না বা তদারকিও কার্যকরভাবে সম্ভব নয়।

বিষয়টি নিয়ে এর আগেও আমি লিখেছি (*প্রথম আলো* ২৫/২০/২০১২ এবং ০৬/১২/২০১৮)। উচ্চ আদালতে এবিষয়ে মামলাও হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে স্থায়ী ও টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে কেউ আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসছেন না। দেশের বিজ্ঞজনদের সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে পপুলিস্ট চিন্তাজাত গ্রাম আদালতের এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে বের হয়ে জেলার নিচে বিচার প্রশাসন বিকেন্দ্রায়ণের একটি সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। ১৯৮০ সালের পর সাত-আট বছর ধরে উপজেলা পর্যায়ে নিম্ন আদালত সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধান বিচারপতি, আইন মন্ত্রণালয়, সামগ্রিক অর্থে সরকার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারে। দেশের আইন কমিশন এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে পারে। উপজেলা পর্যায়ে প্রায় ৩৫টি সরকারি বিভাগ ও সংস্থা কাজ করে। সেখানে বিচার বিভাগের অনুপস্থিতি দেশের মানুষের মধ্যে বিচার বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। গ্রামাঞ্চলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি স্থায়ী রূপ পেয়ে গেছে। উপজেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগ সম্প্রসারণ করে এ বৈষম্য দূর করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে প্রথাগত সালিস প্রথাকে নতুন আঙ্গিকে পুনর্গঠিত করতে হবে। তা অবশ্যই গ্রাম আদালতের আঙ্গিকে নয়। তবে সেখানে উপজেলা আদালত ও গ্রামের সালিসব্যবস্থার একটা সংযোগ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে করা যায়। বিদ্যমান আইনে গ্রাম আদালতের যে এখতিয়ার, তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ আদালতে বেশির ভাগ মামলার নিষ্পত্তি সম্ভব হয় না। এগুলো তথাকথিত আদালতের বাইরে মীমাংসা হয়। অনেক সময় এসব মীমাংসায় প্রভাবশালী পক্ষ দুর্বল পক্ষের ওপর তাদের মতামত জোর করে চাপিয়ে দেয়। তাই বলে গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা বাড়াতে হবে, এই মতের সমর্থন করা যায় না। সুপারিশ হচ্ছে গ্রামপর্যায়ে শক্তিশালী সালিসব্যবস্থা বজায় রেখে উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারী জজ (ফৌজদারি ও দেওয়ানি) আদালত প্রতিষ্ঠা। প্রচলিত গ্রাম আদালত থেকে সুবিচার প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে জেলার নিচে নিম্ন আদালতের সম্প্রসারণ সময়ের দাবি।

তৃতীয় গুচ্ছ

সরকারের জন্য কিছু নীতি সুপারিশ

সরকারি ব্যয় সংকোচননীতি প্রসঙ্গে

মিতব্যয়িতা একটি বিরল মানবীয় গুণ। পৃথিবীর প্রায় সকল সফল মানুষের মধ্যে পরিমিতিবোধ ও মিতব্যয় একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে দেখা যায়। সংকটকালে বাধ্য হয়েই সবাইকে ব্যয় সংকোচন করতে হয়। এটি ব্যক্তিগত সংকট বা সামষ্টিক জাতীয় সংকট দুইই হতে পারে। বর্তমানে (২০২৩) বিশ্বসমাজ নানামুখী আর্থিক ও জীবনযাত্রার সংকট মোকাবিলা করছে। আমরা বাংলাদেশেও নানামুখী সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সংকটের কারণ আন্তর্জাতিক ও দেশিয় দুই রকমই আছে। এতদিন সংকটের বিষয়টিই স্বীকার করা হতো না। দেশে সব সময় 'উন্নয়নের জোয়ারের' কথাই বলা হতো। জোয়ারের পর প্রাকৃতিক নিয়মে ভাটার টান লাগে। সে ভাটার টান কত তীব্র ও অসহনীয় হতে পারে তা সমাজের উপরতলার মানুষ না বুঝলেও নিচতলার মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। অনেকে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ছে। সরকারও ব্যয় সংকোচনের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

সরকার জ্বালানি তেল ও এলএনজি গ্যাসের আমদানি সংকট, ভারসাম্যহীন ডলারের বিনিময় মূল্যমান, ব্যাংক খাতের সম্পদ হ্রাস, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, পুঁজির দেশান্তর, প্রবাসী আয় প্রবাহ কমে যাওয়াসহ ম্যাক্রো অর্থনীতির নানামুখী সমস্যা ও সংকট মোকাবিলা করছেন। এসব সমস্যা মোকাবিলার অংশ হিসেবে অনেকক্ষেত্রে দেশি সম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে সাশ্রয়ী হওয়ার নানা নীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন—জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় ব্যাপক লোডশেডিং চলছে। কম প্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ করা হয়েছে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ৮টার পর দোকানপাট বন্ধ রাখা হচ্ছে। সব উপদেশ নির্দেশ ও পরামর্শ সর্বত্র সমানভাবে পালিত হচ্ছে তা বলা যাবে না। কিন্তু এ পদক্ষেপগুলো মানুষ প্রত্যাখান করেনি। তবে যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য সরকারি অফিস ও স্থাপনাসমূহে প্রথমে নযির স্থাপন হওয়া প্রয়োজন। তখন জনগণের উপরও নৈতিক চাপ আরও বাড়বে।

সরকারি মন্ত্রী, এমপি, সামরিক-বেসামরিক আমলারা বড় গাড়ি, গাড়ি-বাড়ির এসি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছেন, মানুষ সেটি দেখতে চায়। পত্রিকান্তরে জানা গেল কোনো এক সরকারি গাড়িতে পার্ক করা অবস্থায় এসি চলছে। অর্থাৎ সরকারি গাড়ির চালক

অবসরে আরাম করছেন। সরকার যদি সত্যিকার অর্থে ব্যয় সংকোচন ও জ্বালানি সাশ্রয়ে আগ্রহী হন তাহলে প্রতিটি দপ্তরের গাড়ির জ্বালানি ও প্রতিমাসের বিদ্যুৎ বিলের হিসাব মনিটর করুন। আগের তুলনায় এই দুই খাতে ব্যয় সংকোচন নীতি কতটুকু কার্যকর হলো। এ ব্যাপারে সরকারি দপ্তরগুলোর একটি 'রাজনীতি' আছে। তারা ধরে নিবে ব্যয় সংকোচনের কারণে যদি তিন মাস জ্বালানির ব্যবহার ২৫-৩০ শতাংশ কমে যায়, পরবর্তী বছরের বাজেটে ঐ পরিমাণ অর্থ কমে যেতে পারে। এটি আমলা সংগঠনের বাজেট বরাদ্দের রাজনৈতিক অর্থনীতি। তাই হয়ত অনেকক্ষেত্রে তারা দ্বিধান্বিত।

এসব সত্ত্বেও সরকারের দিক থেকে জ্বালানি সাশ্রয়ের একটি বড় ব্যয় সংকোচনী কার্যক্রম নিতেই হবে। তেল-জ্বালানি সাশ্রয়ের এ ব্যয় সংকোচন একটি সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়ে উপনীত করার সর্বাত্মক প্রাচেষ্টা নেওয়া উচিত। গত দশ বছরে সবগুলো সরকারি কার্যালয় ও দপ্তরের ভবন, পরিসর, অফিসের সাজ-সজ্জার অনেক উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে যানবাহন ও এসির ব্যবহার। বেতন বৃদ্ধির কথা নাইবা বলা হলো। কিন্তু সেবার মান কতটুকু বেড়েছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। সবকিছুর সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জনপ্রশাসনের রাজস্ব ব্যয়। এখানে রাশ টানার প্রয়োজন আছে। মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, কর্পোরেশন সর্বত্র যানবাহন ও জনবলের হিসাব করে বাস-মাইক্রো বাসে চলাচল বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সরকারি গাড়ির ব্যক্তিগত ব্যবহার সীমিত করার কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী ও সচিব ছাড়া বাকি সবাই কেন মাইক্রোবাসে অফিসে আসা যাওয়া করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে ধন্যবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তারা বিনা দ্বিধায় বাস ও মাইক্রো বাসেই যাতায়াত করেন। মাঠ প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মনীতি মূল্যায়ন করে কঠোরভাবে ব্যয় সংকোচন নীতি বলবৎ করতে হবে। সংকট অনেক ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখায়। এ সংকটও আমাদের একটি ব্যয়-সাশ্রয়ী প্রশাসনিক নিয়ম নীতি গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। এরশাদ আমলে অফিসে স্যুট-টাই পরার নিয়ম করা হয়। চৈত্রের দুপুরে স্যুট পরলে অসহ্য গরমে কাজ করা মুস্কিল। তাই লাগল এসি, অফিস কক্ষ হলো এয়ার টাইট। অফিসকক্ষগুলো বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী করুন। ডিসেম্বর-জানুয়ারি দুই মাস ছাড়া বাকি সময় এদেশে স্যুট পরার বিধান রহিত করুন। আবহাওয়া ও দেশের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শোভন পোশাক পরার স্বাধীনতা সবার থাকুক। যে সব চাকুরিতে 'ইউনিফরম' পরার বাধ্যবাধকতা নেই তাদের পছন্দ অনুযায়ী শোভন পোশাক পরার অধিকার আছে।

যানবাহনের জ্বালানির ব্যবহার, সার্বিক ব্যয় সংকোচন ও সভ্য অনাড়ম্বর জীবনযাপনের একটি সামাজিক আন্দোলনে সূচিত হউক। আমাদের মন্ত্রী, এমপি, উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সূচনা হতে পারে। সব কিছু সরকারি নির্দেশে হতে হবে এমন নয়। স্বেচ্ছায় আমাদের সমাজের গণ্যমান্যরা যাদের আমরা

মাননীয়, মহামান্য ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করি তারা সপ্তাহে একদিন, দুই দিন বা সর্বোচ্চ তিন দিন হেঁটে, সাইকেলে বা রিকশায় নিজ নিজ দপ্তরে যেতে পারেন কি-না, দেখুন। আমাদের দেশের সকল মাননীয় মেয়রগণ, জেলা পরিষদের প্রশাসকগণ শুরু করুন না। দেখা যাবে সারা দেশের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা জজ, ডিসি, এসপিসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ স্বেচ্ছায় তা করছেন। জনগণ যারা বাস, টেম্পো প্রভৃতিতে যাতায়াত করেন ফুটপাত দখল মুক্ত হলে তারা অনায়াসে হাঁটবেন। সেজন্য সিটি মেয়রগণ ফুটপাতগুলো হাঁটার উপযোগী করে দিন। সেনা নিবাসের অভ্যন্তরে সাইকেল চালানোর সুযোগ অবারিত। পদস্থ সেনা অফিসারগণ এ কাজটি করলে দেশবাসী খুবই আনন্দিত হবে।

যদি সরকারি পদস্থ ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় এটি শুরু করেন, তারপরের মাস থেকে ঢাকাসহ দেশের সকল বড় শহরে যেখানে সিটি কর্পোরেশন আছে ঐ সব শহরে সপ্তাহে তিনদিন সকল ধরনের প্রাইভেট কার চলাচল বন্ধ রাখুন। দেশের বায়ুদূষণ কমবে, জ্বালানি সাশ্রয় হবে, বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে, সরকারি ব্যয় হ্রাস পাবে। মানুষ স্বাস্থ্য সচেতন হবে। কমবে বায়ুদূষণ এবং বৃদ্ধি পাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া জাতি হিসেবে আমাদের সুনাম। সাথে সাথে শহরে মাঝারি পাল্লার যাতায়াতের জন্য ভালো বাস ও ট্যাক্সি সার্ভিস বাড়াতে হবে। শহরের সর্বত্র হাঁটা নিরাপদ করতে হবে।

প্রতিটি অফিসে 'হাঁটা হাঁটি' গ্রুপ গঠিত হউক। যারা একে অপরকে ডেকে এক সাথে পদব্রজে অফিস যাওয়া আসা করবেন। দুজনের রিকশা গ্রুপ হতে পারে। হতে পারে সাইক্লিস্ট গ্রুপ। অফিস ফিরতি সময়ে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার পথ হাঁটা যেতে পারে। আমাদের নাগরিক সমাজ এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। বিশেষ করে শহরের স্কুলগুলোতে ফুটপাত ধরে দলবদ্ধভাবে হেঁটে বাসায় যাওয়া আসা করার অভ্যাসকে উৎসাহিত করার জন্য স্কুল থেকে গ্রুপ করে আভিভাবকদের উৎসাহিত করতে পারেন।

ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়া ও মিতব্যয়িতা একটি বিরল মানবিক গুণ। তাছাড়া দলবদ্ধভাবে সহজ সরল ও পরিশ্রমী হওয়ার অভ্যাসটি সমাজ-সংস্কৃতি ও যাপিত-জীবনের অংশ হয়ে উঠুক এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বত্র-এ বিষয় ব্যাপকভাবে চর্চিত হউক।

আউট সোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আড়ালে শোষণ-বঞ্চনা

আউট সোর্সিং (Out Sourcing) ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ আজকাল জন প্রশাসনে একটি জনপ্রিয় ধারণা ও চর্চা। উপরের পর্যায়ের সব কর্মকর্তাদের চাকুরি বেতন, ভাতা, উপরি, পেনশন সব ঠিক থাকলেও শুধু নিম্নতম পর্যায়ে কর্মী নিয়োগ বন্ধ রেখে তা আউট সোর্স করা হয়। তাতে সরকারের অর্থ সাশ্রয় হয় এবং দক্ষতা বাড়ে বলে বড় একটি প্রচার আছে। অর্থ্যাৎ কোনো কোনো বিশেষ সেবার জন্য প্রাইভেট কোম্পানি থেকে চুক্তিতে সেবা কর্মী নেওয়া হয়। তার জন্য বেতন বাদে কোনো ভাতা, ইন্সুরেন্স পেনশান কিছু দিতে হয় না। থাকে না কোনো প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব। কর্মী সরবরাহকারী কোম্পানি সরকার বা চুক্তিবদ্ধ সংস্থা থেকে চুক্তিমত টাকা পায় এবং তারাই ঐ কর্মীদের বেতন দিয়ে থাকে। অনেক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এ পদ্ধতিতে আজকাল সেবা গ্রহণ করে।

এ ব্যবস্থার অন্তরালে একটি অমানবিক শোষণ এবং শ্রম আইন ভঙ্গের মহোৎসব চলছে। ধরুন, অফিস পাহারা দেওয়ার জন্য সিকিউরিটি কোম্পানির সাথে সরকারি বা বেসরকারি কোনো সংস্থা একটি চুক্তি করল। চুক্তি অনুযায়ী সেবা গ্রহণকারী সংস্থা সিকিউরিটি কোম্পানিকে কর্মীর বেতন-ভাতা বাবত অর্থ পরিশোধ করে থাকে। সমস্যা হচ্ছে সেবা কর্মীরা সে চুক্তি অনুযায়ী মধ্যস্বত্বভোগী সংস্থার কাছ সঠিক পারিশ্রমিক পায় না। ধরা যাক — ৩০ জন গার্ডের প্রতি জনের জন্য প্রতি মাসে ২০ হাজার করে দুটি উৎসব ভাতাসহ বছরে ১৪ মাসের বেতন বাবত কেম্পানিকে সেবা গ্রহণকারী সংস্থা বিল দিচ্ছে ৮৪ লাখ টাকা। কিন্তু কর্মীরা পায় মাসে ৮০০০ টাকা মাত্র। আবার আপনি ৮ ঘণ্টার সিফট ধরে প্রতি সিফটে ১০ জন করে তিন সিফট-এর জন্য ৩০ জনের চুক্তি ছিল। প্রাইভেট কোম্পানির প্রতি সিফট-এ ৮ ঘণ্টা নয়, বরং ১২ ঘণ্টার করে দিয়ে সবার অজান্তে ১০ জন গায়েব করে দিয়েছে। মূল ১৪ মাসের বেতন থেকে প্রতিমাসে জনপ্রতি ১২০০০ টাকা মেরে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে ৮৪ লাখ টাকার বিল থেকে ৫৬ লাখ টাকা কোম্পানি আত্মসাৎ করে, শুধু ২৯ লাখ টাকা কর্মীদের দিয়ে থাকে। বিষয়টি বুঝানোর জন্য একটি কল্পিত উদাহরণ দিলাম। যাদের সন্দেহ হবে তারা বিষযটির বাস্তব অবস্থা খতিয়ে দেখুন।

এভাবে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, দারোয়ান, মালি, ড্রাইভার প্রভৃতি নিম্নস্তরের সেবা কর্মীদের বিষয়ে একটি অমানবিক শোষণ প্রক্রিয়াকে সর্বত্র প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। কর্মীদের সঠিকভাবে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না, যাতে তারা শ্রম আইনে মামলা করতে না পারে। তাদের কর্মঘণ্টা, ছুটি, উৎসব ভাতা ইত্যাদি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু কোনো উচ্চপদে যখন কোনো চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হয় সেখানে বেতন ভাতা নিয়মিত চাকুরির কয়েকগুণ বেশি দেওয়া হয়।

এজেন্সিকে ২৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ দিয়ে বেতন-ভাতার টাকাটা পুরোপুরি যাতে শ্রমিক পায় তার পাকা বন্দোবস্ত করে আউটসোর্স ব্যবস্থাকে আইনানুগ ও মানবিক করা প্রয়োজন। কোনো সেবা সহায়তা দানকারী সংস্থা কর্মীর বেতন থেকে টাকা কর্তন করে যাতে অতি মুনাফা না করতে পারে এ ব্যাপারে সরকারের শ্রম দপ্তরের একটা নযরদারি থাকতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বীমা ব্যবস্থা এবং তাদের জন্য শ্রম আইনের আওতায় প্রতিকার পাওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখার যাবতীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত।

উপরে উল্লেখ করা বিষযটি দেশে নিম্ন পর্যায়ের সেবা কর্মীদের প্রতি যেমন হচ্ছে, একই বিষয়টি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ের পেশাদার বিশেষজ্ঞগণের সাথেও হচ্ছে। বিষয়টি সরকার এবং দেশে নানা প্রকল্পের অর্থায়নকারী সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, ইউনিসেফ, ইউকে এইড প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তেমনিভাবে সরকারের ক্লাইন্ট সংস্থা এলজিইডি, ডিপিএইচই, পানি উন্নয়ন বোর্ড, গৃহায়ন অধিদপ্তর প্রভৃতির দেখার বিষয়। এসব সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিশেষায়িত পেশাগত সেবা গ্রহণ বিশেষত কনসালটেন্সি এবং প্রকল্পের নানা লজিস্টিক সেবার জন্য তথাকথিত এক ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপদেষ্টা ফার্ম বা সেবা প্রদানকারী ফার্ম নিয়োগ করে থাকে। এই ফার্মগুলোও একইভাবে পেশাদার উপদেষ্টা থেকে শুরু করে ড্রাইভার, অফিস সহকারী সবার জন্য মূল চুক্তিতে ধার্যকৃত বেতন দেয় না। তারা মূল অর্থায়নকারী সংস্থার চুক্তির বাইরে প্রতিটি কর্মীর সাথে পৃথক চুক্তি করে। যা খুবই গোপনীয় থাকে। এমনকি একই কাজের জন্য পাঁচজন থাকলে পাচঁজনের পাঁচ ধরনের বেতন হতে পারে। এভাবে এদেশের কিছু কনসালটিং ফার্ম বিদেশি ফার্মের যোগসাজসে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের প্রকল্পের নির্ধারিত বেতনের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে থাকে। অথচ কম শিক্ষাগত-পেশাগত যোগ্যতা নিয়েও অনেক বিদেশি উপদেষ্টাগণ দেশিদের চেয়ে পাচঁগুণ বেশি বেতন গ্রহণ করেন। বিদেশিদের অধিক বেতন গ্রহণ একটি ভিন্ন বিষয়, কিন্তু দেশি-বিদেশি কিছু উপদেষ্টা ফার্ম অত্যন্ত অস্বচ্ছ পন্থায় দেশি পেশাদার ও লজিস্টিক কর্মীদের ধার্যকৃত মূল বেতন না দিয়ে ঠকিয়ে চলেছে। কনসাল্টিং ফার্মগুলোর নিজস্ব কোনো বিশেষজ্ঞ থাকে না। প্রকল্পের দরপত্রের বিড করার সময় জানিয়ে বা না জানিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে তা জমা দেয়। যখন বিড জিতে যায় তখন মূল চুক্তি এড়িয়ে পৃথকভাবে নিয়োগগুলো দিয়ে থাকে তখনই বেতন কম দেওয়ার অস্বচ্ছ কৌশলটি অবলম্বন করে। অর্থায়নকারী সংস্থা বা সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এসব জেনেও না জানার ভান করে। অথবা এখান থেকে তারাও কিছু অন্যায্য সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে উপদেষ্টা সেবার গুণগত মান অটুট ও বৃদ্ধি করতে হলে এ অস্বচ্ছতা ও অসাধুতা থেকে উপদেষ্টা সেবাকে মুক্ত করতে হবে। দেশের কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যদি তাদের জন্য নির্ধারিত উচ্চ বেতনটা পায় তাতে তো কারও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য কিছু নিরীহ পেশাজীবী

বঞ্চিত হবেন সেটি কোনোভাবে কাম্য হতে পারে না।

কোনো এনজিওর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা অন্যভাবে ঘটানো হয়। বিদেশি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন নানা প্রকল্পে যে কর্মী নিয়োগ করা হয় তাদের জন্য প্রকল্পের ধার্য্যকৃত বেতন না দিয়ে কম বেতন দিয়ে বেশি বেতনের বিলে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। বাড়ি ভাড়া এবং কেনাকাটায় দুর্নীতি করা হয়। কর্মীদের চুক্তিবদ্ধ বেতন না দেওয়ার বিষয়টি মূল অর্থায়নকারী সংস্থার দেখা উচিত।

দেশে লোকবল যোগানদার কিছু ভুঁইফোড় সংস্থার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি আজকাল একটি নতুন 'আদম ব্যবসা' হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে কাজ করছে। এখানে একটি বড় ধরনের অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি পাকাপোক্তভাবে আসন করে নিচ্ছে। সরকারের আকার-আয়তন ছোট করার কৌশল হিসেবে এক সময় নানা উন্নয়ন সহযোগীরা এ আউট সোর্সিং এবং চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থার অপব্যবহার এবং তার মাধ্যমে একপক্ষের মধ্যযুগীয় মুনাফাবৃত্তি এবং অপর পক্ষের পেটে লাথি দেওয়ার বিষয়টি নীরবে হজম করা যায় না।

প্রশাসন ও রাজনীতির বরিশাল উপাখ্যান

সরকারি কাজকর্মে বাধাদান একটি গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ। সরকারি কর্মকাণ্ড সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করেন মূলত সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা। তাই সে অর্থে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বাধাদানও একইভাবে অপরাধ হিসেবে গন্য। তবে রাতের বেলা কোনো সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে সংঘবদ্ধভাবে চড়াও হওয়া, তাও আবার রাজনৈতিক পরিচয়ের ব্যানারে–এটা কত বড় অসভ্যতা, কতটা ফৌজদারি অপরাধ তার সীমা নির্ণয় করা দুরূহ। সরকারি অফিস ও কর্মকর্তার উপর হামলার বা কাজে বাধাদানের নানা বিচিত্র রকমের ইতিহাস এ দেশে আছে, হিংসাশ্রয়ী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তার অন্যতম। 'সত্যাগ্রহ' ধর্ণা, হরতাল, ধর্মঘট, বন্ধ ইত্যাদিও প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সরকারি কাজে বাঁধা দেওয়ার একটি ঐতিহ্য। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে জায়গা জমি, হাট-বাজার, ব্যবসা, টেন্ডার ইত্যাদি দখল-অপদখল বা কোনো বেআইনী স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে বাধা দেওয়ার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এ দেশে বিরল নয়। কখনও কখনও পুলিশের হেফাজত থেকে আসামি ছিনতাইও হয়েছে। তবে ক্ষমতাসীন দলের 'জনপ্রতিনিধি'র ইশারা–ইঙ্গিতে রাতের বেলা কোনো সরকারি কর্মকর্তার বাসভবন আক্রমণের নযির সম্ভবত এটিই প্রথম।

আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরে প্রশাসনের অধিকর্তাদের শারীরিকভাবে নাজেহাল ও অপদস্থ করার ঘটনা বাড়ছে। দুর্বিনীত কোনো কর্মকর্তাকে নাজেহালের অংশ হিসেবে বদলি, কম গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন, গালাগাল ইত্যাদি তো আছেই। আজকাল সরাসরি জীবনের উপর হামলার ঘটনাও ঘটছে, যা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। ইতিমধ্যে সড়ক ও জনপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডির প্রকৌশলীদের নানাভাবে নাজেহালের অনেক ঘটনা দেখা গেছে। বেশ কিছুদিন ধরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা ইউএনওদের উপর আক্রমণ, নানারকম চাপ প্রয়োগ ও হয়রানির বিষয় জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। এ প্রবণতাটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এ ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা গেলেও প্রবণতাটা গভীর ভাবে উদ্বেগজনক।

সম্প্রতি (১৮ আগস্ট ২০২১) বরিশাল সদরের ইউএনও-র বাসভবনে রাতের বেলা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-এর নেতা-কর্মী, বরিশাল সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর, সিটি করপোরেশনের কর্মীগণের সংঘবদ্ধ হামলায় ইউএনও কর্তৃক দুটি মামলা দায়ের এবং একুশজন নেতা-কর্মী আটক হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মামলায় ররিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়রকে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। ১৫ আগস্টের জাতীয় শোক দিবস-এর পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার সূত্রপাত বলে জানা গেছে। বেশ কিছুদিন আগে বরগুণার কোনো এক উপজেলার ইউএনওকে নিয়ে স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতা পাঁচকোটি টাকার মানহানির মামলা করে এবং এ মামলাকে আমলে নিয়ে

বরিশালের সিএমএম আদালত ওই ইউএনও-র বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করে। ইউএনও আদালতে আত্মসমর্পণ করে। পরে মামলা প্রত্যাহার হয়। সাজু নামের ঐ মামলাকারী দলীয় নেতাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। ইউএনওকে অযথা হয়রানির জন্য ছয় পুলিশ সদস্য প্রত্যাহৃত এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে বরিশালের সিএমএম জনাব মো. আলি হোসেন অন্যত্র বদলি হন। মামলায় অভিযোগ ছিল ইউএনও-র ছাপানো দাওয়াত পত্রে 'বঙ্গবন্ধুর বিকৃত ছবি' ব্যবহার। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশান ও পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশান পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে বক্তব্য প্রদান করে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় সংসদে 'আমলা' ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের তুলনামূলক ভূমিকা ও অবস্থান নিয়ে জননেতা তোফায়েল আহমদসহ কয়কজন সমালোচনামুখর হন এবং ঐ সময়ে ভোলার এক ইউএনওকে বদলির ব্যাপারে বিভাগীয় কমিশনার ও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে তদবির শুরু হয় বলে পত্র-পত্রিকায় খবর বের হয়। এক বছর আগে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার ইউএনও ওয়াহিদা খানমকে রাতে সরকারি বাসভবনে মারাত্মকভাবে জখম করার চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে (সেপ্টেম্বর ২০২০)। কয়েক বছর আগে (এপ্রিল ২০১৭) ভোলার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফরিদুল আলম বোরহানউদ্দিন উপজেলার ভারপ্রাপ্ত ইউএনও এবং ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা দুইজনের বিরুদ্ধে একজন রিলিফ চোরকে পালাতে সাহায্য করার অভিযোগ এনে সুয়োমুটো মামলা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুজিববর্ষের উপহারের ঘরের নির্মাণ দুর্নীতির দায়ে প্রায় চার জন ইউএনও অভিযুক্ত হন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে গরিবদেরে ঘরগুলো হস্তান্তরের আগে পরে ভেঙে পড়া বা ফাটল ধরার ঘটনা দেশে উপজেলা প্রশাসনের বড় একটি কলঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এসব ঘটনা ও রটনা দেশে মাঠ প্রশাসনের অস্থিরতার কিছু নমূনা।

বরিশালের ঘটনাটি এখন দেশের সর্বাধিক আলোচিত একটি বিষয়। শোনা যায়, পক্ষে-বিপক্ষে মোট চারটি মামলা হয়েছে। এক পক্ষে (ইউএনও) স্বনামে ৪৪ ও নামহীনসহ সর্বমোট ৫০০ জন অভিযুক্ত এবং ২১ জন ইতিমধ্যে আটক হয়েছে। অপর পক্ষে সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর ও কর্মকর্তার নালিশি মামলায় ইউএনও, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, আনসার ও পুলিশসহ প্রায় ৪০ জন আসামি। এ মামলা সিআইডি তদন্ত করছে। বিসিএস প্রশাসন অ্যাসোসিয়েশান এ নিয়ে কড়া বিবৃতি দিয়েছে। তিন জন মন্ত্রী (সর্বজনাব তাজুল ইসলাম, ড. হাসান মাহমুদ ও জাহিদ মুরাদ গণমাধ্যমে কথা বলেছেন (২২ আগস্ট ২০২১)। এরও আগে জনাব ওবায়দুল কাদের আইন অনুয়ায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন। আর এ তিন মন্ত্রী ভুল বুঝাবুঝি-র ইঙ্গিত করলেন এবং শীঘ্রই তার 'নিরসন' হবে বলেও আশা প্রকাশ করলেন।

দুপক্ষে চারটি মামলা। বিচারাধীন বিষয়ে বেশি কিছু বলা সমীচিন নয়। মামলাগুলো স্বাভাবিক নিয়মে শেষ হবে বা চলবে সেটি মনে প্রাণে চাই। তবে ভরসা খুব একটা

নেই। কারণ বরিশালের এই ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তাও আবার ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরের। শেষ পর্যন্ত যদি উভয় পক্ষের চারটি মামলাই প্রত্যাহার বা গতিহীন হয়ে যায়, আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। প্রশ্ন থেকে যাবে এ সমাজ, এ জনপদে ক্ষমতার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা এক শ্রেণির দুর্বৃত্ত ও অপরাধী চক্র দেশটাকে কোনো খাদে নিক্ষেপ করছে! সিটি করপোরেশন, তার মেয়র এবং কাউন্সিলরগণ 'জনপ্রতিনিধি'। তাদের কার্যক্ষেত্র সিটি করপোরেশন চৌহদ্দির মধ্যে নাগরিকদের 'মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস' প্রদান তাদের মূল কাজ। জনপ্রতিনিধি হলেই 'ধর্মের ষাঁড়' হয়ে যে কোনো খেতে মুখ দেওয়া বা যে কোনো জায়গায় শিং চালানো যায় না। কোনো জনপ্রতিনিধিই আইনের উর্ধ্বে নন। আর প্রশাসনের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন না করাই শ্রেয়। দলীয় কর্মসূচির তো প্রশ্নই আসে না। বলবেন, জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড তথা জাতীয় শোক দিবস তো জাতীয় কর্মসূচি। এই কর্মসুচি রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা , সাধারণ জনগণ সবাইকে নিয়ে তো পালন করা যায়। তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এ জাতীয় কার্যক্রমেও যদি কোনো না কোনো স্থানীয় নেতা নেত্রীর পেশী সঞ্চালনের অবকাশ সৃষ্টি হয়, সেখানে সতর্কতা আবশ্যক। এখানে যে ঘটনাটি বা দুর্ঘটনাটি ঘটানো হলো তার মূলে হলো 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রাণ যাচ্ছে উলু খাগড়ার'। প্রশাসন এবং কিছু অতি উৎসাহী জনতা-এর শিকার। বড় নেতারা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে বহাল থাকবেন। ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, প্রশাসনের নিরপেক্ষতার নীতি ও নৈতিক শক্তি।

আইনের শাসন থাকলে যা হবার, তা হচ্ছে, হুকুমের আসামীসহ রাতে আক্রমণকারি সকলের যথোপযুক্ত বিচার এবং শহরের ময়লা-আবর্জনা অপসারণ না করার জন্য করপোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়রসহ সকল নির্বাহীগণের সাজা। অবশ্য বরিশালের নাগরিকদের পক্ষ থেকে করপোরেশনের সেবা বন্ধের বিয়য়ে কোনো মামলা হয়নি। নদী ও সড়ক পথ বন্ধের কোনো প্রতিকারও কেউ চাননি। এ দেশে রাম-শ্যাম যদু-মধুরা যখন তখন কোনো সম্পাদক, সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে হয়রানির উদ্দেশ্যে মামলা করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা যখন যাকে খুশি অবাঞ্ছিত ঘোষণা বা তালাবদ্ধ করছে। কেউ আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে প্রতিপক্ষ শিকার করছে। কেউ সরাসরি ফ্যাসিবাদি কায়দায় মানুষের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে এ সবই গর্হিত কাজ। প্রশাসনের কর্মকর্তদের নিজের পেশাগত কারণে নিরপেক্ষ থাকার এবং রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত রেখে নৈতিক মনোবল উচু রাখতে পারলে আখেরে দেশের ও দশেরই লাভ।

দুর্নীতির দুষ্টচক্র থেকে বের হবার উপায় কী?

সম্প্রতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি আইনজীবীদের এক অনুষ্ঠানে বলেন, রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতি জনগণের আস্থা দৃঢ় করতে হলে দুর্নীতির সামান্যতম সংশ্রব থেকে সবাইকে দুরে থাকতে হবে। তিনি বলেছেন — 'দুর্নীতি এমন একটি ক্যানসার, যা গণতন্ত্রকে নষ্ট করে, দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়, জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে, জন্ম দেয় ক্রোধের' (*প্রথম আলো*, ২৮ নভেম্বর ২০২২)। মাননীয় প্রধান বিচারপতির এ বক্তব্য আদালতের রায় নয়। তবে দেশ জাতি ও সমাজের সবার প্রতি অতি জরুরি একটি সতর্ক বার্তা, একটি উদাত্ত আহ্বান ও গভীর সমাজ পর্যবেক্ষণ। এ আহ্বান সর্বজনীনভাবে সরকারের সকল অঙ্গ আইন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ সবাইকে স্পর্শ করেছে।

দুর্নীতি ও দুদক : বৈশ্বিক ও জাতীয় চিত্র

দুর্নীতি মানবীয় বিচ্যুতির এমন একটি কৃষ্ণগহ্বর যা আইনের দৃষ্টিতে চরম অপরাধ, নৈতিকভাবে পরিত্যাজ্য, সামাজিকভাবে নিন্দনীয় এবং সার্বিকভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সমূহ ক্ষতিকর। কিন্তু দুর্নীতির দুষ্টচক্রে জড়িত সবার জন্য এটি একটি পরম লাভজনক কর্ম, যদি তারা এ কাজের লাভালাভ বিনা প্রতিকারে উপভোগ করতে পারে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে প্রতিকারবিহীন অপ্রতিরোধ্য একটি দুর্নীতিপ্রবণ দেশ ও সমাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অনেক তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ পাশ হয় এবং বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে চেয়ারম্যান করে প্রথম কমিশন গঠিত হয়। তাঁরা প্রায় নিষ্ক্রিয় থেকেই কর্মকাল শেষ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জেনারেল হাসান মশউদ চৌধুরীর আমলে ঘুমন্ত সিংহ জেগে ওঠে এবং দুদকের অতি সক্রিয়তায় চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গলি-ঘুপচিতে অনেক মালিকানাবিহীন গাড়ি পরিত্যাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বড় দুই রাজনৈতিক দলের প্রধান দুই নেত্রীসহ শত শত নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা ও তাদের গ্রেফতার হতে দেখা যায়। গ্রেফতারকৃতদের অনেকে অনেক রকমের বয়ান দেন। অনেকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যান এবং অনেকে প্রায় খাটিয়ায় শুয়ে চিকিৎসার্থে বিদেশ গমন করেন। ২০০৯-এর নির্বাচনের পর সে 'আতঙ্ককালে'র অবসান ঘটে। নবগঠিত সরকার প্রায় ৭ হাজার মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে। আবার অনেকের মামলা চালু থাকে এবং নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত কিছু মামলায় সাজাও হয়। এখানে রাজনীতির পট পরিবর্তনের সাথে দুর্নীতি দমন ও দুদকের কার্যকারিতার একটি গভীর যোগসূত্র পাওয়া যায়।

বিভিন্ন চেয়ারম্যানের সময় দুদক নানা অভিধায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। গোলাম রহমানের

সময় 'নখ-দাঁত' ও 'মেরুদণ্ড', ইকবাল মাহমুদের সময় 'দায়মুক্তি', তাছাড়া সর্বসময়ে 'রাঘব বোয়াল ও চুনোপুঁটি' প্রসঙ্গ জোরে সোরে উঠতে থাকে। এখন চেয়ারম্যান বা কমিশনারদের আর জনসম্মুখে কথা বলতে দেখা যায় না। কথা যা বলার তা একাই দুদকের আইন উপদেষ্টারাই বলেন। টিআই-এর বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের যে নম্বর প্রাপ্তি তাতে বড় ধরনের অগ্রগতি নেই। ২০০০/২০০১ সনে ছিল দশের (১০) মধ্যে ১.১। তা ক্রমাগত একটু একটু করে বাড়তে থাকে এবং ২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ২ এ স্থির হয়। ২০১০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ২.৬ উপনীত হয়েছে কিন্তু ১৮০ দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান এখনও ১৪৭। প্রথম স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ড ও ডেনমার্কের স্কোর ৮.৮-৯.৬-এর মধ্যে ওঠানামা করছে।

জাতীয়ভাবে দুর্নীতির উন্নতি অবনতির কোনো নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন নেই। টিআইবি (বাংলাদেশ) কিছু বাছাইকৃত গবেষণা করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর তা প্রত্যাখান করে থাকে। একবার শুধু এলজিইডিকে দেখেছিলাম তারা টিআইবির সাথে বৈঠক করে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিলেন। আন্তর্জাতিভাবে আমরা আমাদের অবস্থানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করতে পারিনি। এশিয়ার এ অঞ্চলে আমরা শুধুমাত্র ধারাবাহিকভাবে আফগানিস্তানের উপরে অবস্থান করি।

আদালতের কড়া বার্তা

দুদকেরই সাবেক এক কমিশনার এখন ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতা। তাহলে কমিশনে থাকতে উনি বা ওনারা কী করতেন তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ইসলামি ব্যাংকের কেলেঙ্কারির নতুন তথ্য আসার পর দেখা যায় এখানেও দুদকের এক সাবেকের অধিষ্ঠান। তাহলে দুদকের প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। মাননীয় বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ যে রায় দিয়েছে তা দুদকের প্রতি কড়া বার্তাই বটে (*প্রথম আলো*, ০১ ডিসেম্বর '২২)। তিন মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে আদালত অবমাননার পাল্টা মামলা হতে পারে। মামলা তদন্তের আইনি সীমা ১২০ দিন, এরমধ্যে খুব কম তদন্তই শেষ হয়। অভিযুক্ত বা অভিযোগকারীরা তদবির করে তদন্ত কর্মকর্তা বদলায়। তদন্ত প্রতিবেদনও বদলিয়ে ফেলে। আমার জানা মতে একটি ক্ষুদ্র মামলা ২০০৭-৮ দায়ের হয়ে দুই বা তিন দফা তদন্ত হয়েছে। অভিযুক্তদের কয়েকজন গ্রেফতার হয়ে মাসাধিককাল জেলও খেটেছে। মামলার কিন্তু চুড়ান্ত শুনানি ও নিস্পত্তি ২০২২-এও হয়নি। যারা মামলাটি করেছেন তারা ঐটুকুই চেয়েছেন। অভিযুক্তদের হেনস্থা। তা তারা পেয়েছেন। দক্ষ, নিরপেক্ষ, পেশাদার ওই সময় মেনে তদন্ত সমাপ্ত এখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সে দক্ষতা ও ইচ্ছা দুদকের থাকতে হবে।

দুর্নীতির সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ

দুর্নীতির মামলা দায়ের, তদন্ত ও নিস্পত্তির সংখ্যা, দুর্নীতির প্রকৃতি, দুর্নীতিগ্রস্তের অবস্থান ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্যায়ণযোগ্য। ভূমি অফিসের তহশিলদার, নিম্ন আদালতের পেশকার এবং ট্রাফিক কনস্টেবলের ঘুষ গর্হিত দুর্নীতির অপরাধ। কিন্তু লক্ষকোটি টাকার ঋণ খেলাপি, ওভার ইনভয়েসিং-আন্ডার ইভয়েসিং-এর মাধমে বিদেশে মুদ্রা পাচার ও সরাসরি মানি লন্ডারিং কর্মকাণ্ডে জড়িত দুর্নীতিবাজরা সংখ্যা কম কিন্তু টাকার অংক বিশাল। টিআইবি একটি স্টাডি করে দেখতে পারেন '১৯৯০ থেকে ২০০১, ২০০১ থেকে ২০১০ ও ২০১০ থেকে ২০২০-এ ত্রিশ বছরের ব্যাংকের ঋণ খেলাপি, আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা তছরূপ, সরাসরি মানিলন্ডারিং এসব মেগা দুর্নীতির অর্থ মূল্য কত? একই সময়ে দুদকে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বা কত এবং তারা কারা? এ সময়ে নিঃসন্দেহে অর্থের পরিমাণে দুর্নীতির একটি উল্লম্ফন ঘটেছে। তারা মূলত ক্ষুদ্র একটি পরিচিত গোষ্ঠী, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে উঁচুতলার মানুষ।

শুধু দুদকই দুর্নীতির সর্বব্যাধি নিবারক নয়

দুর্নীতির টালমাটাল সাগরে ছোট্ট একটি তরি দুদক। সরকারের প্রত্যেকটি দপ্তর প্রধানের তার নিজ দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রয়েছে। মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ উদ্যোগে নিজ নিজ দপ্তরের দুর্নীতি কতটুকু হ্রাস করতে উদ্যোগী হয়েছে তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রতিবছর প্রতিটি দপ্তরে 'জাতীয় শুদ্ধাচার' পুরস্কার দেওয়া হয়, কিন্তু দুরাচারের তিরস্কার করা হয় না। দুদকের মতো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিচার বিভাগ ও পুলিশেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিচার বিভাগ মাঝে মাঝে সোচ্চার হলেও বাকিদের ভূমিকায় জাতি হতাশ।

উপসংহার—দুর্নীতি মূলত জড়িত সকল পক্ষের সুযোগ সুবিধার (win win situation) সম্মিলন। এখনে বহুজনের বহুবিদ প্রাপ্তি। ক্ষতি শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের। তাই সাধারণ মানুষকেই দুর্নীতি প্রতিরোধে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর মুখ খুলেছেন। সকল জনবান্ধব সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অনুরূপভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

উপরওয়ালাদের সুলুক সন্ধান

দেশের প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে অনেকগুলো শব্দ, ধারণা, প্রত্যয় ও বাক্য প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয়, যা অনেক সময় বাইরের লোকজন সহজে বুঝতে পারে না। ব্রিটিশপূর্ব ও ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনে বহুল ব্যবহৃত অনেক ফারসি শব্দ জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগে এখনও প্রচলিত আছে। তেমনি একটি শব্দ 'খাস কামরা' কিছুদিন আগে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। আলোড়নটা খাস কামরা শব্দ বা বাস্তব খাস কামরার অস্তিত্বের জন্য নয়, মূলত-এর অপব্যবহারের জন্য। তেমনি নাজির–নেজারত ডেপুটি কমিশনার অফিসের একটি অতি পরিচিত শব্দ। জেলা প্রশাসনের তেমনি একটি খুব পরিচিত শব্দ 'উমেদার'। মজার বিষয় হচ্ছে এটি ডিসি অফিসের কোনো অনুমোদিত পদ নয়। উমেদারগণ জেলা প্রশাসকের নানা দপ্তরে বিনা বেতনে খেটে যাওয়া নিম্ন শ্রেণির কর্মচারী, যারা ভবিষ্যতে চাকুরি পাওয়ার আশায় বছরের পর বছর বেগার খাটে। তারা মূলত বিভিন্ন মক্কেলদের উপরিজীবী। কোনো কোনো সময় কন্টিনজেন্সি থেকেও কিছু অর্থকড়ি পায়। তেমনি পুলিশের নানা পর্যায়েও এরকম কিছু পদ-পদবি বা অবৈতনিক কর্মচারী কাজ করে। নিয়মিত সদস্যদের অনেককেও বিশেষ পদবি বা পরিচয়ে চেনা যায়। বড়মিয়া, মেজো মিয়া, ছোট মিয়ারা বড় দারোগা, মেজো দারোগা ও ছোট দারোগা হিসেবে পরিচিত ছিল বা এখনও আছেন। সরকারি পদবি যথাক্রমে পরিদর্শক, উপ-পরিদর্শক ও সহকারি উপ-পরিদর্শক। প্রতিটি পুরোনো জেলায় একটি 'কোতোয়ালী থানা' আছে, এটি ব্রিটিশের ধারণ করা মোগল ঐতিহ্য। খোদ 'থানা' শব্দটাই ফারসি। রয়েছে 'মুন্সি', কোনো একজন কনেস্টবল যিনি পড়াশোনা জানেন এবং জনগণকে ডায়রি বা অভিযোগটা লিখে দেন। আর হাল আমলে সকল থানায় একজন 'ক্যাশিয়ার' থাকেন, তিনি প্রতিমাসে নানা জায়গা থেকে পাওনা আদায় করেন। একই রকমভাবে জেলখানায়ও হরেক রকমের পদ-পদবি এবং ব্যবহারিক শব্দ আছে, এরমধ্যে একটি হচ্ছে 'ফালতু'। আমাদের নেতারা যারা কিছুদিনের জন্য ওখানে মেহমান হয়েছেন তারা এসব ভালো বলতে পারেন। এভাবে বিচার বিভাগে মুন্সিখানা, মুন্সি, পেশকার, ঢোল-সহরত করে সমন জারি এমন অনেক শব্দ প্রচলিত। ভূমি প্রশাসনে ফারসি শব্দের ছড়াছড়ি। যেমন—খাজনা, কবলা, সাফ-কবলা, পরচা, খতিয়ান, কবুলিয়াত, আমমোক্তারনামা, নামজারি, নামখারিজ, তসদিক, কানুনগো ইত্যাদি। এমনকি নৌ-বন্দর এবং সমুদ্র বন্দরে এমন বিশেষ কিছু শব্দ আছে যা অন্যত্র ব্যবহার হয় না। যেমন—সারেং, সুকানি, খালাসি, টেন্ডল প্রভৃতি। এমনকি সড়ক পরিবহণেও কিছু মজার শব্দ আছে যেমন—আমরা অনেকে ব্যঙ্গ করে অনভিজাত বাসকে বলি 'মুড়ির টিন'; আবার বাস সহকারীরা আমাদের প্রাইভেট-কার যত দামি আর অভিজাতই হউক এগুলোকে বলে 'প্লাস্টিক'। এই লেখার উদ্দেশ্য প্রশাসনিক ও সামাজিক পরিভাষার ব্যবহার ও বিবর্তনের উপর গবেষণা নয়। এ বিষয়ে অন্য

কোনো সময় বিস্তরিত লেখা যাবে। সাম্প্রতিককালে একটি নতুন শব্দ প্রশাসনের সকল স্তরে সর্বত্র ঢালাওভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সে শব্দটির নানা দিক নিয়ে আজকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার ইচ্ছা হচ্ছে।

এই বিখ্যাত শব্দটি হচ্ছে 'উপরওয়ালা'। উপরের মর্জি, উপরের নির্দেশ, উপরের ইশারা ইত্যাদি নানাভাবে অজুহাতের একটি মোক্ষম অস্ত্র বা সত্যিকারের অপকর্ম রোধের বা অসহায়ত্ব বুঝাতে এই 'উপর' বিষয় বা শব্দটির ব্যবহার বার বার ঘুরেফিরে আসে। বড় কোনো অঘটন না হওয়া পর্যন্ত-এর মোজেজা খুব একটা বুঝা যায় না। সম্প্রতি ধৃত ও রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে জর্জরিত সাহেদ-সাবরিনা-আরিফুলের ঘটনা ও রটনার অন্যতম নেপথ্য নায়ক-নায়িকা হিসেবে 'উপরওয়ালা' প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসা সত্ত্বেও 'ভাসুরের নাম' মুখে আনতে নেই এমন একটা ভাব। এলাকায় তাণ্ডব চালায় কোনো এক ছিচকে মাস্তান। পুলিশকে বললে তারা বলেন, উপরের আশীর্বাদপুষ্ট, কিছু করার উপায় নেই। খাসজমি, পুকুর, জলাভূমি জবরদখল হলো ইউএনও এবং ডিসি সাহেবদের বললে প্রথম বলবেন, কই কেউ তো অভিযোগ করেনি! অভিযোগ করলে বলবেন, 'উপরে' বলেন। তাদের কিছু করার নেই। উপরের সমর্থন আছে। অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ে বললে তারাও 'উপর' অথবা 'উপরি' নির্দেশ করেন। ইউনিয়ন ও উপজেলার কোনো নিয়ম-অনিয়মের প্রসঙ্গ আসলে তারা ধানাই-পানাই করে যে 'উপর'-এর ইশারা করেন তার একটা হদিস কষ্টে উদ্ধার করা যায়, তবে কতটুকু নির্ভুল তা গবেষণা সাপেক্ষ। এ উপরটা যতটুকু বোঝা গেল এলাকার 'মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য' (এমপি)। কিন্তু ডিসি, এসপি, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এমনকি মন্ত্রণালয় যে 'উপর' দেখিয়ে দেন সেটা কোন্ 'উপর', কত উপরে? আবার তারা সবাই নিজেরা যখন স্বীয় বিবেচনায়, স্বহস্তে সই করে যা যা করেন তার সব কিছুই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে করেন বলে আবেগঘন ঘোষণা দিয়ে দেন। এ এক অদ্ভুত ধাঁধাঁ। জানা-অজানা, গোপন-প্রকাশ্য যা কিছু ঘটে, সবখানে উপর 'কেস্টা' বেটাই পিছনে বটে।

সম্প্রতি অবসরে যাওয়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল কালাম আজাদ মন্ত্রী-সচিবের যৌথ ফটো সেশনে অংশগ্রহণের মাধমে রিজেন্টের কোভিড পরীক্ষা বিষয়ক চুক্তিস্বাক্ষর করলেন। সাহেদ ও রিজেন্টের যাবতীয় জালিয়াতি ফাঁস হবার পর বললেন-এর পিছনে উপরের নির্দেশ ছিল। তা তিনি আবার লিখিতভাবেও জানালেন। তখন 'উপর' থেকেই কৈফিয়ৎ তলব হলো। অবশেষে অব্যাহতি। কিন্তু 'উপর'-এর সুলুক মিলল না। উপর সবসময়ই এক রকম অধরা, অ-দেখা ও অস্পর্শা। 'উপর' কী কোনো অশরীরী স্পিরিট বা আত্মা। আমার সাদাসিধে মত, এটি কঠিন, জড় বা বায়বীয় কোনো পদার্থ নয়, নয় কোনো অশরীরী স্পিরিটও নয়। 'উপর' সমসাময়িক সময়ের বিমূর্ত একটি প্রশাসনিক ধারণা। যা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি কূট সম্পর্ক জাল। যেখানে সবার সরব-নীরব সম্মতি থাকে। আখেরে সবার কিছু না কিছু প্রাপ্তি যোগ আছে।

গরিব অসহায় মানুষদের একটি সুনির্দিষ্ট 'উপর' এবং 'উপরওয়ালা' আছে। তারা সুখে দুঃখে উপরের দিকে হাত তুলে বা তাকায়। এটি একটি সেক্যুলার ধারণা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান সবাই উপর থেকেই কিছু চায়। পুত্র, কন্যা, সুখ, শান্তি, চাকরি, ব্যবসা আরও কত কিছু! কেউ কেউ অন্যায় অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে চায় বিচার। এ উপর এবং উপরওয়ালা বলতে তারা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে বুঝান। কিন্তু আমাদের রাজনীতি ও প্রশাসনের মানুষদের 'উপর' ও 'উপরওয়ালা' অসহায়-গরিবদের মতো এক ও অদ্বিতীয় নন। তারা তাদের উপরওয়ালার প্রতি বিশ্বস্ত যেমন নন, তেমনি নন নির্ভরশীল। প্রায়ই তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে একটি সত্যি গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। আমার এক সম্মানীয় গুরুজন আমাকে একান্তে ডেকে বললেন—বাবা তুমি তো অনেক বড় স্কুলের হেডমাস্টার। তোমার স্কুলে অনেক মেয়ে। আমার ছেলেটার জন্য একটা মেয়ে দেখ না! আমি বললাম, খালাম্মা, আপনারা কীরকম মেয়ে চান? তিনি মেয়ের শরীর-স্বাস্থ্য, রূপ-গুণ ইত্যাদির একটা বর্ণনা দিলেন। এর মধ্যে নাক, চুল, চোখ কেমন হবে তারও একটা নিখুঁত বর্ণনা ছিল। আমি বললাম খালাম্মা এরকম মেয়ে তো আমার স্কুলে আমি দেখি না। তবে একটা উপায় আছে। আমার গ্রামে আমাদের পড়শি হচ্ছে কুমোড় পাড়া। তাদের বলে একটা অর্ডার দিয়ে রাখতে পারি। আমার বিশ্বাস তারা চাহিদা মতো বানিয়ে দিতে পারবে। তিনি প্রথম বুঝতে পারেননি। পরে বুঝতে পেরে মুখ কালো করে সরে পড়লেন। বেশ অনেকদিন পর হাসিমুখে বাসায় এসে সুসংবাদটি দিলেন। ছেলের জন্য মেয়ে পছন্দ হয়ে গেছে। সবাই বিস্মিত হয়ে কোনো কথা না বলে খালি তাকিয়েছিল। নীরবতা ভঙ্গ করে আমিই জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে কীভাবে করলেন এ শুভ কাজ। তিনি কোনো কথা না বলে শাহাদাৎ আঙুল বা তর্জনি উঠিয়ে 'উপরে' দেখালেন। সবাই আলহামদুলিল্লাহ বললেন। অনেক কথাবার্তার পর উনি চলে গেলেন। যাবার পর আমার এক বড় ভাই বিস্মিতভাব নিয়ে বললেন, আমি মনে মনে অনেক খুঁজলাম। কই উনাদের উপরতলার বাসায় তো কোনো মেয়ে কখনো দেখিনি। উপর থেকে মেয়ে কীভাবে পেলেন? সহজ সরল মানুষটার এহেন বোকামির জন্য সবাই এক গাল হাসির সুযোগ পায়।

এখন আমরা আমাদের জাতীয় উপরওয়ালার সুলুক কীভাবে সন্ধান করি? তাহলে তো অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

বহুদিন কোনো 'ডাক' পাই না : ডাক বিভাগের সংস্কার চাই

এক

নীরবে নিভৃতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা লোকান্তরিত হতে যাচ্ছে। সে সেবাটি হচ্ছে ডাক সেবা। অনেকে বলবেন—চিঠি লিখি না। ডাক সেবা কীভাবে থাকবে? তাহলে কুরিয়ার সার্ভিস কীভাবে দিন দিন রমরমা ব্যবসা করছে। ডাক বিভাগ বলবেন—আমরাও নতুন সেবা প্যাকেজ চালু করে রাজস্ব আয় বাড়িয়েছি। কিন্তু আমি সাধারণ একজন নাগরিক হিসেবে সরকারের প্রতিশ্রুত ডাক সেবা পাই না। কুরিয়ার সার্ভিসে একটি সাধারণ চিঠি পাঠাতে আমার কাছ থেকে ৫০ টাকা নেওয়া হয়। যে চিঠি আসে তাও ৩/৪ দিন পর, তাদের অফিসে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। আমি সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচটা চিঠি, বুকপোস্ট বা পার্সেল পাই। তার কোনোটিই ডাকে নয়। কেউ সরাসরি কর্মী মারফত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠায়। কোনো কোন চিঠি আসলে কুরিয়ার থেকে ফোন করে। স্বশরীরে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। এ অনাবশ্যক ব্যয় ও হয়রানির প্রতিবিধান কী?

অথচ ডাক বিভাগ তাদের 'মিশন' স্টেটমেন্টে লিখেছে—'শ্রেণি পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জন্য দ্রূততার সাথে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী ডাক সেবা নিশ্চিতকরণে ডাক অধিদপ্তর অঙ্গীকারাবদ্ধ।' ডাক বিভাগের মাথাভারী আমলা কাঠামো অক্ষত এবং উত্তরোত্তর আরও জৌলুসময় হলেও মাঠ পর্যায়ে জনবল ও সেবা সংকুচিত। তারা অনেকটা আত্মসমর্পনের মতো যেন দুহাত তুলেই রেখেছেন। মন্ত্রী, সচিব, অধিদপ্তর, ডাক ক্যাডার, পদোন্নতি, জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ সবই ঠিক আছে, নির্মম সত্য হচ্ছে, আমরা কোনো 'ডাক' পাই না।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ডাক প্রথা অনেক পুরোনো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ডাক প্রথার উল্লেখ আছে। সামরিক ও রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনে রাজকার্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান, সংবাদ প্রেরণ অতি প্রাচীন রীতি। বিশেষ কর্মচারী মারফত-এ কাজ করা হতো। সরাসরি দূত প্রেরণও হতো। ভারতের ইতিহাসে সম্রাট শেরশাহকে 'ঘোড়ার ডাক' পরিবণের জন্য স্মরণ করা হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগেও ডাচ, পর্তুগিজ ও ফ্রান্স, বেনিয়ারা তাদের অধিকৃত এলাকায় ডাক চালু করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কেম্পানি ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজে ডাক ব্যবস্থা চালু করেছিল। লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৭ সালে কলকতায় পোস্ট অফিস ও পোস্ট মাস্টার নিয়োগ করে। ১৭৭৪ সালে লর্ড হেস্টিংস ডাক ব্যবস্থাকে আরও জোরালো করে। এভাবে বাংলাসহ পুরো ভারতবর্ষে একটি পুরোনো ও শক্তিশালী সরকারি দপ্তর ও সেবা হিসেবে ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের আধুনিক ডাক বিভাগ ব্রিটিশদের আদল ও ঐতিহ্যে গড়া। ব্রিটিশ ভূখণ্ডে

১৫১৬ সালে ডাক চালু হয়। ১৮৫২ সালে চিঠি সংগ্রহের জনবান্ধব ব্যবস্থা হিসেবে 'লাল ডাক বাক্স' বসানো হয়। পাঁচশত বছরের রয়েল ব্রিটিশ ডাক বিভাগের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ডাক ও পার্সেল ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু মূল সেবা কাঠামো সর্বজনীন ও ব্যয় সাশ্রয়ী আছে। প্রথম শ্রেণির ডাকে যে চিঠি ও দলিলপত্র পাঠানো হয় তা পরদিন ১২ টার মধ্যে প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছায়। পার্সেলের ক্ষেত্রেও একটি সময় রক্ষা করা হয়। চিঠি, ডকুমেন্ট ও পার্সেল প্রাপকের দোর গোড়ায় বিলি হয়। ব্রিটিশ ভূখণ্ডে বেসরকারি মালিকানায় ডাক ও পার্সেলের ব্যবস্থা আছে। সরকারি বা রয়েলে মেইল এখন মূলত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। ২০১৫ পর্যন্ত সরকারের শেয়ার ছিল ৩০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রেও দুটি বড় বড় বেসরকারি কোম্পানি-ইউপিএক্স ও ফেডএক্সে থাকলেও ডাক বিভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী সরকারি সংস্থা হিসেবে সমাদৃত। বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালীন সময়ে ডাক বিভাগের প্রশংসনীয় ভূমিকা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কেড়েছে।

বাংলাদেশে ডাক ব্যবস্থার পুনর্গঠন জরুরি। এ-ব্যবস্থা একদিকে মানুষের দোর গোড়ায় যেমন ডাক সেবা পৌঁছাতে সক্ষম, অপরদিকে হতে পারে লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান। গতি আনতে হলে-এর সংগঠন, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও বিনিয়োগে বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। এটি কোনো 'ক্যাডার শাসিত বিশুদ্ধ সরকারি' সংস্থার মাধ্যমে সম্ভব নয়। এটিকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করে পেশাদার জনশক্তি দিয়ে চালাতে হবে। বাজারে শেয়ার ছেড়ে বাজার থেকে বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে সংগ্রহ সম্ভব। এ জন্য নতুন আইন করতে হবে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যোগ্যতা যাচাই করে জনবল এবং সারা দেশে ডাক বিভাগের যে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তাকে পুনগঠিত করতে হবে। সংগঠনের পিরামিড নীচে অনেক বড়, উপরে ছোট থাকবে। ডাক বিভাগের ওয়েব সাইট পর্যালোচনায় দেখা গেল, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এ দুই জেলার ২৪টি উপজেলায় শহরের জেনারেল পোস্ট অফিস ছাড়াও ৫২৭টি নানা শ্রেণির ডাকঘর রয়েছে। দেশের ৬৪ জেলার হিসাব করলে একটি বিরাট বিস্তৃত নেটওয়ার্কের চিত্র আমরা পাবো। দেশের সকল কুরিয়ার সার্ভিস মিলে তার এক পঞ্চমাংশ জনশক্তি বা নেটওয়ার্ক কী গড়ে উঠেছে? তাহলে প্রতিবছর জনগণের দেওয়া করের অর্থে এত বড় এ বিভাগ এভাবে চালানোর কারণ কী? টিএন্ডটির ল্যান্ড লাইন প্রযুক্তি অচল। মোবাইল ফোনের রাজস্বের স্ফীতিতে ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এখন রমরমা অবস্থা। তাই বলে সাধারণ ডাক অচল ও অবহেলিত থাকার কোনো কারণ নেই। চিঠি, পার্সেল ও মোবাইল সাভিসে অর্থ প্রেরণ এ তিনটি কাজকে জোরদার করার লক্ষে ডাক বিভাগের আমূল সংস্কার চাই। এ কল্যাণমুখী সংস্কারের লক্ষে সরকার সর্বস্তরের মানুষের গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা শুনুন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিন।

দুই

সরকারের প্রতি অনুরোধ, নতুন যুগোপযোগী আইন, সংগঠন কাঠামো এবং বেসরকারি ও জনবিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ডাক সেবা ব্যবস্থার সাথে সাধারণ মানুষ ও কমিউনিটিকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা যায়। একটি নীতিমালা করে জনগণকে আহ্বান করা হলে সাধারণ মানুষ নিজ নিজ এলাকায় কমিউনিটি ডাকঘর ও ডাক-বাক্স স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসবে। চিঠি বিলি এবং ডাকবাক্স থেকে চিঠি সংগ্রহের জন্য কমিশনের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত হবে। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য এলাকার দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার থাকবে। কোনো কোনো হাই স্কুল বা কলেজের একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব ভবনে পোস্ট অফিস চালু করতে পারে। এমনকি ফোন, বিকাশ, নগদ-এর বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও ডাক ব্যবস্থায় যুক্ত করা যেতে পারে। ব্রিটেনে মনোহারি দোকানের অংশ হিসেবে ভারোভাবে ডাক সেবা চলতে দেখেছি। সুদৃশ্য, দৃষ্টি নন্দন নান্দনিক তার ছোঁয়া দিয়ে পোস্ট কার্ড ও খাম ছাপুন। সাশ্রয়ী মূল্যে কমিশনের ভিত্তিতে বাজারজাত করুন। বিশেষ বিশেষ সময় ও দিবসকে কেন্দ্র করে নানা থিম নিয়ে কার্ড ছাপান। যেমন ঈদ শুভেচ্ছা, মা, বাবা, শিক্ষক ভালোবাসা দিবস, ভাইবোনের প্রতি শুভেচ্ছা। জন্মদিনের, বসন্তের, বর্ষার নানা বর্ণের নান্দনিক কার্ড হতে পারে। স্বেচ্ছাসেবকগণ এসব কার্ড বিক্রি করবে। স্টাম্প সমেত একটি কার্ডের দাম ১০ থেকে ১৫ টাকার বেশি হবে না। এভাবে স্টাম্প সমেত নানা আকার ও রঙ-এর খাম ছাপা হবে। অর্ডার দিয়ে যে কোনো সংস্থা তাদের নামে স্টাম্পসহ খাম নিতে পারে। এভাবে দুবছরের মধ্যে দেশে একটি ডাক বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে। কোনো সরকারি চিঠি বা দলিল ডাক বিভাগ ছাড়া অন্য মাধ্যমে পাঠানো যাবে না।

(নোট : দেশে পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালু হলে ডাক বিভাগ নবজীবন লাভ করবে)।

বাংলাদেশে নাগরিক পেনশন

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন-এর এক অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমপি বলেন— 'সব নাগরিককে পেনশনের আওতায় আনার কাজ চলছে' (*দৈনিক বণিক বার্তা*, ২৮ জানুয়ারি ২০২১)। এ তথ্যটি অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যে গৃহহীনদের জন্য আবাসনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ সরকার বাস্তবায়ন করেছে। দেশের ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবার ২ শতাংশ জমিসহ নিজের বাড়িতে বসবাস শুরু করেছে। দেশে সরকারি কর্মচারীদের যে পেনশন ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমল থেকে চালু ছিল তাতে নানা কার্যকর সংস্কার সাধন করা হয়েছে এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও সাথে পেনশনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ একদিকে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে সামিল হওয়ার চেষ্টায় সফলভাবে ধাবমান এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও সমান আগ্রহী। সর্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তেমনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দেশে বর্তমানে যে 'পেনশন ব্যবস্থা' রয়েছে তা অর্থ সংস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে টেকসই নয়। সরকারি চাকুরিজীবীদের পেনশন পুরোপুরি জনগণের কর রাজস্ব থেকে দেওয়া হয় এবং দরিদ্র-অক্ষমদের দেওয়া ভাতাটি নিতান্তই দুস্থ সাহায্য শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। দুটোরই অর্থ সরাসরি সরকারের কর বাজস্ব থেকে সংস্থান করা হয়। ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ সালের বাজেটে যথাক্রমে ৮১ হাজার ৮৮৬ ও ৯৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০২০-২০২১ সালের বরাদ্দের ২৪ শতাংশ ছিল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন এবং ৭ শতাংশ সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবত ব্যয় হবে। এখনও দেশে টেকসই কোনো 'জাতীয় পেনশন তহবিল' নেই। এরকম একটি ব্যবস্থা দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার উপর একটি বড় ধরনের চাপ। পেনশনের একটি পৃথক অর্থ সংস্থান উৎস থাকতে হয়, থাকতে হবে পৃথক নীতিমালা ও একটি আইন। আশা করি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সবদিক বিবেচনা করে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২০১৫ সনে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণীত হয়। সেখানে জীবনচক্র (Life cycle) ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুপারিশ করা হয়েছে। জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের সার্বিক জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্রিটেনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে (১৯৮৬-১৯৯১) আমি এ বিষয়টি নিয়ে কিছু পড়াশুনার সুযোগ লাভ করি। পশ্চিম ইউরোপের কল্যাণ-রাষ্ট্রের ধারণা ও বাস্তবতাকে বাংলাদেশে প্রয়োগের চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। এ বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন তা আমাকে ভীষণভাবে আশান্বিত করেছে। ইতিমধ্যে নানা সময়ে এ বিষয়ে

কিছু প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় লিখেছি। অনেকে বলেছেন, এসব বিষয় বাংলাদেশে হবার নয়। টিভির একটি টকশোতেও বিষয়টি উঠিয়েছিলাম। সহ-আলোচক বিষয়টি বুঝতেই চাইলেন না। বর্তমানে সরকার এ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথম যে বিষয়টি পেনশন ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে সেটি হচ্ছে অর্থ সংস্থান। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন রাজস্ব বাজেটের উপর একটি বড় চাপ। এ পেনশন ব্যবস্থার সাথে পেনশনারের চাকুরিকালীন সময়ের কোনো চাঁদা বা কনট্রিবিউশন যুক্ত নেই। অপরদিকে দরিদ্র ও অক্ষম বয়স্কদের যে ভাতা দেওয়া হয় তাও সরকারি রাজস্বের অংশ। তার উপর সর্বজনীন নাগরিক পেনশনের অর্থও কী থোক হিসেবে সরকারের বর্তমান রাজস্ব কাঠামোতে সংস্থান করা সম্ভব? মনে হয় না তা টেকসই কোনো ব্যবস্থা হবে। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন চিন্তা করতে হবে। 'সকল নাগরিকের জন্য পেনশন' চিন্তাটির বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ ও সুদূরপ্রশারী পরিকল্পনার অংশ হতে হবে। স্বতন্ত্র একটি পেনশন তহবিল ও পেনশন আইন দ্বারা এ ব্যবস্থা পরিচালিত হবে।

অর্থসংস্থান: পেনশনের অর্থ অবশ্যই কর রাজস্ব থেকেই আহরিত হবে। আমাদের বর্তমান কর রাজস্বের দুই উৎস — আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হবে মূলত পেনশন অর্থ সংস্থানের উৎস। কিন্তু আমাদের কর ভিত্তির আকার ও পরিমাণে অত্যন্ত দুর্বল। এত দুর্বল কর ভিতের উপর দাঁড়িয়ে এত বড় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চিন্তাই করা যায় না। তাই এ বিষয়ে সুপারিশ হবে কর ভিত্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ। বর্তমানে ৩০ থেকে ৩২ লাখ লোকের টিআইএন আছে এবং সত্যিকার অর্থে ১২ থেকে ১৪ লক্ষ টিআইএনধারী আয়কর দিয়ে থাকে। তাতেও যে আয় হয় তা খুব কম নয়। কিন্ত এ দেশে আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তির সংখ্যাও এ রাজস্ব বহু গুণ বৃদ্ধি সম্ভব। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। এক, কর আয় সীমা ও করের হার যুক্তিযুক্তকরণ। দুই, করদাতাদের জন্য যথাযথ ও টেকসই প্রণোদনা। তাছাড়া কর বহির্ভূত অন্যান্য বেশ কিছু বিষয় আছে যা দেশে সঠিক একটি রাজস্ব আহরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রথমত, দেশে কর আয়ের নিম্নতম কোনো সীমা বা স্লাব থাকবে না এবং প্রতিটি কর্মক্ষম নাগরিক রাষ্ট্রকে কর দিবে। এখন কি দিচ্ছে না? দিচ্ছে, তবে পরোক্ষভাবে দিচ্ছে। তা ভ্যাটের মাধ্যমে দিচ্ছে বলে সরাসরি বুঝতে পারে না। রাষ্ট্রযন্ত্রের ভয়, প্রচ্ছন্ন বা চোরাপথে না গেলে রাজস্ব আয় কমে যাবে। রাজস্ব বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্র শুধু চোরাপথ খুঁজে বেড়ায়। ষোলো থেকে সতেরো কোটি মানুষের দেশে কম করে হলেও চার (০৪) কোটি মানুষকে সরাসরি কর প্রদানকারীর আওতায় আনার সুযোগ আছে। আমাদের কর ব্যবস্থা করদাতাবান্ধব নয়, নিবর্তনমূলক। কর আদায় ব্যবস্থা ততোধিক

অস্বাস্থ্যকর। তাই করহার হ্রাস এবং কর প্রশাসনকে করদাতাবান্ধব করে সাজাতে হবে। আয় সীমা নির্বিশেষে সবাইকে কর নিবন্ধন করতে হবে। যাদের কর দেওয়ার মতো আয় নেই তাদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় থাকবে। কিন্তু নিবন্ধন বাধ্যতামুলক হবে। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে একজনের কর নিবন্ধন থাকবে এবং অপরজন যুগল হিসেবে নিবন্ধিত হবেন। দুজনের পৃথক আয় থাকলে পৃথকভাবে নিবন্ধিত হবেন। কর হার নিম্ন পর্যায়ে ব্যাপকভাবে কমাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক (০১) লাখ টাকার বেশি বাৎসরিক আয় হলে আয়করের আওতাভূক্ত হবে। আয়কর দিবে মোট আয়ের এক শতাংশ। এভাবে দুই থেকে পাঁচ লাখ টাকা আয়সীমা পর্যন্ত এক শতাংশ করে বাড়বে। পাঁচলাখের উপরে এবং দশ লাখের নীচের আয় শ্রেণির জন্য নতুন একটি স্লাব হতে পারে। পরবর্তী অংকের আয় শ্রেণির ক্ষেত্রেও আয়কর কিছু হ্রাস করার অবকাশ অছে। আয়কর উচ্চ-মাত্রায় ধার্য হলে সেখানে আয় লুকানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম করদাতাদের ক্ষেত্রে অন্য একটি বিষয় বিবেচ্য। তারা অনেকে মোট সম্পদের বা উদ্বৃত্তের উপর আড়াই শতাংশ যাকাত দিয়ে থাকে। যাকাত দেওয়ার পর আবার উচ্চহারে কর দানের বিষয়টি বাস্তবসম্মতভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। জাকাতের একটি পৃথক নিবন্ধন করে এনবিআর এ অর্থ গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে দাতাকে ঐ পরিমাণ কর অব্যাহতি দিতে পারে। রাষ্ট্র এ অর্থ দুস্থ, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অতি দরিদ্রদের কার্যক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করতে পারে। 'জাকাত তহবিল' নামে সরকারের একটি বিশেষ তহবিলও থাকতে পারে। মোদ্দা কথা হলো ৪ কোটি করদাতার একটি আয়কর ব্যবস্থা চালু করার লক্ষে একটি জাতীয় কর নীতি প্রবর্তিত হলে সর্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এটিকে একটি পাঁচ বছরব্যাপী পরিকল্পনার অধীনে আনা হলে প্রতিবছর যৌক্তিক হারে করদাতা বাড়বে এবং ষষ্ঠ বর্ষে ৩ থেকে ৪ কোটি করদাতার একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ২০৩০ সালের উন্নয়ন রূপকল্পে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং অষ্টম পঞ্চার্ষিক পরিকল্পনায় বিষয়টির সূচনা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার তা হচ্ছে করদাতার প্রণোদনার বিষয়। যে আয়করদাতা তার কষ্টে অর্জিত অর্থ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়, তার প্রণোদনা, সন্তুষ্টি এবং প্রাপ্তি কী? দুটি প্রাপ্তি ও সন্তুষ্টির বিষয় থাকতে পারে। ১. করের বিনিময়ে করদাতা সরাসরি সুনির্দিষ্ট কোনো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। ২. করদাতা সন্তুষ্ট যে রাষ্ট্র তার অর্থ ঈমানদারীর সাথে দেশের নানা সেবা-পরিষেবা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কাজে লাগাচ্ছে। তাতে কোনো দুর্নীতি, আত্মসাৎ, অপচয়, অনিয়ম, ইত্যাদি নেই। এখানে একজন করদাতা কিন্তু দুদিক থেকে হতাশ। তাই বেশি করে কর রাজস্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে করদাতাদের উপরে উল্লেখিত দুটি সন্তুষ্টি বা প্রণোদণার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে করদাতাদের নাগরিক পেনশনের অন্তর্ভুক্তি একটি বড় প্রণোদনা হতে পারে এবং কর ব্যবস্থার সাথে পেনশন ব্যবস্থার সংযুক্তি এ ব্যবস্থাকে টেকসই

করতে পারে। প্রতিজন করদাতা তার সক্রিয় কর্মজীবন শেষে দেওয়া কর হারের প্রগ্রেসিভ রেইটে পেনশন পাবার অধিকারী হবে। একজন নাগারিক তিনি বেসরকারি চাকুরিজীবী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, স্ব-কর্মে নিয়োজিত যেই হোন কমক্ষেপ ৩০ থেকে ৪০ বছর সমাজ ও রাষ্ট্রকে দিবে, তার জীবনের শেষ সময় ৬০ বছর বয়স থেকে যতদিন বাঁচবে রাষ্ট্র তার দেখাশুনার দায়িত্ব নিবে। এটিই হবে একজন করদাতার কর দেওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় প্রণোদণা।

এসব বিষয়ের আইনগত, প্রশাসনিক ও অর্থসংস্থানগত বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। আশা করি আগামী অর্থ বছরের (২০২১-২০২২) বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য পূর্বের তিনটি প্রকাশনা দেখা যেতে পারে।

মোটা দাগের ৫টি সুপারিশ—

১. একটি একক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা ও সর্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা নিয়ে আসা হউক। অর্থ বা পরিকল্পনা যে কোনো একটি মন্ত্রণালয় নীতি নির্ধারক মন্ত্রণালয় (মুখ্য নিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয়) হিসেবে কাজ শুরু করতে পারে। আর সেবাদানকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হিসেবে পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু, প্রভৃতি মন্ত্রণালয় কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করবে। অর্থ বা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অধিদপ্তর বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা মূল কাজটি সমন্বয় ও নীতি মনিটরিং করবে।
২. সরকার একটি জাতীয় পেনশন ফান্ড গঠন করবে। দেশের সকল নাগরিক যাদের এনআইডি আছে তাদের সবাইকে একটি সোসাল সিকিউরিটি নাম্বার এবং একটি টিআইএন নাম্বার দিয়ে দিবে। করদাতাদের দেওয়া আয়করের ৫ শতাংশ সরকারের পেনশন ফান্ডে এবং পেনশনারের হিসেবে সরাসরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তর হবে। যারা কর আয় শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত নন, তারা বছরে একটি নির্ধারিত অংকের প্রিমিয়াম পেনশন তহবিলে জমা করবেন। এভাবে আয়কর ও পেনশনের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হবে।
৩. কর প্রদান বা কোনো কনট্রিবিউশান না করলে কেউ পেনশনের অধিকারী হবেন না। এখন বেসরকারি করদাতারা কর দিয়ে তার কোনো সুবিধা পায় না। আয়করের সাথে পেনশনকে যুক্ত করলে সে অবস্থার অবসান হবে। দেশে করদাতার সংখ্যাও বেড়ে যাবে।
৪. আগামী অর্থ বছর থেকে ৬০ বছর উর্ধ্ব বয়সি যারা সক্রিয় কর্মজীবনে আয়কর দিয়েছেন, তাদেরকে পেনশন দেওয়া হউক।
৫. পেনশন আইন ও নীতিমালা, পেনশন তহবিল, পেনশন কর্তৃপক্ষ, এনবিআর ও পেনশন কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক ইত্যাদি আইন, নীতিমালা ও বিধির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার সকল ব্যবস্থা অগ্রসর হউক।

অন্যান্য সহায়ক সূত্র :

১. *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও সর্বজনীন নাগরিক পেনশন, দৈনিক বণিক বার্তা, ২২ ও ২৩ নভেম্বর ২০১৫।*
২. *Natioal Pension Scheme: Towards a Universal Social Security, The Daily Star*, 05 February 2016
৩. *একটি সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কল্যাণমুখী ব্যবস্থার ধারণা, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই ২০১৬।*

বাংলাদেশে দান-অনুদান ও চাঁদা প্রথা : সংকুচিত জনপরিসর ও অবহেলিত প্রাতিষ্ঠানিকতা

স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করল, কিন্তু ব্যক্তিগত দান-অনুদান বিষয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের চিন্তাভাবনার কোনো মেলবন্ধন হলো না। বেসরকারি দান-অনুদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের কোনো সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি এ দেশে গড়ে উঠল না। বর্তমান আলোচনার প্রধান উপজীব্য হবে চাঁদা, দান-অনুদান, দাতব্য অর্থায়ন প্রভৃতির প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনার সূত্রপাত করা। সরকারকে আইন অনুযায়ী দেওয়া কর এবং নানা সরকারি বেসরকারি সেবার জন্য ফি বা সেবা রাজস্ব, যা জনগণ দিয়ে থাকে, এ আলোচনায় ঐ সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে জনগণ স্বেচ্ছায় ব্যক্তি হিসেবে, নানা বেসরকারি সংগঠনের সদস্য হিসেবে, জনহিতের উদ্দেশ্যে কিম্বা কোনো বিশেষ কর্ম বা কারণকে সমর্থন করে কোনো সংগঠন ও ব্যক্তিকে নগদ বা দ্রব্য সামগ্রীতে যে অর্থ প্রদান করে থাকে তাকে বুঝানো হচ্ছে। যেমন পেশা, নেশা, কর্ম, ধর্ম, স্বার্থ সুরক্ষা গোষ্ঠী, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, বিশেষ কোনো মতাদর্শ প্রচারসহ নানা কারণে মানুষ নানা সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে। সে জন্য সদস্য ফি দিয়ে থাকে বা সদস্য না হয়েও চাঁদা বা অনুদান দিয়ে থাকে। সে সংগঠন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ক্রীড়া সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মকর্তা সমিতি, কর্মচারী সমিতি, সমবায় সমিতি, ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিক সংঘ, সাংবাদিক সমিতি, নানা বিনোদন ক্লাব ইত্যাদি হতে পারে। নিয়মানুযায়ী সদস্য চাঁদার বাইরেও বিশেষ কোনো কাজ বা উদ্যোগকে সমর্থন ও সহায়তার জন্যও মানুষ দান-অনুদান দিয়ে থাকে। যেমন—প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি-অতিমারির সময় বিশেষ ত্রাণ তৎপরতা, চিকিৎসা সেবা ও সহায়তা, নিয়মিত সদস্য ফি-এর বাইরেও রাজনৈতিক দলের তহবিল গঠনে আর্থিক সহায়তা, কোনো জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে অর্থ সহায়তা। তাছাড়া কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা উদ্যোগকে এককালীন সহায়তাও হতে পারে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে এসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত কর্মকাণ্ড সংগঠন, তার আওতা, অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কাঠামো থাকে। তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাভেদে দেশে দেশে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন—এশিয়ার দেশ হলেও চিন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়ার সাথে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, বাংলাদেশের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। অপরদিকে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হলেও সৌদি আরবসহ বাদশা, শেখ ও আমীর শাসিত মধ্যপ্রাচ্য, উপজাতীয় গোষ্ঠী নেতার আনুগত্যাধীন জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মধ্য-এশীয় ও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের অমিল। এ ক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকা তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং পশ্চিম ইউরোপ, আর অপরদিকে

জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এবং উপমহাদেশের বাংলাদেশ ও ভারতের হুবহু মিল না থাকলেও মূলনীতিতে অনেক সাজুয্যতা রয়েছে। বিশেষত বিষয়টি যেহেতু রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংবিধান, সাংবিধানিকতা ও আইন কাঠামোর সাথে সংযুক্ত তাই যে পার্থক্য বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান তাকে মূলত তিনটি বৃহত্তর বিভাজনে বিভক্ত করা যায়।

১. উদার (Liberal)
২. কম উদার (moderately liberal)
৩. অনুদার (Illiberal)

এই তিনটি বৃহৎ বিভাজনের দেশে দান-অনুদান দেওয়া ও ব্যবহারে পার্থক্য হয় বৈকি। উদার ও অনুদারের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা গেলেও কম উদার সমাজ ও দেশগুলোর বিরাজিত ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে একক কোনো মাপকাঠিতে বিচার করা দুষ্কর হয়ে যায়।

বাংলাদেশকে নানা আন্তর্জাতিক সূচকে এ সব বিষয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে নিম্ন-মধ্যম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় কম উদার দেশের কাতারে সামিল করা হয়ে থাকে। এখানে স্বেচ্ছা দান-অনুদান বা চাঁদা দান, গ্রহণ, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার আইনি ও সাংগঠনিক কাঠামো একদিকে কম উদার অপরদিকে খণ্ডিত। তাই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে ঐতিহাসিকভাবে আবহমান কাল ধরে ব্যক্তি মানুষ ও সমাজ প্রচুর দান–অনুদানের চর্চা হয়ে থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিকতার অনুপস্থিতিতে তার প্রত্যাশিত ক্রমপুঞ্জিত প্রভাব সমাজ জীবনে অপেক্ষাকৃত কম। এ বিষয়ে নবতর নীতি চিন্তার অবকাশ রয়েছে। এ বিষয়টি আলোচনার পাদপ্রদীপে আনার জন্যই মূলত এ আলোচনার সূত্রপাত।

১. চ্যারিটি বা দাতব্য কর্ম ও প্রতিষ্ঠানে দান—অনুদান

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিসের ২০১৮ সনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ট্যাক্স আইন (৫০১, সি-১)-এর অধীনে ১.৩ মিলিয়ন এবং একই আইনের ৫০১ (সি-৪) বলে আরও ৮০ হাজার চ্যারিটি কর মওকুফের সুবিধা নিয়ে নানা জনহিতকর, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, পরিবেশ ও ক্লাইমেট, শিশু এবং আন্তর্জাতিকভাবে দারিদ্যসহ নানা বিষয়ে কাজ করে থাকে। ঐ দাতব্য সংগঠনগুলো ২০১৮ সনে যে ডোনেশন সংগ্রহ করেছে তার পরিমাণ ৪২৭.৭১ বিলিয়ন ডলার। ঐ দানের অর্থের ৬৮ শতাংশ-এর উৎস ব্যক্তিগত দান-অনুদান। ১৮ শতাংশ বিভিন্ন ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশন, ৯ শতাংশ বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন—ব্রেকফাস্ট, ডিনার, ওয়াকাথন, ম্যারাথন, কনসার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ এবং ৫ শতাংশ করপোরেট সেক্টরের সিএসআর-এর অনুদান। ২০১৮ সনের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ১ লাখ ৬৮ হাজার চ্যারিটি রয়েছে। ব্রিটেনের এই দুই এলাকা (ইংল্যান্ড

ও ওয়েলস)-এর মানুষ মাসে গড়-পড়তা ২৪ পাউন্ড এসব চ্যারিটিতে দান করে। ২০২০ সনে শুধু শিশু বিষয়ক সহায়তা প্রকল্পগুলোর জন্য ৪১.০৯ বিলিয়ন পাউন্ড গণচাঁদা সংগৃহীত হয়। কানাডীয় সরকারের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১০ সালে ১৫ বছরের উর্ধ্ব বয়সের সকল কানাডীয়ানের ৮৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৩.৮ মিলিয়ন অধিবাসী ১০.৬ বিলিয়ন কানাডীয়ান ডলার চাঁদা দিয়েছে। একজন কানাডীয় গড়ে বছরে প্রায় ৪৪৬ ডলার নানা চ্যারিটিতে ব্যক্তিগতভাবে দান করে থাকে। তিন দেশেরই নানা পরিসংখ্যানে দেখা যায় পুরুষের চেয়ে নারী এবং কম বয়স্কদের তুলনায় বেশি বয়স্করাই চ্যারিটিতে বেশি অর্থ সাহায্য করে থাকে। তবে যারা ধর্ম বিশ্বাসী এবং বয়স্ক তাদের মধ্যে দানশীলতার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

আমাদের দেশে দানশীলতা বা চ্যারিটির উপর কোনো নির্ভরযোগ্য অধ্যয়ন নেই। তবে দান-অনুদানের অর্থে এদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের লাখ লাখ মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপাসনালয় যথা চার্চ, মন্দির প্যাগোডা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ঐসব প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক নানা সমাজ কর্ম ব্যক্তির দান-অনুদানেই চলছে। কওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানাসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান মূলত ব্যক্তির দান-অনুদান নির্ভর। তাছাড়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে যাকাত, ফিতরা, সাদাকা, কোরবানির পশুর চামড়া, ইত্যাদি নানা উপায়ে দান খয়রাত করে থাকে। তাছাড়াও নানা ধরনের ভোজ এবং লক্ষ ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাত্রে প্রতিদিন এদেশের মানুষ অনেক অর্থ দান করে থাকে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধান বা সঠিক গবেষণা না থাকায় তার পরিমাপ বা পরিমাণের নির্ভরযোগ্য জাতীয় বা স্থানীয় কোনো তথ্য কারও জানা নেই। তবে এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে আমাদের সমাজে দয়া, দাক্ষিণ্য, দান-অনুদানের সাথে ব্যক্তির পারলৌকিক কল্যাণের প্রশ্ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাই এখানে দান-অনুদানের পিছনে মুসলিম ধর্মীয় ভাবধারা অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। উপমহাদেশের অন্যান্য ধর্ম বিশেষত সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় দান-অনুদানের নানা ঐতিহ্য রয়েছে। পরিবার ও সমাজভিত্তিক দান-অনুদানের পাশাপাশি নানা ধর্মীয় সম্প্রদায় আজকাল সমাজকল্যাণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে মনোযোগী হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক কিছু ইসলামিক চ্যারিটি গঠিত হয়েছে। তাদের কোনো কোনো ধর্মীয় ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অবদান রাখছে এবং বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তি, পরিবার ও সংগঠন তাদের দান-অনুদান পেয়ে থাকে। কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব সরকারের ও ঐ সব দেশের কিছু সংগঠন পেশাদার চ্যারিটির মতো কিছু কর্মকাণ্ড করছে।

পশ্চিমা বিশ্বেও দাতব্য কর্ম ও তহবিল প্রাথমিক অবস্থায় চার্চকেন্দ্রিক কার্যক্রম হিসেবে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে চার্চের প্রভাব বলয়ের বাইরে দাতব্য কর্মের

সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। তাছাড়া গণসেবা বা জনসেবায় পেশাদারিত্বের বিষয়টি ক্রমে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই কালক্রমে বিভিন্ন দেশে দেশে পেশাজীবীরাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে দান-অনুদান সংগ্রহ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার নানা প্রতিষ্ঠান গড়তে থাকে। পশ্চিমে দান-অনুদান বা ফান্ড মোবিলাইজেশন একটি পেশাদারি কাজ হিসেবে স্বীকৃত। সেজন্য বেতনভুক বা কমিশনভিত্তিক লোক নিয়োগ হয়। আমাদের দেশেও কওমী মাদ্রাসার কিছু আলেম দেশ-বিদেশ থেকে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহে বিশেষ পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যে কারণে দীর্ঘদিন ধরে শুধু ব্যক্তি মানুষের দান-অনুদানের উপর নির্ভর করে অনেক বড় বড় কওমী প্রতিষ্ঠান চলছে এবং সেখানে লক্ষ ছাত্রের অন্ন সংস্থান ও অধ্যয়ন দুটোই চলছে।

আমাদের দেশে পশ্চিমা বা উত্তর আমেরিকার ঐতিহ্যের চ্যারিটি বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে পেশাদার স্বেচ্ছাব্রতী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের আধিক্যটাই বেশি। পশ্চিমে প্রথমে চ্যারিটি হিসেবে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলো পরবর্তীতে করপোরেটে রূপান্তরিত হয় বা করপোরেট ব্যবস্থাপনার অধীনে আসে। আমাদের দেশে এনজিও প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতেই করপোরেট আদলের কাঠামোটা বাহ্যিকভাবে সাজিয়ে নেয়। কিন্তু বেশিরভাগ এনজিও ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান হিসেবেই চালানো হয়। সরকারি সকল নিয়মনীতি মেনে করা হলেও তার প্রাণটা ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক সামন্ত নেতৃত্বের আবহকে অতিক্রম করতে পারেনি। নিজেরা সমাজ থেকে ক্ষুদ্র দান-অনুদান সংগ্রহের চেয়ে বৈদেশিক দান-অনুদান উৎসকে মূল উপজীব্য করেই নিজেদের কর্ম-কাঠামো দাঁড় করায়। তাই এদেশে পেশাদার চ্যারিটির বদলে বৈদেশিক অনুদান নির্ভর এনজিও বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রাবল্য। এখানে তাই এনজিও নিয়ে যত চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা চ্যারিটি নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা বা অধ্যয়ন নেই। গণচাঁদা বা গণ অনুদানে গঠিত সংস্থার যে দায় তা সহজে কেউ বহন করতে রাজি নয়।

এক সময় ফিলানথ্রপি হিসেবে যে সব কর্মকাণ্ড গণ্য হতো বাজার অর্থনীতির কল্যাণ বা অকল্যাণে তাও চরম মুনাফামুখী কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত। যেমন—শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাটা এ উপমহাদেশে একসময় শ্রেষ্ঠতম ফিলানথ্রপিক উদ্যোগ ছিল। এই বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ যেগুলোর বয়স পঞ্চাশের বেশি বা তার কাছাকাছি, সেগুলোর খোঁজ নিলে দেখা যাবে তার নিরানব্বই শতাংশই কোনো না কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সমাজের দান-অনুদান ও উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। সরকার পরবর্তীতে অনুমতি, অনুমোদন ও অধিগ্রহণ করেছে মাত্র। এগুলো সরকার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান নয়। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় এবং সেবাধর্মী কাজ শুরুর যে সাধারণ প্রবণতা তা হচ্ছে সকল স্বেচ্ছাব্রতী ও সামাজিক কাজে সরকারের আগ্রাসি অধিগ্রহণ এবং জনসমাজের ক্রমাগত পিছু হটে আসা। তাই এখন সামাজিক অংশগ্রহণের প্রকল্প করেও জনগণকে আর জনসেবায় সম্পৃক্ত করা যায় না।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় এখন মুনাফামুখী ব্যক্তি বিনিয়োগের জোয়ার। ফিলানথ্রপির প্রশ্ন প্রায় অবান্তর। দানের অর্থ শুধু মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, এতিমখানায় যায়। এমনকি ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের মধ্যেও হাজি মোহাম্মদ মহসিন বা আর.পি. সাহা আজকাল আর গড়ে উঠছে না, পাওয়া যায় না। বিল গেইটস এ দেশে জন্ম নেয়া না। ধনী হবার প্রক্রিয়া জারি আছে, ধনকে জনহিতকর কাজে লাগানোর প্রবণতা খুবই কম। আজকাল করপোরেট সোস্যাল রেসপনসেবিলিটির অর্থও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদেরই নিজের কোনো সাবসিডিয়ারির মাধ্যমে খরচ করে বা জনসংযোগ কাজে ব্যয় করে। বরঞ্চ সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান গড়া হয়। আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডোনার সদস্য হবার একটি অসুস্থ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি বা সামাজিক উদ্যোগে সেবামূলক কাজের গতিধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। সকল প্রকারের সমাজসেবার দায়-দায়িত্ব এখন রাষ্ট্র ও সরকারের। সরকারও বাছ-বিচারহীনভাবে ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পরিসরে নিজেকে প্রসারিত করে এক ধরনের জনতুষ্টির বাহবা নিচ্ছে। এখন মসজিদ ও মন্দিরের অঙ্গণেও রাষ্ট্র সদম্ভে দেদীপ্যমান। রাষ্ট্র এখন নিজ অর্থে বা অন্যের অনুদান নিয়ে নিজেই মসজিদ নির্মাণ করে। মন্দিরে মন্দিরে পূজার অনুদান দেয়।

সেবা-সহায়তা, নীতি চিন্তা, সমাজচিন্তা ও সমাজকর্মের গণ বা জন পরিসরটা একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। এটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা উচিত। রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র ও জনগণের বৃহত্তর প্রয়োজনে তার নিজস্ব সীমারেখা মেনে চলা উচিত। জন উদ্যোগ যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত স্থান, কাল, পাত্র ও পরিসর বুঝে রাষ্ট্রের সেখানে থেমে যাওয়া আবশ্যক। নতুবা রাষ্ট্র সর্বাত্মকবাদী হয়ে পুরো সমাজকে 'রাজনৈতিক সমাজে' রূপান্তর করে নেওয়ার প্রবণতা জোরালো হয়ে উঠবে। জনসমাজের পরিসর বিলীন হতে থাকবে। সমাজে বহুত্ববাদিতা বিনষ্ট হবে। এটি সৌদি আরবের মতো রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, চিনের মতো সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র, আবার আমাদের মতো মিশ্র প্রকৃতির দেশে সবখানেই হতে পারে। সৌদি আরব বা অন্য অনেক শেখ বা আমির শাসিত রাষ্ট্রের চেয়ে আমাদের মসজিদগুলো অনেক স্বাধীন ও স্ব-শাসিত। এখানে শাসকের জবানে খুতবা হয় না, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে জনপরিসর নেই বললেই চলে। তাদের মসজিদের জুমার খুতবা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে বাক স্বাধীনতা ও বহুত্ববাদের চর্চা আছে। এখানে নানা মাজহাবি ও তরিকার ভিন্নতাকে বাঁধাগ্রস্ত করা হয় না। এসব ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা যা আছে তা আরও বাড়ানো উচিত। রাষ্ট্রের বা রাজনৈতিক সমাজের এখানে কোনো রকম হস্তক্ষেপ আসা উচিত নয়। তাহলে ধর্ম চর্চা সত্যিকারের স্বাধীনতা বজায় থাকে।

২. এনজিও ও সিভিল সোসাইটি

আমাদের দেশের এনজিওগুলো কোনো কোনো সময় নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্ব-

শাসিত সিভিল সোসাইটি সংগঠন বলে ঘোষণা দিয়ে থাকে। আসলে তারা তা নয়। সরকারের সাথে নিবন্ধিত এনজিওগুলোর মধ্যে মূলত দেশি-বিদেশি চার ধরনের সংগঠন রয়েছে।

১. ক্ষুদ্র বর্ণ কার্যক্রম করতে গিয়ে সনাতন এনজিও চরিত্র বদল করে এমএফআই (MFI) হয়ে পড়েছে এবং এমআরএ (Micro Credit Regulatory Authority)-এর অনুমোদিত সংস্থায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।
২. এ ধরনের এনজিওরা বৈদেশিক দাতাদের অর্থে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী অধিকার, মানবাধিকার, শিশু অধিকারের নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। আবার সরকারের সাব-কনট্রাক্টর হিসেবেও প্রকল্পের অর্থ শেয়ার করে সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে কাজ করে।
৩. এক শ্রেণির এনজিও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মতো কাজ করার সাথে সাথে নিজেদের অর্থেও স্বাধীনভাবে প্রকল্প রচনা করে এবং সমাজ পরিবর্তনের লক্ষে প্রেসার গ্রুপ, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদিতেও অংশগ্রহণ করে থাকে।
৪. এ শ্রেণির এনজিওরা মূলত পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান। মাঝে মাঝে সামাজিক আন্দোলন প্রকৃতির কিছু কার্যক্রমও করে থাকে, তাও অবশ্য নানা প্রকল্পের আওতায় এবং বৈদেশিক অর্থায়নে।

তাই দেখা যায় তারা নিজেদের সিভিল সোসাইটি সংগঠন (সিএসও) দাবি করলেও এনজিওগুলো আজকাল সমাজের কোনো অন্যায়-অসঙ্গতি নিয়ে প্রতিবাদি হতে চায় না। এ ক্ষেত্রে জনগণের অর্থে স্বাধীন জন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার জন্য জনগণের ক্ষুদ্র দান-অনুদানে গড়ে ওঠা সংগঠনের প্রয়োজন অপরিহার্য। ধর্মীয় বা পারলৌকিক কল্যাণের দান-অনুদান যেখানে যাওয়ার সেখানেই যাবে, এ পরিমণ্ডলের বাইরেও জনগণের ক্ষুদ্র দান-অনুদানে অধিকারভিত্তিক, সমাজ সংস্কারমুখী ও নীতি চর্চার পেশাদার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা প্রয়োজন। প্রয়োজন এসব প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে ব্যাপক জন অংশগ্রহণ। সিভিল সোসাইটির দুর্বলতা নিয়ে অনেকে আক্ষেপ করেন কিন্তু সিভিল সোসাইটি গঠনের একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে সবা যে রকম সহায়তা প্রয়োজন তা নেই। তবে আজকাল রাজনৈতিক বক্তব্যের কারণে প্রবল বিরোধিতাও দেখা য়ায়। রাজনৈতিক সমাজ ও আমলা সমাজ নাগরিক সংগঠনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যায়।

আমাদের দেশে সিভিল সোসাইটি কর্মকাণ্ড বলতে যা দেখা য়ায় তা মূলত কিছু বক্তৃতা-বিবৃতি। ভিন্ন ভিন্ন পেশার কিছু মানুষ নানা সময়ে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে জাতিকে সতর্ক করে বা কোনো মতের সাথে সংহতি প্রকাশ করে থাকে। এ দেশে সমাজচিন্তকদের চিন্তাকে সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও সমৃদ্ধ করার মতো কোনো জন সংগঠন নেই। কোনো কোনো সময় কিছু প্রচেষ্টা একেবারে ছিল না তা নয়, তবে পিছনে কোনো আর্থিক সহায়তার অবকাঠামো নেই। তাই এদেশে সিভিল সোসাইটি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা সৃষ্টি

হচ্ছে না। সিএসআর বা চ্যারিটি'র ধারণা সঠিকভাবে কাজ করলে হয়তো স্বাধীন সামাজিক পরিমণ্ডল সুরক্ষার উপযোগী কার্যক্রম ও সংগঠন গড়ে ওঠা সহজ হতো। বর্তমানে সিভিল সোসাইটি কার্যক্রমে নানা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাধার কারণে এনজিওগুলো সুযোগ থাকলেও সরাসরি অংশ নিতে পারে না। কিন্তু তারা চাইলে দেশে কিছু স্বাধীন চিন্তক সংগঠন সৃষ্টি ও লালনে অংশ নিতে পারতেন। শক্তিশালী চিন্তক সংগঠন গড়ে উঠলে তারা নানা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথেও যুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবেন।

৩. এনজিও কার্যক্রম : অর্থ সংস্থান, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার প্রশ্ন

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম সত্তর দশকের সূচনালগ্নে যেরকম সহজ-সরল ছিল কালক্রমে বা সময়ের প্রয়োজনে তা এখন অনেক জটিল। প্রথমত আইনি কাঠামোগত জটিলতা। শুরুতে শুধু সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের নিবন্ধন নিয়েই কাজ শুরু হতো। সমাজ কল্যাণ পরিদর্শন, নিরীক্ষা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অর্থায়নও করত। যেমন— বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির হাসপাতাল প্রকল্পে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়ন রয়েছে। কিছু এনজিও সমাজকল্যাণের আমলাতান্ত্রিকতার নিগড় থেকে বাঁচার আশায় 'ট্রাস্ট আইনে' নিবন্ধন করে এবং কেউ আবার 'ফাউন্ডেশন' হিসেবে ভিন্নভাবে নিবন্ধিত হয়। সমাজকল্যাণের অধীনে সোসাইটিজ অ্যাক্ট-এর অধীনে পাড়ার ছোট ক্লাবটি থেকে জাতীয়ভিত্তিক কাজ করা এনজিও সবার নিবন্ধন পরবর্তী সময়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ১৯৭৭ সনে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী এনজিওদের পৃথক একটি নিবন্ধন শুরু হয়। তৈরি হয় এনজিও ব্যুরো। এখন একটি সংস্থার দুটি নিবন্ধন বজায় থাকে। আরও পরে সমস্যার নতুনতর দিক উন্মোচিত হয়। এনজিওদের বৃহত্তর একটি সেবা ও অর্থকরী কর্মহিসেবে আবির্ভূত হয় 'ক্ষুদ্র ঋণ' ব্যবস্থার। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা এবং পরবর্তীকালে পিকেএসএফ এ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। সনাতনী ব্যাংক ব্যবস্থা কিছুটা চাপ অনুভব করতে থাকে। একসময় বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অধীনে সৃষ্টি হয় মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)। যে সব এনজিও-র মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম রয়েছে তাদের কর্মকাণ্ড প্রকৃত অর্থে নিয়ন্ত্রণ করে এমআরএ। তাদেরই নির্দেশনায় মাইক্রো ক্রেডিটি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন বলা হচ্ছে এমএফআই বা মাইক্রো ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন। এমআরএ-এর নির্দেশনায় তারা এখন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধন গ্রহণ করছে। বর্তমান সময়ে বহুমুখী কাজে নিয়োজিত এনজিওগুলোর নিবন্ধন এখন কম-বেশি পাঁচ জায়গায়। এমআরএ, সমাজসেবা, সাব-রেজিস্ট্রার, এনজিও ব্যুরো, এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অধিদপ্তর।

বেসরকারি সংস্থাগুলোয় এসবের কারণে সরকারি খবরদারি বাড়ছে। তাতে তাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা ও লালফিতার দৌরাত্ম বাড়ছে। লালফিতার সাথে বাড়ছে

দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকতা। অবশ্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতা বেড়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে এবং নীরিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করায় অবাধ তথ্যপ্রবাহের অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। তবে পেশাদার এনজিওগুলো ব্যক্তি ও পারিবারিক নিয়ন্ত্রেণের বাইরে এখনও আসেনি। সত্যিকারের করপোরেট কাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি। গড়ে ওঠেনি সদস্যদের প্রতি জবাবদিহি ব্যবস্থা। বেশির ভাগ নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ প্রধান নির্বাহী দ্বারা মনোনীত ও নিয়ন্ত্রিত।

৪. স্বাধীন জনসমাজের প্রতিষ্ঠান কীভাবে সুগঠিত ও অর্থায়িত হতে পারে?

বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের করপোরেট সোস্যাল রেসপন্সেবিলিটির অর্থের একটা অংশ শিক্ষা-সংস্কৃতির নানা কাজে ব্যয় হয়ে থাকে। এ অর্থের একটা অংশ নানা সামাজিক আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের সহায়তায় বরাদ্দ হতে পারে। সংস্থার নিজস্ব সাবসিডিয়ারি বা ব্যবসা প্রমোশনে ও প্রচারে এ অর্থ ব্যয় হবার নয়। তাছাড়া সদস্যদের চাঁদা ও দান-অনুদানের বিষয় তো থাকছেই। দেশে বর্তমানে সদস্যদের দান অনুদানে ব্যয় নির্বাহ করা প্রতিষ্ঠান পাওয়া দুষ্কর। এ ক্ষেত্রে 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' (Citizen for Good Governance) একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হতে পারে। এটি একটি অনিবন্ধিত সদস্য নির্ভর সংগঠন। শুধুমাত্র সদস্যদের অর্থে এ সংগঠন এতদিন চলে আসছে। একই রকমভাবে 'বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র কথাও বলা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র সদস্যদের ক্ষুদ্র চাঁদার উপর ভিত্তি করে বড় কাজ সম্ভব হয় না। তাই নিঃশর্ত কিছু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন প্রয়োজন। এ অর্থ আসতে পারে উদারনৈতিক চ্যারিটি, উদার ও প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এবং করপেরেট সোস্যাল রেসপনসেবিলিটির কাছ থেকে। নতুবা বর্তমান করপোরেট কালচারের যুগে পেশাদার সিভিল সোসাইটি সংগঠন ও আন্দোলন শুধুমাত্র সদস্য চাঁদার ভিত্তিতে এর উজ্জ্বল ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারবে না।

উপসংহার : এটুকু শুধু বলা দরকার এদেশে ব্যক্তিদান অনুদান এমনকি জাকাত বিষয়ক কোনো গবেষণা নেই। করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি, ব্যক্তি দান-অনুদান, জাকাত অর্থের পরিমাণ ও ব্যবহার এসব নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। এসব অর্থের উত্তম ব্যবহার সমাজের অনেক ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা দান অনুদান দেশের কল্যাণমুখী বিনিয়োগের একটি অংশ হতে পারে। দান-অনুদানের অর্থনীতি নিয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। ধরা যাক, মুসলিম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা বা কোরবানি একটি দানভিত্তিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তার সাথে অভ্যন্তরীণ অর্থ প্রবাহ, রেমিট্যান্স, বাজার, সেবা, শিল্প, দারিদ্র হ্রাস কার্যক্রম অনেক কিছুর সম্পর্ক বিদ্যমান। এসব বিষয়ে আমাদের সমন্বিত কোনো অধ্যয়ন নেই। পঞ্চাশোর্ধ বাংলাদেশে এ বিয়য়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ গুচ্ছ

শিক্ষাঙ্গণের নানা সংস্কার ভাবনা

কোভিড-১৯ : শিক্ষা ক্ষতি-পুনরুদ্ধার ভাবনা

এক

কোভিড-১৯ কম-বেশি সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ ক্ষতির বিস্তার থেকে কেউ নিস্তার পায়নি। ধনী-দরিদ্র, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ-এর কোনো দেশ-জাতি কারও রেহাই ছিল না। এখনও সে ক্ষতির প্রক্রিয়া ও প্রভাব পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তবে বেশির ভাগ দেশ ও জাতি সে ক্ষতি কাটিয়ে উঠছে এবং ক্ষতি পোষাবার নিত্য-নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করছে। যে ক্ষতি কখনও পূরণযোগ্য নয় তা হচ্ছে 'জীবন দিয়ে' যারা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন সে ব্যক্তি মানুষ। তার পরিবার-পরিজন যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন তা কোনোদিন পূরণ হবার নয়। যে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা মূলত 'জীবিকা'র ক্ষতি। জীবন মানে সংগ্রাম, তাই জীবিতদের জীবিকার সংগ্রাম থেমে নেই। আমাদের আজকের ভাবনা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও করোনাকালে শিক্ষার ক্ষয়-ক্ষতি ও তার পুনরুদ্ধার ভাবনা নিয়ে। শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোগত বিষয় আজকের এ আলোচনায় খুব বেশি আসবে না।

শিক্ষা ক্ষতি বা শিক্ষা ব্যবস্থার লাভক্ষতি সাধারণত অর্থ মূল্যে হিসেব করা হয় না। তাই বলে এটি মূল্যহীন, তা কেউ বলবে না। নীতি কথায় বলে, 'বিদ্যা অমূল্য ধন'। একজন বিদ্যার্থীর অর্জিত বিদ্যার অর্থমূল্য কত তা নিরূপণে সমস্যা থাকলেও বিদ্যা-শিক্ষা ব্যবস্থার পিছনে সরকার, বিদ্যার্থীর পরিবার ও বিদ্যার্থী নিজে, সমাজ-রাষ্ট্র সবারই বিপুল আর্থিক ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত। ভিন্নভাবে বললে বলতে হয়, শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের উন্নয়নের প্রাথমিক সিঁড়ি। এ সিঁড়ির একটি ধাপ উন্নয়নের এক একটি সোপান। অর্থ বা আর্থিক লাভক্ষতির বাইরেও শিক্ষার উন্নতি ও উৎকর্ষতা মানে জাতির সামগ্রিক উন্নতি। আবার শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বিরাট 'কর্মসংস্থান কারখানা' (employment industry), এটি বহু নারী-পুরুষের পেশা বা বৃত্তি। এখান থেকে তাঁরা জীবিকা আহরণ করেন। অনেকের জন্য এটি আবার একটি ব্যবসা, তারা নানা শিক্ষা সামগ্রীর যোগান দেন। তারা ব্যবসা করেন এবং মুনাফা করেন। আবার আজকাল অনেকের জন্য এটি রাজনীতির সস্তা মাঠও বটে। কম খরচে কর্মী সংগ্রহ করে এবং নানা পদ-পদবির সোপান বা সিঁড়ি হিসেবে শিক্ষাঙ্গনকে ব্যবহার করেন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের দুইটি মন্ত্রণালয়, অনেক দপ্তর-অধিদপ্তর-বোর্ড, অসংখ্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদ্যার্থী, বিদ্যার্থীর পরিবার, শিক্ষক-কর্মচারী, ব্যবসায়ী, লেখক-প্রকাশক নিয়ে কোটি কেটি মানুষ এ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এটিকেই সাধারণভাবে

‘শিক্ষা ব্যয়’ বলে ধরে নেওয়া হয়। যদিও এটি আসলে শিক্ষা ব্যয়ের সামগ্রিক চিত্র নয়। এটি মূলত সরকারের ব্যয় এবং শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত অন্যান্যদের আয়। শিক্ষায় কার সংশ্লিষ্টতা কীভাবে হয় তা নিরূপণ না হলে ক্ষতি নির্ণয় সম্ভব হবে না। তাই প্রথমে কার কার কী ক্ষতি হলো সেটি বুঝা দরকার। সব ক্ষতি পূরণীয় বা পূরণযোগ্যও নয়। সব ক্ষতি পূরণ প্রচেষ্টা সম্ভব ও সঙ্গত কোনোটাই নয়। এখানেও আবার প্রত্যক্ষ ক্ষতি এবং পরোক্ষ ক্ষতির বিষয়টিও রয়েছে।

‘শিক্ষা’ একটি সাধারণ প্রত্যয় বা ধারণা হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এক ও অভিন্ন কোনো বিষয়বস্তু বা কর্মকাণ্ড নয়। এখানে নানা বিভাজন, নানা অংশীজন। সরকারি-বেসরকারি, বাংলা-ইংরেজি, ধর্মভিত্তিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ (মাদ্রাসা ও স্কুল), শহর-গ্রাম, স্তরভিত্তিক যথা — প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা তথা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা, অতি উচ্চশিক্ষা এবং সবশেষে দেশের শিক্ষা ও বিদেশের শিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়াদি বিবেচনায় আসবে। দেশে কোনো দুর্যোগ হলে সাহায্য-সহায়তার জন্য ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ তালিকা করা হয়। দীর্ঘতালিকায় নিহত-আহত মানুষ, বাড়িঘর, গাছপালা, গবাদি পশু, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল ইত্যাদি স্থান পায়। এখানে শিক্ষাক্ষতির সে রূপ কোনো তালিকা প্রাসঙ্গিক নয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ততার প্রকার-প্রকৃতি, গভীরতা ও ব্যাপ্তি বুঝা প্রয়োজন।

কারণ এখানে বস্তুগত ও অবস্তুগত নানা প্রকার ও প্রকরণের ক্ষতি যুক্ত আছে। এখানে জড়িতদের মধ্যে যেমন আছে প্রতিষ্ঠান, তেমনি আছেন ব্যক্তি পেশাজীবী, বিদ্যার্থী, বিদ্যার্থীর অভিভাবক, বিদ্যা দান ও গ্রহণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত শিক্ষকগণ, সরকার, সমাজ, দেশ সবার ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থ। সব ক্ষতিকে একসাথ করে পুনরুদ্ধারের বিষয় চিন্তা করলে ‘শিক্ষা ক্ষতি’ মানে এক কথায় প্রথমে আসবে বিদ্যার্থী বা ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার ক্ষতি ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর জীবনের দুটি বছর সময়কাল অতিক্রান্তের বিষয়। তারপর দ্বিতীয় স্থানে আসতে পারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা সরকারি ভর্তুকি নিয়ে নয়, শিক্ষার্থীর বেতন নির্ভর তাদের ভিত ধসে পড়া এবং শিক্ষকদের কর্মচ্যুতি। ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া ও পেশাদার শিক্ষকদের পেশা পরিবর্তন। তৃতীয় স্থানে সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচ্য ব্যাপকহারে শিক্ষার্থী ‘ঝরে পড়া’, শিক্ষার্থীদের পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়া, না পড়িয়ে উচ্চ শ্রেণিতে প্রমোশন, শিশুশ্রম ও মেয়েদের বাল্যবিবাহসহ আনুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয়।

প্রথমে সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকাল বা সময় নষ্ট হওয়াটা বা পাঠ পিছিয়ে পড়া সর্বজনীন। এ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকের নিম্নের দুটি স্তর তথা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক এবং তার উপরের (উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উচ্চ শিক্ষা) স্তরগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মাধ্যমিকের

উপরের স্তরের যে শিক্ষা সময়ের ক্ষতি এবং পাঠ পিছিয়ে পড়া তা বিশেষ ব্যবস্থায় কিছুটা পূরণযোগ্য হলেও প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে তা খুব একটা সহজ কাজ নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দরিদ্র পিতামাতার সন্তানদের ক্ষেত্রে তা আরও অনেক জটিল। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের মধ্যে একটি বড় অংশ পেশা থেকে ছিটকে পড়েছে। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত ধসে গেছে, কিম্বা উদ্যোক্তা তার বিনিয়োগ নিয়ে সরে পড়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীগণ করোনাকালীন সময়ে নিয়মিত বেতন-ভাতা সবই পেয়েছেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে যারা শিক্ষার্থীর টিউশন ফি নির্ভর তাদের বেতন, বিদ্যালয়ের বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎ বিলসহ আন্যান্য ব্যয় নির্বাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধের উপক্রম হয়। সরকারি বেতন পেয়েও দীর্ঘদিন কর্মহীন অবস্থায় থেকে অনেকের শিক্ষাদান অভ্যাস নষ্ট হয়েছে। অনেকে অতিরিক্ত কোচিং বা টিউশন করিয়ে অন্যরকম একটি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনলাইন ব্যবস্থার সুযোগে বা সুবাদে সেল ফোন কেন্দ্রিক নানা বদ অভ্যাস জন্ম নিয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। তাতে তারা পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। গ্রামশহর সর্বত্র গরিব ছাত্রদের একটি অংশ কাজে ঢুকে পড়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। কোভিড পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থায় সকল স্তরে তাই অনেক কিছুই ভেবে চিন্তে করতে হবে। অনলাইন বা দূরশিক্ষণ প্রায়ই সুফল দেয়নি। দধির স্বাদ ঘোলে যতটুকু মিটানো সম্ভব, তাও মিটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দূরশিক্ষণে তুলনামূলকভাবে ভালো করেছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রথমে কোনো উদ্যোগই নেয়নি। পরে যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তাও ছিল দায়সারা গোছের। তবে সার্বিক বিবেচনায় দূরশিক্ষণ কার্যক্রম যা করোনার কারণে হাতে নেওয়া হয়, তাতে সবাই একটি নতুন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। ভবিষ্যতে স্বাভাবিক ও সংকট উভয় কালে এ পদ্ধতি ব্যবহারের পথটি উন্মুক্ত হলো।

বর্তমান আলোচনায় ক্ষতি পোষাণোর ক্ষেত্রে প্রথমে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও পরে মাধ্যমিক স্তরের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হবে। আমার ধারণা এ দুই স্তরের ক্ষতি অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। প্রথমে প্রাথমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের তথ্যগত বিষয়টি দেখা যাক।

শিক্ষালয় ও তার ধরন	বিদ্যায়তনের সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী (ছেলে মেয়ে)
সরকারি (তিনটি ধরন)	৬৩,০৪১	৪,১০,৯৪২	২,২২,০২,১৭৫
বেসরকারি (ধরন ১৫)	৪৪,৪৭৪	৩,৫১,০৪৭	৭২,৬৪,৬৮৮
মোট	১,০৭,৫১৫	৭,৬১,৯৮৯	২,৯৪,৬৬,৮৬৩

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় তিন কোটি শিক্ষার্থী, সাড়ে সাত লাখের উপর শিক্ষক বা শিক্ষিকা ও এক লাখ সাড়ে সাত হাজার প্রতিষ্ঠান। তিন কোটি শিক্ষার্থীর প্রায় দুই বছর (মার্চ ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২) ধরে শিক্ষা সময়ে সরাসরি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথসক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ। সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে সীমিত ক্লাস চালু চেষ্টা করা হলেও কিছুদিন পর তা আবার বন্ধ হয়। পাঁচ বছর বয়সকে বর্ণ পরিচয়ের সূচনা বছর ধরলে ২০১৯ এ যে শিশুর বয়স ছিল পাঁচ, সে শিশুটির বয়স ২০২২-এ হয় সাত। ৬ বছর থেকে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর সময়কাল নির্ধারণ করলে সে শিশুর বয়স আট হওয়ার পরও সরাসরি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হলো না। আবার যারা স্কুলে নানা শ্রেণিতে ছিল, তারাও শিক্ষকের সরাসরি কোনো পাঠ কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেনি এবং তারা ২০২২-এ পূর্ব পাঠ মনে করতে পারে না। মা-বাবা বা অভিভাবক এ সময়ে এ শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কতটুকু পারিবারিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। এ ক্ষতির জন্য কেউ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়ী নয়। তবে দায় এখন, সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সবার এবং সবাইকে এ দায়িত্বের ভাগ নিতে হবে। এ দায় কীভাবে মিটানো হবে সে বিষয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এখানে আরও একটি বিষয় ভুলে যাওয়া চলবে না যে, শিক্ষা ক্ষতি সবার সমান নয়, অনুন্নত ও আদিবাসী এলাকা, চর, হাওড়, পাহাড়, গ্রাম, শহরতলী ও শহর, ধনী-দরিদ্র সবাই একভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নয়। তাই এক ও অভিন্ন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা হবে অন্য রকম ভ্রান্তি। এসব কিছু মাথায় নিয়ে একটি সুচিন্তিত কর্ম পরিকল্পনা প্রয়োজন।

এ ক্ষতি পুরোপুরি পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে কি-না জানি না। তবে ক্ষতি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে কর্মঘণ্টা অর্থ্যাৎ শিক্ষার্থী-শিক্ষকের কনটাক্ট আওয়ার বৃদ্ধি করতে হবে। বছরের নির্ধারিত কিছু ছুটি কমাতে হবে। বিশেষ পাঠের কিছু বিষয় যেমন—গণিত, ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি এবং ক্ষেত্র বিশেষে আরবি) এবং বিজ্ঞানে বিশেষ জোর দিতে হবে। এ জন্য সরকারের দিক থেকে বর্ধিত বাজেট এবং মনিটরিং প্রয়োজন হবে। শিক্ষকদের বর্ধিত সময়ে কাজ করার জন্য কিছু প্রণোদনা এবং বেসরকারি বিদ্যায়তনের পুনর্বাসনে সরকারের এককালীন অনুদান প্রয়োজন হবে। বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য আপদকালীন সময়ের বেতন সহায়তা দানের বিষয়টিও অগ্রাধিকার পেতে পারে। এটি বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা উভয়ের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে। শুধু সকল মনোযোগ পঠন-পাঠন দিয়ে করোনা পরবর্তী কালে মানসিকভাবে শিক্ষার্থীর ওপর অতিরিক্ত নতুন চাপ সৃষ্টি নয়। মানসিক, শারীরিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, বিনোদন ও সুস্থ সামাজিকীকরণের সহ-শিক্ষা কার্যক্রমসমূহেরও ভারসাম্যপূর্ণ সংযোগ করতে হবে।

প্রাথমিকের দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষতির প্রশ্নে সবচেয়ে বিপন্ন ব্যবস্থা হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার। 'প্রাথমিক শিক্ষা যদি হয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি, মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে

তার মেরুদণ্ড।' প্রাথমিক শিক্ষায় সঙ্গত কারণে সরকারি বিনিয়োগ সর্বাধিক হলেও মাধ্যমিকে সরকারি বিনিয়োগ ও মনোযোগ সবচেয়ে কম। দেশের পুরো মাধ্যমিক শিক্ষা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ত্যাগ ও বেসরকারি বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল।এখন এই সংকটকালে এখানে সরকারের কার্যকর মনোযোগ প্রয়োজন। নিম্নে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছু তথ্য পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপিত হলো—

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

বিদ্যালয়ের ধরন	বিদ্যালয় সংখ্যা	শিক্ষক শিক্ষিকা	ছাত্রছাত্রী	মন্তব্য
সরকারি	৬৭৯	-	-	পৃথকভাবে জানা সম্ভব হয়নি
বেসরকারি	১৯,৫০০	-		ঐ
মোট	**২০,১৭৯**	**২,৫২,৫০৫**	**১,০৩,৪৯,৩২৩**	
দাখিল ও আলিয়া মাদ্রাসা	দাখিল - ৬০০/ আলিয়া-৯৩১৯ (২০১৫)	জানা নেই	আলিয়া- ২৪,০৯৩৭৩ (২০১৫)	এ তথ্যটি আরও নিশ্চিত হতে হবে।
কওমী মাদ্রাসা	১৪০০০	৭,৩৫১	১৩,৯৮,২৪৫	ঐ
মোট	**৪৩,৪৯৮**	**২,৫৯,৮৫৬ আলিয়া বাদে**	**১,৪১,৫৬,৯৪১**	**ঐ**

নোট : মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা ব্যবস্থার চিত্রটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এখানে হয়ত একটি সাধারণ প্রবণতা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সঠিক তথ্যগত ভিত্তি তৈরির বিকল্প নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলাদেশে নানাভাবে অবহেলিত। এটির সিংহভাগ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত। সরকার এমপিও ব্যবস্থায় বেতন সহায়তা এবং ক্ষেত্র বিশেষে নানা প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ ও উপকরণ দিয়ে সহায়তা করেন। এখানে প্রকট দক্ষ শিক্ষক সংকট। সরকার নানা উদ্যোগ নিয়ে সিলেবাস, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করেন, কিন্তু স্কুলসমূহে পাঠদানের উপযুক্ত শিক্ষক আছেন কি না সেটি না দেখা হলে শিক্ষকের অভাব পূরণ হয় না। প্রতি বছর প্রায় ২২ থেকে ২৫ লাখ পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। পরীক্ষার আগে ৩৬.৭৩ শতাংশ এবং পরীক্ষায় ফেল করে বা খারাপ ফলাফল করে আরও ৫ বা ১০ শতাংশ ঝরে পড়ে। কোভিডের পর সে পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি খারাপ। এখানে সরকারের বর্ধিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। গণিত এবং ইংরেজি এ দুটি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পূরণ না

করলে শিক্ষার নিম্নগামী মান কোনোভাবে বাড়ানো সম্ভব হবে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ৩০-এর মধ্যে আনতে হলে প্রাযোজন, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ। এ পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। গণিত, ভাষা (ইংরেজি ও বাংলা) এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় একটা উত্তরণ দরকার তার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম প্রয়োজন হবে। এ দেশে ভাষা শিক্ষাকে এমন একটা পর্যায়ে উত্তরণ ঘটাতে হবে যাতে সাধারণ স্কুলে পড়ে উন্নত মানের বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিখতে পারে। এ জন্য যাতে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়। গণিত ছাড়া উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষতা সম্ভব নয়, তাই গণিতের ভিত নিচ থেকে মজবুত করতে হবে। ভাষার সাথে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষা ধীরে ধীরে গুরুত্বের সাথে বাড়াতে হবে।

বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা কমিটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দক্ষ স্কুল পরিচালনার সহায়ক নয়। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রধান শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে স্বচ্ছ ও উপযুক্ত নীতিমালা প্রয়োজন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের উপর প্রধান শিক্ষকের আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। স্কুলের অভ্যন্তরীণ পাঠদান, পাঠ গ্রহণ ও অ্যাকডেমিক বিষয়ে কমিটির অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে শিক্ষকদের রক্ষা করতে হবে। দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় কোনো উদ্যোক্তা লাভ, মুনাফা, ডিভিডেন্ট, সম্মানী হিসেবে নিতে পারবে না। এ আয় শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে। এ বিষয়ে কঠোর আইন ও আইনের প্রয়োগ দরকার।

মাধ্যমিক স্তরে করোনা ক্ষতি পুনরুদ্ধারে পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকদের করণীয় নির্ধারণের জন্য দরকার সরকারি উদ্যোগে দ্রুত একটি স্টাডি এবং আগামী জাতীয় বাজেটে সে অনুযায়ী নতুন বরাদ্দ নীতিমালা। সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানরত সকল স্কুল ও মাদ্রাসার গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষকের অবস্থা, সংখ্যা ও মান নিরূপণ করা দরকার। আগামী অর্থবছর (২০২৩-২০২৪)-এর মধ্যে এসব বিষয়ের শূন্য পদসমূহ পূরণের এবং শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা অবলোকন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন অতিদ্রুত একটি কর্ম পরিকল্পনা।

দুই

দেশে উচ্চশিক্ষা আজ নানামুখী সংকটে নিপতিত। এখানে যোগ্য শিক্ষকের অভাব দেখি না, দেখি নীতি-নৈতিকতার অবনমন। রাজনৈতিক দলের সংযোগ, প্রত্যক্ষ

দলবাজি এবং স্বার্থ দলের কারসাজি। সরকারি কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মান প্রত্যাশা অনুযায়ী না থাকার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। এখানে চারটি বিয়য়ে নজর দিতে হবে—

১. আসন সংখ্যা নির্ধারণে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১ : ৩৫-৪০ এর বেশি কোনো ক্রমে সমীচিন নয়।
২. ঢালাও সরকারিকরণ ও ঢালাওভাবে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিচার না করে নতুন বিভাগ খুলে দেওয়া প্রতিহত করতে হবে।
৩. প্রিন্সিপাল ও ভাইস-প্রিন্সিপাল নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নীতিমালা অনুসরণ।
৪. শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির প্রভাব হ্রাসের ব্যাপরে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য।
৫. শিক্ষকদের পদায়ন, পদোন্নতি ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগে দক্ষতা, যোগ্যতা ও ন্যায্যতার নীতি অনুসরণ। বেসরকারি কলেজসমুহের ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ঠেকাতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষকদের মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষকতা ও পূর্ণকালীন রাজনীতি ও ব্যবসা করা অনেক শিক্ষক বেসরকারি কলেজগুলোতে থাকেন, ঐ সব পরিহার করতে হবে। রাজনৈতিক নানা তদবিরে প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা যাবে না। পরিচালনা কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধির ছদ্মাবরণে রাজনীতির লোকদের পদায়নও বন্ধ করতে হবে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শুধু তিনটি কথা বলব—

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইনকাঠামো পর্যালোচনা করে উপাচার্যসহ সকল নিয়োগে পেশাদারিত্বকে প্রধান্য দিলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
২. বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এত নির্বাচন কতটুকু সঙ্গত তা ভেবে দেখতে হবে।
৩. স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের সুরক্ষা চাইলে শিক্ষকদের নিজ নিজ কর্মের আত্ম-মূল্যায়নের বিকল্প নেই।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা বলতে গেলে—

১. উদ্যোক্তাদের ব্যবসা, বিনিয়োগ ও মুনাফা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার বা আত্মীয় দিয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।
২. শিক্ষক ছাত্র অনুপাতকে মানদণ্ড ধরে ছাত্রভর্তির সীমা নির্ধারণ করতে হবে।
৩. সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশান 'ফি'র মধ্যে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মালিক' নন,

ট্রাস্টি–এ দর্শনটা বুঝতে হবে।

পরিশেষে সরকারি–বেসরকারি নির্বিশেষে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন ও সুশাসনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

তিন

উপসংহারের বক্তব্যে করোনা পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে সামনে রেখে আমরা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্ষতি পোষানোর উপযোগী বাস্তব পদক্ষেপ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ভবিষ্যতে অনেক বেশি সরকারি মনোযোগ ও বিনিয়োগের আশা করব। এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে পৃথিবীর সকল জাতির সাথে একমত হয়ে আমরা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ' (Sustainable Development Goals) অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে অঙ্গীকারের মূল প্রমিজ 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়', সকলে মিলে সকলের জন্য উন্নয়ন' সুনিশ্চিত করতে হবে। পূর্ববর্তী দশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসাযোগ্য সফলতা দেখিয়েছিল। আমরা দৃঢভাবে বিশ্বাস করি, ২০৩০-এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইতিমধ্যে যে সব পদক্ষেপ বাংলাদেশ নিয়েছে, তা আশাপ্রদ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চার নম্বর লক্ষ্যটিই হচ্ছে শিক্ষায় উৎকর্ষতা অর্জন। কোভিডের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি যতটুকু ব্যাহত হয়েছে তা পূরণ করে শিক্ষায় একটি নতুন গতি সঞ্চার করা সম্ভব হবে। আগামী একটি দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতাকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াই হোক আমাদের সবার অঙ্গীকার।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল : কিছু প্রশ্ন

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক–এ তিনটি পর্যায়ে গত ২০ বছরে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। ইতিমধ্যে সূচিত পরিবর্তনসমূহ এককথায় যুগোপযোগীই শুধু নয়, যুগান্তকারী এবং বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই কার্যকর ও স্থিতিশীল রূপ লাভ করেছে। বিশেষত পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও একাদশ শ্রেণি পর্যায়ের সব পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবন্ধন, পরীক্ষাপদ্ধতির আধুনিকায়ন, অনলাইনে ফলাফল প্রকাশ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের ব্যয় এবং ভোগান্তি কমিয়েছে। তাছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সিলেবাস, পাঠদান, প্রশ্নমালা প্রস্তুত, পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি এবং দ্রুততম সময়ে ফলাফল প্রকাশ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। তাছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষাবিহীন ভর্তি নীতিমালাও একই রকমভাবে কোচিং সেন্টারের উৎখাত ও ছোটাছুটির ভোগান্তি কমাতে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু ভালো এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ধীরে ধীরে নতুন করে কিছু কায়েমি স্বার্থবাদিতা, দুর্নীতি, অনিয়ম এবং নাগরিক অধিকার ও সাংবিধানিক সমতার নীতি লঙ্ঘনের বিষয় ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে জনমনে কিছু প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে। এ প্রশ্নগুলোর আলোকে সতর্কতার সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক। প্রয়োজন সতর্ক সংশোধন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পুরো কার্যক্রমের সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং। একটি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। এরমধ্যে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা একটি অন্যতম উপাদান। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, পরীক্ষার্থীদের দেওয়া নম্বরপত্র বা নম্বর ফর্দে (ট্রান্সক্রিপ্ট) একটি ফাঁক থেকেই যাচ্ছে, যে ফাঁক থাকার কারণে তা ভর্তি ও বৃত্তি দুটি ক্ষেত্রে বৈষম্য, অসাধুতা ও দুর্নীতির অবকাশ সৃষ্টি করছে। তাছাড়া তিন বছর ধরে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির নীতিমালায় কিছু অন্যায্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা দেশের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। এই তিনটি দিকের একটি বিষয় পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই। বাকি দুটি বিষয় পরবর্তী লেখায় তুলে ধরব। আলোচ্য বছরের ২০১২-২০১৩ এসএসসি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে ১৫ মার্চের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং ৯ মে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রায় ৪৩ দিনব্যাপী নেওয়া পরীক্ষার ফলাফল দুই মাসের কম সময়ে প্রকাশ করা হলো। এ গতি ও ক্ষিপ্রতা অবিশ্বাস্য এবং তা কয়েক বছর ধরেই রক্ষা করা হচ্ছে। দিন দিন দক্ষতা আরও বাড়ছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০টি বোর্ড মিলে সর্বমোট ১২ লাখ নয় হাজার ৭০৩ জন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রায় ২৭ হাজার ৭২টি, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭৪ জন এবং সম্মিলিতভাবে পাসের হার ৮৯ দশমিক ০৩ শতাংশ।

এরমধ্যে সর্বোচ্চ গ্রেড জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯১ হাজার ২২৬ জন। গ্রেড প্রথা প্রথম যখন চালু হয়, ২০০১ সালে সে সময় এ সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭ জন। ১২ বছর বা এক যুগের ব্যবধানে এ ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন, তা-ও অবিশ্বাস্য বৈকি। সব ইতিবাচকতাকে মনে রেখেও যে প্রশ্নগুলো জনারণ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, সেগুলো কিছু নিচে আলোচিত হলো—

১.১ প্রতিটি উত্তরপত্রের মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৪০ নম্বর বরাদ্দ এমসিকিউয়ের জন্য। এ ৪০ নম্বরের 'এমসিকিউ' সামগ্রিক ফলাফলের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এখানে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা বা শৈথিল্যের সঙ্গে এমসিকিউ অংশে অধিক নম্বর প্রাপ্তির একটি যোগসূত্র রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক, পরিদর্শক এবং ব্যবসায়িক বা মুনাফাশিকারি কিছু বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের যোগসাজশে কোনো কোনো কেন্দ্রে নাকি ২০ মিনিটের মধ্যে প্রায় সব পরীক্ষার্থীই উত্তরপত্রে এমসিকিউ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। এ-জাতীয় ঘটনার কোনো রিপোর্ট বোর্ড বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় পেয়েছে কি না জানি না। কিন্তু বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এমসিকিউয়ের কারণে উত্তরপত্র পরীক্ষণ এবং ফলাফল প্রকাশ দ্রুততর হয়, কিন্তু এ ব্যবস্থা যদি মেধা যাচাইয়ে বিরূপ প্রভাব ফেলে, তাহলে এ ক্ষেত্রে নতুনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মেধাবীরা স্বাভাবিকভাবেই সৃজনশীল অংশে মেধার স্বাক্ষর রেখে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত স্থানে হয়তো উপনীত হন। কিন্তু এখানে ধানের সঙ্গে চিটা একই দরে বিক্রির জন্য বাজারে আসার সুযোগ সৃষ্টি যেমন হচ্ছে, অপরদিকে একশ্রেণির অসাধু 'শিক্ষা ব্যবসায়ী' ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে কি-না, খতিয়ে দেখতে হবে। তাই এমসিকিউয়ের অপব্যবহারের প্রবণতা বন্ধে যথার্থ মনোযোগ দাবি করে।

১.২ দ্বিতীয় আরেকটি দুর্বলতা, যা ক্ষমার অযোগ্য, তাহচ্ছে 'ব্যবহারিক পরীক্ষা' গ্রহণ এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে কিছু শিক্ষক বা পরীক্ষকের অসাধুতা। 'ব্যবসায়িক' বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের চরম অনৈতিক ও অসাধু তৎপরতার কারণে কোনো কোনো পরীক্ষাকেন্দ্রে বিজ্ঞানসহ অন্য যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেখানে কোনো কার্যকর 'কোয়ালিটি কন্ট্রোল' বা উৎকর্ষ-অপকর্ষ ও মেধা যাচাই হয় না। ঢালাও নম্বর দেওয়ার প্রবণতা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কীভাবে আরও সতর্কতা ও বস্তুনিরপেক্ষভাবে মেধা মূল্যায়ন করা যায়, সে বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে যা চলছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে, বিজ্ঞান শিক্ষাকে উৎসাহিত করা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। অনেক বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে সঠিক মানের বিজ্ঞান পরীক্ষাগার নেই। নেই যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক উপকরণ, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং আবার যা আছে তারও যথাযোগ্য ব্যবহার নেই। কিন্তু বিজ্ঞানসহ ব্যবহারিক সব পরীক্ষার পাইকারি নম্বর প্রায় ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীই পেয়ে থাকে এবং তা-ও

আবার ৯০ শতাংশের কম নয়। এটি পরীক্ষার সামগ্রিক ফলাফলে বিরাট ব্যবধান ঘটিয়ে দেয়। কোনো কোনো বিদ্যালয় ও কেন্দ্রে হোম ইকোনমিকস, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান এসবের কোনো ব্যবহারিক ক্লাস ছাড়াই নম্বর দেওয়া হয়। সব ধরনের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে কোচিং-বাণিজ্য ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের একটি আঁতাতও খুঁজে পাওয়া যায়।

১.৩ অন্য আরেকটি বিষয় ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে বলে বিভিন্ন বোর্ড সূত্রে জানা গেল, তা হচ্ছে বোর্ডগুলোর মধ্যে ফলাফল ভালো করার অশুভ প্রতিযোগিতার ঘাতক ব্যাধির নীরব বিস্তার। বোর্ড থেকে পরীক্ষকদের প্রতি সদয়ভাবে খাতা দেখার একটি অলিখিত নির্দেশ নাকি থাকে। কোনো বিশেষ বিষয়ে পাস নম্বরের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০-১২ নম্বরও গ্রেস দিয়ে পাস নম্বরের সীমায় উত্তীর্ণ করানো এবং মোট প্রাপ্ত নম্বরের ওপর একটি নির্দিষ্ট নম্বর (৫-১০ শতাংশ) যুক্ত করার অলিখিত নিয়ম (অনিয়ম বলাই শ্রেয়) অনুসরণ করা হয়। চলতি বছরের ফলাফলে ১০টি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার এ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে। ঢাকা ৮৭ দশমিক ৩১, রাজশাহী ৯৪ দশমিক ০৩, চট্টগ্রাম ৮৪ দশমিক ৪৮, সিলেট ৮৮ দশমিক ৯৬, কুমিল্লা ৯০ দশমিক ৪১, যশোর ৯২ দশমিক ৬২, দিনাজপুর ৯২ দশমিক ৬০, বরিশাল ৮৮ দশমিক ৬৩, মাদ্রাসা ৮৯ দশমিক ১৩ এবং কারিগরি ৮১ দশমিক ১৩ শতাংশ। ৯৩ থেকে ৯৪ শতাংশই যদি উত্তীর্ণ হলো, বাকি বেচারা বঞ্চিত কেন? দেশ ও জাতি শতভাগ পাসের রেকর্ড করে নিতে পারে। কিন্তু ৯১ হাজার ২২৬ জনের জিপিএ-৫ পাওয়াটায় গুণমান নিয়ন্ত্রণে শিথিলতার অভিযোগ অস্বীকারের সুযোগ কম। এ বিষয়ে সরকার, বোর্ড ও পরীক্ষকসহ সব মহলকে আরও স্বচ্ছ হতে হবে নিঃসন্দেহে। কারণ, এই সর্বোচ্চ গ্রেড পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই ভর্তি পরীক্ষায় সদ্য সমাপ্ত পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের তুলনায় নিষ্প্রভ দেখা যাচ্ছে। কোথায় জানি একটি গলদ। যে কারণে হয়তো ঢাকার নটরডেম কলেজ পরীক্ষাবিহীন ভর্তি নীতিমালার বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে গিয়েছে। মূল প্রশ্ন হচ্ছে, অধিকসংখ্যায় পাস করুক এবং সে পাস শতভাগে উন্নীত হোক—এটিই আমাদের একান্ত কামনা। কিন্তু তা মূল্যায়ন-পদ্ধতির অপব্যবহার করে কোনোভাবেই নয়। এসএসসি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষা। এখানে ফাঁকফোকর বন্ধ করতে হবে। ফলাফলের ক্ষেত্রে আপাতত শেষ বক্তব্য হচ্ছে, ফলাফলের উৎকর্ষ অর্জনকারী সারা দেশের ২০টি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে অবস্থিত। শতভাগ পাস ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিসহ যে কোনো মানদণ্ডে ঢাকা শহর সবার শীর্ষে। ঢাকা শহরেরও অবশ্য চেনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। তাহলে সামগ্রিক শিক্ষার মান ও অগ্রযাত্রায় আমাদের সন্তুষ্টির অবকাশ কোথায়? গ্রাম-শহর নির্বিশেষে ২৭ হাজার ৭২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম সমতার লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যেও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উপকরণ সরবরাহ, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো—এসব ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়, কিন্তু সরকারি কলেজ ও স্কুলে শিক্ষকদের পদায়ন, বিশেষত প্রধান শিক্ষক পদায়নে দলীয় বিবেচনা, বেসরকারি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে দলীয় বিবেচনা ও ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক শিক্ষকতাকে সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে গণ্য করেন না, তাঁরা রাজনীতি, ব্যবসা, কোচিং—এসবে অধিক সময় দেন। একজন শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত সময়ে যাই করুন, কিন্তু পাঠদান, পরীক্ষ গ্রহণ, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে যাতে যথাযথভাবে দায়িত্বান হন, সে বিষয়ে মনিটরিং ব্যবস্থাকে অধিকতর জোরদার করা প্রয়োজন। পরবর্তী লেখায় ফলাফলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ভর্তি নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করব।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ফলাফলের স্বচ্ছতা ও ভর্তির নীতিমালা

১১ জুলাই (২০১৩) এক লেখায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এরই সূত্র ধরে বর্তমান লেখায় পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ভর্তির নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। শিক্ষার্থীকে দেওয়া ফলাফলে প্রয়োজন অধিক স্বচ্ছতা এবং এসএসসি ও এইচএসসির সনদ এবং নম্বর ফর্দ (ট্রান্সক্রিপ্ট) বিষয়ে একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। তা হচ্ছে, নম্বর ফর্দ বা নম্বরপত্রে শুধু গ্রেড উল্লেখ থাকে। যেমন—আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, বর্তমান ব্যবস্থায় ৮০-১০০ নম্বরের মধ্যে যে যতই পাক, তাকে এ+ হিসেবে ধরা হয়। আর ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর যুক্ত না হয়েও যারা ওই স্তরে উপনীত হয়, তারা সুবর্ণবালক বা বালিকার (Golden A+) সনদ পায়। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কে কত প্রকৃত নম্বর পেল, সেটি তারা কোনো দিনই জানতে পারে না। এটি শুধু সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কম্পিউটার শাখা বা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসই জানে। এখানে বিভিন্নভাবে একজন পরীক্ষার্থীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। এক. একজন পরীক্ষার্থী তার প্রকৃত অর্জন জানতে পারে না, এটি জানতে পারা তার অধিকারের অন্তর্গত। তথ্য অধিকার আইন এখানে ভঙ্গ হচ্ছে। দুই. যেহেতু ব্যবধানের আওতা ২০ নম্বরের, তাই একই গ্রেডভুক্তদের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা হলে ৮০ নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রী এবং ৯৫ নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যকার এ ব্যবধানকে মূল্যায়ন করা হলো না। তিন. ভর্তি ও বৃত্তিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখানে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বা অর্জন গুরুত্ব পাচ্ছে না। বিশেষত, ভর্তি তালিকা তৈরিতে গ্রেডের ভেতরে ২০ মার্কসের যে একটি রেঞ্জ, সেটি নিয়ে কারসাজি করার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্টে গ্রেডের পাশাপাশি নম্বরের উল্লেখ করে দেওয়া। তার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে একই গ্রেডে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিষয়ভিত্তিক এবং মোট গড় নম্বরের তারতম্যকে ভরযুক্ত করে ভর্তি ও বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও অধিক মেধাবীর প্রকৃত মূল্যায়নে আরও একধাপ এগোনো যেতে পারে। তা ছাড়া একজন শিক্ষার্থীর গ্রেড জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ে তার প্রাপ্ত প্রকৃত নম্বর জানা আবশ্যক। ট্রান্সক্রিপ্টে নম্বরের উল্লেখ রাখা প্রযুক্তিগত দিক থেকে সহজ ও সম্ভব। শুধু নম্বর ফর্দে নতুন একটি কলামের সংযোজন মাত্র। বর্তমান সময়ে সব শিক্ষা বোর্ডের তথ্যপ্রযুক্তি শাখায় ফলাফল প্রকাশের বিষয়ে অহেতুক গোপনীয়তার আবরণ তৈরি করে অত্যন্ত অস্বচ্ছ ও স্বেচ্ছাচারী একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। তাই ফলাফল প্রকাশের পর প্রতিজন শিক্ষার্থীর নম্বর ফর্দ বা প্রাপ্ত নম্বর একটি পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার দাবিদার। অহেতুক গোপনীয়তা ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ সরকারকে পুনর্মূল্যায়ন করে দেখতে হবে।

একজন শিক্ষার্থী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত ফলাফলে মানবীয় ত্রুটি থাকতে পারে। এ ভুল ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত দুই রকমই হতে পারে। পরীক্ষাকালীন পরীক্ষক, পরবর্তীকালে টেব্যুলেশন, কম্পিউটার অপারেটর–যে কোনো স্তরেই তা হতে পারে। মানবীয় ভুলের কারণে কোনো শিক্ষার্থীর প্রাপ্য ফলাফল সন্দেহজনক হলে তাঁর বিরুদ্ধে একজন শিক্ষার্থী প্রতিকার পাওয়ার বিষয়টি বর্তমান সময়ে একরকম রুদ্ধই বলা যায়। উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষণ, নম্বর পুনর্গণনা ইত্যাদির পক্ষে রক্ষাকবচ তৈরির বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। সংক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীর অধিকার সংরক্ষণ ব্যতীত সুবিচার নিশ্চিত হয়েছে, তা বলা যায় না। যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে কোনো শিক্ষার্থী তার ফলাফল চ্যালেঞ্জ করতে চাইলে সে বিধান গুরুত্বসহকারে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। তা না হলে এখানে একজন শিক্ষার্থীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। ওপরে উল্লিখিত সব কটি বিষয়ে যে কোনো শিক্ষার্থী বোর্ডে আবেদন করে যথাযথ প্রতিকার না পেলে কিন্তু আদালতে যেতে পারে। এ বিষয় মাথায় রেখে ভবিষ্যতে নীতিমালাগুলো সংশোধন প্রয়োজন।

ভর্তি নীতিমালায় কোটা প্রথা সংবিধান লঙ্ঘনের সামিল

এ প্রবন্ধের শেষাংশে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ভর্তি নীতিমালার সুনির্দিষ্ট দুটি অংশ প্রত্যাহারের আবেদন করছি। আইনের দৃষ্টিতে এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভে সব নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ এ দেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। এ নীতিমালায়-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন রয়েছে। এ নীতিমালার আড়ালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধস্তন দপ্তরের কয়েক শত কর্মকর্তা-কর্মচারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদের একটি বিশেষ সুবিধাভোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠার অপতৎপরতাকে নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভর্তি নীতিমালায় কোটাপদ্ধতি বা আসন সংরক্ষণ বিষয়ে যে বিধান, বিশেষ করে মন্ত্রণালয়সহ অধস্তন সরকারি কর্মকর্তাদের পোষ্যদের জন্য ২ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সংবিধানের সমতা ও সমাজের অনগ্রসর জনগণের বিশেষ সুবিধা প্রদান নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কেউ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, অন্য কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুবাদে বিশেষ কোটায় ভর্তির সুযোগ নেওয়া সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। তাছাড়া বর্তমান সময়ে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের জন্য ৫ শতাংশ কোটাও পুরোপুরি যৌক্তিক নয়। ১৯৭১ সালে যিনি ১৭-১৮ বছরের কিশোর বা যুবক, তিনি এখন ৫৯ থেকে ৬১ বছর বয়সি। তাঁদের মধ্যে কারও কারও সন্তান এখন উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তিযোগ্য থাকতে পারে। তবে সে সংখ্যা দেশের মোট ভর্তিযোগ্য আসনের ৫ শতাংশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ-জাতীয় কোটা প্রথায় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা উপকৃত হন খুবই কম এবং এটি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতির প্রকৃত ক্ষেত্রও নয়। ভর্তিতে কোটা, চাকরি প্রাপ্তিতে কোটা, পদোন্নতি ও অবসরে কোটা — এগুলো সমাজের সামগ্রিক ভারসাম্য নষ্ট করে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি ও সম্মানের ব্যবস্থা করে অসচ্ছল, অক্ষম ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানজনক ভাতার বন্দোবস্ত করা যায়। তাই ভর্তিব্যবস্থায় এ-জাতীয় কোটা প্রথা রহিত হওয়া উচিত। তবে গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুযোগ-সুবিধাগত বৈষম্যের কারণে বিভাগীয় সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের বিভাগীয় শহরের মহাবিদ্যালয়ে আসন সংরক্ষণ করা যৌক্তিক। তাই অন্তত একটি বছর হয়তো মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং বিভাগীয় শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য কোটাব্যবস্থাটি বহাল রেখে পরবর্তীকালে ভর্তির নীতিমালায় কোটা প্রথা সম্পূর্ণ রহিত করা উচিত। বিশেষত, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর পোষ্যদের কোটা এই মুহূর্তেই প্রত্যাহার করা উচিত। এই নীতিমালার দ্বিতীয় আপত্তিকর স্থান হচ্ছে, কলেজ পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিধান (৭.২)। সরকারি কর্মকর্তার বদলির কারণে সংগতভাবে বদলি করা এলাকায় তাঁদের পোষ্যদের ভর্তির সুযোগ বাধা-বন্ধনহীন করা হোক। তাতে কোনো আপত্তি অবান্তর। কিন্তু শুধু সরকারি কর্মকর্তারাই কী বদলির চাকরি করেন বেসরকারি ব্যাংক-বিমার কর্মকর্তা-কর্মচারী, তাঁরাও তো বদলির চাকরি করেন। তাঁরা বদলি হলে তাঁদের পোষ্যরা কেন

সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন? একজন ব্যক্তির বাড়ি রংপুর হলে তিনি তো চট্টগ্রামে একটি বেসরকারি চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তিনি কেন সে সুযোগ পাবেন না। কাউকে সরকারি চাকরি প্রদান করার সময়, সরকার কী এমন কোনো চুক্তি করেছে যে সরকারি চাকরিতে অনুগ্রহপূর্বক যোগ দেওয়ার কারণে ভবিষ্যতে ফ্ল্যাট, প্লট, বাড়ি, গাড়ি, পোষ্যদের ভর্তি, চাকরি—সব ব্যাপারে আপনাকে সাধারণ একজন নাগরিকের তুলনায় বাড়তি কিছু অগ্রাধিকারভিত্তিক সুবিধা দেওয়া হবে। এ দেশে সেবা ও সুযোগের নিয়ন্ত্রণে যাঁরা আছেন, সে সুযোগটি তাঁরা প্রথমে গ্রহণের পর অন্যদের প্রশ্ন কেন আসছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরা বিধান করে পোষ্য কোটাব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছে। দেশের জাতীয় সংসদের সদস্যরা সরকারি প্লট বা জমি দরখাস্ত করলেই প্রাপ্তি নিশ্চিত। এখানে কোটার প্রশ্ন নেই। তারপর সরকারি কর্মচারী, বিচারপতি, আইনজীবী, সাংবাদিক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এভাবে সরকারি সম্পদ কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে আইন করে বণ্টন করা হচ্ছে, সাধারণের প্রবেশাধিকার সংকুচিত করেই। সুবিধাবঞ্চিত ও সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্য কোটা সৃষ্টির বিধান সংবিধানে রাখা হয়েছে, কিন্তু সুবিধাভোগীর জন্য আরও সুবিধা দান এবং সুবিধা সংরক্ষণ পুরোপুরি সংবিধানের লঙ্ঘন। আশা করি, ভবিষ্যতে নীতিমালার নামে এ-জাতীয় অনৈতিক পদক্ষেপ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিরত থাকবে।

ভর্তি নীতিমালায় পরীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত ভর্তির যে বিধান, সেটিকে চ্যালেঞ্জ করে নটরডেম কলেজ কর্তৃপক্ষ উচ্চতর আদালতে রিট আবেদন করেছে। উচ্চতর আদালত শুধু নটরডেম কলেজের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে আদেশ জারি করেছেন। আশা করি, মাননীয় আদালত ভর্তি নীতিমালার ৩.২ এবং ৭.২-এর অসাংবিধানিক বিষয়টি ও ছয় মাস পর পূর্ণাঙ্গ শুনানি বা রায়ের সময়ে বিবেচনায় গ্রহণ করে দেশে আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিকের সমান আচরণ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারকে সমুন্নত রাখতে স্বতঃপ্রবৃত্ত পদক্ষেপ নেবেন।

উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে কেমন হয়!

মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ততোধিক কঠিন পরীক্ষার প্রস্তুতি। নাম তার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভর্তি পরীক্ষা'। অনভিপ্রেত ব্যস্ততা। সকাল সন্ধ্যা কোচিং সেন্টারে প্রশ্ন ব্যাংক মুখস্ত করা আর মডেল টেস্ট। মেডিক্যাল, প্রকৌশল, বিশ্ববিদ্যালয় নানা প্রকার ও প্রকরণের কোচিং। তারপর প্রাণপণ ভর্তি যুদ্ধ। আজ ঢাকা, কাল খুলনা, তো পরশু চট্টগ্রাম, আবার পরের দিন সিলেট। ময়মনসিংহ মাঝখানে বাদ পড়ে যায়। জাহাঙ্গীরনগরের কথা তো ভুলেই গেলাম। বুয়েট, চুয়েট, রুয়েট ও খুয়েট ঘুরে একটায় পাওয়া গেল অবশেষে, কিন্তু পছন্দের বিষয় নয়। পছন্দের বিষয়ে অন্য এক জায়গায় অপেক্ষমান তালিকায় নাম এসেছে। গল্পটি অনেকটা কমিউনিস্ট পোল্যান্ডের, রেশনের সরকারি জুতার দোকানে সারাদিন লাইনে দাঁড়ানোর পর পরের দিন শেষে এক জোড়া জুতা পাওয়া গেল, কিন্তু দুটো জুতাই এক পায়ের। এ হচ্ছে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর দেশের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর ভোগান্তির কাহিনি। মাঝখানে কোচিং ব্যবসা এবং বাস-ট্রেন-লঞ্চ-বিমানে লাগাতার ছুটাছুটি। এক সময় জানা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ভর্তি বাণিজ্যের কাহিনি। সারা বছর উচ্চ মাধ্যমিক পড়তে যা খরচ, তারচেয়ে বেশি খরচ ও ভোগান্তির মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। তারপর কোথাও সিলেকশান না পেলে কী হবে? এরকম অনেক ঘটনা আছে।

এত দক্ষযজ্ঞ করে যে উচ্চ শিক্ষালয়ে ভর্তির যাছাই-বাছাই, সেখানে সর্বক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান কী আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি? বিষয়ভিত্তিক সঠিক শিক্ষার্থী বাছাই-এর জন্য বর্তমান পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা কোনোভাবেই সহায়ক প্রমাণিত হয়নি, বরঞ্চ প্রতিবন্ধক মনে হয়েছে। যে শিক্ষার্থী পদার্থবিজ্ঞান পড়তে চেয়েছে, এ অপদার্থ ভর্তি পরীক্ষার চক্করে পড়ে তার নাম পরিসংখ্যানে। রসায়ন শাস্ত্র পড়া যার শখ, পরীক্ষা ব্যবস্থার জটিল রসায়ন তাকে ধরিয়ে দিল ধনবিজ্ঞান। অর্থনীতি বা ধনবিজ্ঞান পড়ার অদম্য আগ্রহী শিক্ষার্থীর নাম পাওয়া গেল নৃবিজ্ঞনের অপেক্ষমান তালিকায়। মাঝখানে লাভটা হলো কার? কোচিং সেন্টার, ভর্তি বাণিজ্যের উদ্যোক্তা, হোটেল, ট্রান্সপোর্ট এবং ভর্তি পরীক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষক কর্মচারীদের।

এখন বিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গুচ্ছ পদ্ধতির পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ততোধিক বিজ্ঞ উপাচার্যদের খোশামোদ তোশামোদ করছেন। মেডিকেল ও প্রকৌশল শিক্ষায় গুচ্ছ পদ্ধতি অনেকদিন ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু দেশের প্রধান প্রধান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুচ্ছ পদ্ধতিতে আগ্রহী নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া ভর্তি পরীক্ষা সত্যিকার অর্থে হয় না। যেখানে ভর্তি পরীক্ষার দাবি করা হয়, তাদের অনেকেই দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপে মূল পরীক্ষার্থীর বাইরে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি করে থাকে। সরকারি কলেজগুলোতেও ভর্তি পদ্ধতি অত্যন্ত শিথিল।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিকমান বিবেচনায় হাজারের বাইরে। হাজারের ভেতর যারা ৫০০-এর মধ্যে অবস্থান করে তাদের স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বা বাছাই পদ্ধতি দেখলে দেখা যাবে তারা কেউই ভর্তির ক্ষেত্রে এরকম কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে না। আবেদনকারীর পরীক্ষার ট্রান্সক্রিপট এবং কোনো কোন ক্ষেত্রে সহশিক্ষায় বিশেষ কোনো দক্ষতা থাকলে তাও বিবেচনায় নিয়ে ভর্তি কাজ সম্পন্ন করে থাকে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা সর্বত্র এ নীতি কম-বেশি ফলো করা হয়। আমরা আমাদের কোনো গণ পরীক্ষার (Public examination) ফলাফলকে কেন গ্রাহ্যের মধ্যে নেব না। একজন শিক্ষার্থীর বিগত সময়ের সকল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলকে মূল্যায়ন করে বাছাই-এর প্রাথমিক পর্বটি সেরে চূড়ান্ত বাছাই এ একটি সাক্ষাৎকার যা অনলাইন বা সেল ফোনেও করা যেতে পারে। ভর্তি দুটি পৃথক পর্বে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল পাওয়ার এক মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে। প্রথম পর্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের প্রাপ্ত পয়েন্ট ভিত্তিক ৮০ শতাংশ আসন। দ্বিতীয় পর্বে বাকি আসনের জন্য একটি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করে বাকী ২০ শতাংশ আসন পূরণ করবে। আবেদনকারীদের মধ্যে যারা ফলাফলভিত্তিক বাছাই এ মনোনীত হয়নি তারাই শুধু এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ সরাসরি তাদের নিজ নিজ বিভাগের জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করবে। বিশ্ববিদ্যালয় সবার জন্য একটি সাধারণ নিয়ম করে দিবে। বিভাগের কিছু স্বাধীন ক্ষমতাও থাকবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ন্যূনতম পয়েন্ট পাওয়া শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের ৫-৭ দিনের মধ্যে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইনস্টিটিউটের পছন্দনীয় বিষয়ে যথাযথ কাগজপত্রসহ অনলাইনে আবেদন করবে। বিভাগ কগজপত্র মূল্যায়ন করে বিভাগের ৮০ শতাংশ আসন এ আবেদন থেকে পুরণ করে দরখাস্ত প্রাপ্তির শেষ দিন থেকে ৫ দিনের মাথায় ফলাফল জানিয়ে দিবে। ফলাফল জানার ১০ দিনের মধ্যে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ভর্তি হতে হবে। দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই নিয়ম অনুসৃত হতে হবে। বাকি ২০ শতাংশ আসন একটি উন্মুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা যেতে পারে। কারণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অনেক ভালো ছাত্রও কোনো কারণে খারাপ ফলাফল করতে পারে। তারা এ পদ্ধতিতে তার পছন্দের বিষয়ে একটি সুযোগ নিতে পারবে। এ সময় ১০০ শতাংশ ভর্তি পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলভিত্তিকই হবে।

ভর্তি ব্যবস্থাপনা ও তার আনুষঙ্গিক ব্যয় এটি বিশ্ববিদ্যালযের দায় ও দায়িত্ব। ভর্তির একটি ন্যূনতম ফি নেওয়া যায়, কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার কোনো ফি প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তি আয়ের ফাঁদ হতে পারে না। মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকতার গুণ ও মান বৃদ্ধির প্রশ্নটি এড়িয়ে উচ্চ-শিক্ষায় কঠিন ভর্তি পরীক্ষা সঠিক মেধা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষার্থী বাছাই-এ কোনো সাহায্য করবে না। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এটি ভালোভাবে বুঝেছি। সঠিক

প্রস্তুতি ও নিয়ত ঠিক করে ২০২২-২০২৩ সাল থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাবিহীন ভর্তি ব্যবস্থা চালু হউক। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত জোরের সাথে বলতে চাই ভর্তি ব্যবস্থায় প্রচলিত সকল কোটা রহিত করতে হবে। নতুবা এ ব্যবস্থার সুফল পাওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যারয়ের শিক্ষক-কর্মচারী কোটা, জেলা কোটা, নারী কোটা, খেলোয়াড় কোটা, সঙ্গীত কোটা, নাট্য কোটা কোনো কোটাই থাকবে না। মেধাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। খেলোয়াড়, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা-অভিনেত্রী যারা নিয়মিতভাবে ভর্তি হবে, তাদের মধ্য থেকেই বের হয়ে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন নযির বিরল নয়, কোটায় ভর্তি হয়েছে, শিক্ষক পিতামাতার আনুকূল্যে ভালো রেজাল্ট এবং একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এসব জমিদারি বন্ধ করা দরকার।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একই নিয়মে ভর্তির কাজ পরিচালনা করবে। সবগুলোতে না হলেও কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চাপ থাকবে, আবার কিছু বিশ্ববিদ্যালয় খুব বেশি আবেদন পাবে না। তারা সবাই উচ্চ-মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে বিভাগভিত্তিক আবেদন গ্রহণ করবে। তবে বিভাগভিত্তিক প্রাথমিক বাছাই-এর ফলাফল প্রকাশ করবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্বের ভর্তি ফলাফল প্রকাশের এক সপ্তাহ পর। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শূন্য আসনের ভর্তি পরীক্ষা নিবেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্বের ফলাফল প্রকাশের এক সপ্তাহ পর। এভাবে যদি ভর্তি ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয় তাহলে দেশজুড়ে যে ভর্তি বিড়ম্বনা তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। অন্তত ৭০ থেকে ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের পছন্দনীয় বিয়য়ে পড়তে পারবে। দেশে ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য, ভর্তি আতঙ্ক ও নানামুখী ভোগান্তি কমবে। মেধাবীদের ভর্তি সহজ হবে। একডেমিক সময় সাশ্রয় হবে। রেজাল্টের এক মাসের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম শেষ হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ সমান পারদর্শী নয়, কোনো বিভাগ বেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণ করতে পারে তাও দেখার বিষয় হবে। আন্তঃবিভাগ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিষয়টি খুব র‍্যাডিক্যাল মনে হলেও আসলে এটিই বিশ্বব্যাপী চলছে। আমাদের দেশে আগে এই পদ্ধতিই অনুসৃত হতো। প্রচলিত পদ্ধতির ভেতর ঘুরপাক খেলে সমস্যার সমাধান হবে না। সেজন্য বর্তমানের কাটা ছকের বাইরে যেতে হবে। প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির উন্নত বিকল্প খুঁজে পেতে হবে। বিষয়টি সবাইকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নয়, শিক্ষাই প্রাধান্য পাক

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংগঠনিকভাবে রাজনীতি সম্পৃক্ততার নানা মডেল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মডেলটি প্রায় একইরকম। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়। বাংলাদেশে গত ৩০ বছর বা তারও বেশি সময় যাবৎ নির্বাচন হয় না। বড় মিলটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে যখন বামফ্রন্ট রাজ্য সরকারে ছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাদের অঙ্গ সংগঠন Student Front of India-SFI এর দখলে। এখন পশ্চিমবঙ্গের ৫৫০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের মধ্যে ৪৭৮টি তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদ' নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে যারা যখন সরকারে থাকেন তখন তাদের ছাত্র সংগঠন কলেজ বিশ্বদ্যািলয়ের ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব বা অরাজকতা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে কখনও ছাত্রলীগ, কখনও ছাত্রদল কখনও ছাত্রশিবির-এর আধিপত্য। অন্যরা ক্যাম্পাস ছাড়া বা অনুগত প্রজার মতো থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের অন্যত্র অবস্থাটা ভিন্ন।

সর্বভারতীয় চিত্রটি দেখলে দেখা যায়, ভারতে প্রায় আটটি বিভিন্ন ধরন বা টাইপের ছাত্র সংগঠন রয়েছে। যেমন — সর্বভারতীয়, রাজ্যভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক (মুসলিম ও খ্রিষ্টান), কাস্ট বা গোত্রভিত্তিক (দলিত, এসটি, এসসি), বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক, যাদের কোনো শাখা বা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথেও সরাসরি সংযুক্তি থাকে না, বিশেষায়িত বিষয় ভিত্তিক (কেরল মনোবিজ্ঞান ছাত্র সমিতি), সাংস্কৃতিক এবং সমাজকল্যাণমূলক ইত্যাদি সংগঠন দেখা যায়। এভাবে নানা ক্যাটাগরিতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে ৩১টি শিক্ষার্থী সংগঠন দেখা যায়, যার মধ্যে ৫ থেকে ৬টির কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি সংযোগ নেই। রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে নানা বামপন্থি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত আছে প্রায় ১০টি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন এর মধ্যে ৫ থেকে ৭টি মুসলমান, খ্রিষ্টান এবং পশ্চাদপদদের গোষ্ঠী সংগঠন। কংগ্রেসের ছাত্র অঙ্গসংগঠন National Students Union of India, ১৯৭১ সালে মিসেস গান্ধির আমলে গঠিত হয়। বিজেপির সরাসরি ছাত্র সংগঠন দেখা যায় না। ছাত্রদের মধ্যে বিজেপির মিত্র আরএসএস-এর শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। ভারতের সবচেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন সিপিআই(এম)-এর অঙ্গ সংগঠন Student Federation of India, ১৯৭০ সনে গঠিত হয়। ২০১৪-১৫ সনে এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৪৩,০০,৪০৫ দাবি করা হয়। ভারতের প্রায় সকল গ্রাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিগত রাজ্যসভা নির্বাচনের পূর্বে ছাত্র রাজনীতির বাড়াবাড়িতে ক্ষুব্ধ হয়ে তা নিয়ন্ত্রণে নতুন নিয়ম-নীতি চালু করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীও যে আভাস দিয়েছিলেন তাতে সম্ভাব্য একটি রূপরেখা কল্পনা করা হয়েছিল। মোটামুটি ধারণা করা হয়েছিল, সকল ক্যাম্পাসে

দলভিত্তিক অঙ্গ সংগঠনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হতে পারে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীগণ ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ছাত্রছাত্রীগণ ক্যাম্পাসে নানা সংগঠন করতে পারবে তবে তা হবে ক্যাম্পাস ভিত্তিক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদে'র কর্মকাণ্ডে খুবই বিরক্ত। তাই হয়ত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরূপ সিদ্ধান্ত তৃণমূল সরকার নিতে পারেন বলে অনেকে ধারণা করছেন। কিন্তু তা হয়নি।

যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক মত বা দল সমর্থক ছাত্র গ্রুপ থাকে। কিন্তু তাদের সার্বক্ষণিক কোনো অস্তিত্ব বা অবস্থান টের পাওয়া যায় না। ব্রিটেনে তারা নিজ নিজ শহরের কনজারভেটিভ ক্লাব, লেবার ক্লাব, লিব-ডেম ক্লাব এবং যুক্তরাষ্ট্রে তারা রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেট ক্লাবে যাতায়াত করে। নির্বাচনের সময় কর্মী হিসেবে এবং দলীয় তহবিল সংগ্রহে কাজ করে। তবে সব সময় তারা মূল দল থেকে কিছু পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। দলগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মূল দলের সদস্য সংগ্রহ করে থাকে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সংগঠনগুলোর প্রায় সবাই অদলীয়, সামাজিক, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, বিনোদন ও কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। নির্বাচিত ছাত্র সংসদের কিছু চার্টারড বা বিধিবদ্ধ দায়িত্ব থাকে। ছাত্র উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে তারা ছাত্র সংসদে দায়িত্ব পালন করে। ব্রিটেনের বিখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিয়ন মূলত একটি ডিবেটিং সোসাইটি। অনুরূপভাবে ব্রিটেনের বেশির ভাগ ছাত্র সংগঠনগুলোই মূলত বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্ক করার ফোরাম। তবে প্রতিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত 'ছাত্র সংসদ' থাকে। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্বাচিত কোনো 'ছাত্র সংসদ' নেই। নেই প্রকাশ্য জাতীয়ভিত্তিক দলীয় ছাত্র সংগঠনের শাখা কার্যক্রম। তবে বিষয়ভিত্তিক এবং ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অনেক ক্লাব দেখা যায়। তবে বাংলাদেশের সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংগঠনের যে রূপ, ধরন ও প্রকৃতি এবং এসব সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের কর্মকাণ্ডের যে ধারা ও পদ্ধতি দিন দিন প্রকাশিত ও বিকশিত হচ্ছে, তার নযির পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। দেশের সকল বড় রাজনৈতিক দল ও শক্তির অঙ্গ সংগঠন হিসেবে জাতীয় ভিত্তিক ছাত্র সংগঠন রয়েছে। সে সংগঠনসমূহের আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাখা এবং শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক শাখা আছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসিক হলগুলোতেও শাখা সংগঠন ও নির্বাচিত সংসদের বিধান রয়েছে। গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে একমাত্র একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোথাও কোনো 'ছাত্র সংসদ' নির্বাচন হয়েছে বলে জানা যায়নি। দেশের প্রচলিত আইনে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের বিধান রহিত করা হলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না।

এদেশের অনেক বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করেন। কারণ তারা মূলত ছাত্ররাজনীতিরই ফসল। বর্তমানে 'শিক্ষা' ও 'রাজনীতি' দুটো কী সম্পূরক, নাকি পরিপূরক, নাকি বিপরীতমুখী অবস্থানে তা ভেবে দেখতে তাদের অনুরোধ করি। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত পঞ্চাশ বছরের ছাত্র রাজনীতির নানামুখী প্রকাশ ও বিকাশের এখন নির্মোহ ও সময়োপযোগী মূল্যায়ন প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গণ প্রথমত (প্রধানত) ও শেষ পর্যন্তই 'শিক্ষা'র জন্যই গঠিত ও পরিচালিত। অন্য যে সব সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা অর্জনের সহায়ক সেগুলোতে অংশগ্রহণ একজন শিক্ষার্থীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এখানে প্রেরণা বা প্রণোদনা থাকতে পারে কিন্তু জোর-জবরদস্তি থাকতে পারে না। সুদীর্ঘ কয়েক দশক ধরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সহশিক্ষা কার্যক্রম একরকম বন্ধ। চলছে শুধু রাজনৈতিক দলীয় কার্যক্রম। এ কার্যক্রমে রাজনীতির কোনো তর্ক-বিতর্ক নেই। আছে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল-বেদখল, নির্যাতন, হুমকি, লাঠিসোটা ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার। একই দলের মধ্যে অন্তঃকোন্দলের জেরে প্রতিষ্ঠানে তালা দেওয়া, পরীক্ষা, ক্লাস ও আবাসিক হল বন্ধ করা ইত্যাদি ছাড়াও যৌন অপরাধসহ নানা রকমের অপরাধ। তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে খুন-জখম এখন ডাল-ভাত। এসবেরই হোতা তথাকথিত ছাত্ররাজনীতির নেতা ও কর্মীরাই। এখন এসব অপরাধ সংগঠনে ছাত্রীরাও পিছিয়ে নেই। তারাও সতীর্থদের নির্যাতন করছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কী দলীয় রাজনীতির সমর্থক, কর্মী, নানা দলের সম্মুখ সৈনিক তৈরি করে নিজের মতের প্রসার ও ভিন্নমত দমনের একটি উর্বর ক্ষেত্র হবে, নাকি পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে সুস্থ, সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মানুষ ও মানস সৃষ্টি করে একটি সৃষ্টিশীল, আদর্শবান, সচ্চরিত্রবান, নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির কেন্দ্র বা কারখানা হবে। জাতিকে এ দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। কারণ দুটি ধারা পাশাপাশি চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে মূলত পাঁচটি অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন। এক. দেশের সর্বস্তরের সচেতন নাগরিক, দুই. শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ, তিন. শিক্ষক সমাজ, চার. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ, সর্বশেষ ও পাঁচ. এ দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকগণ ও সরকার। শিক্ষাঙ্গণে 'শিক্ষা'র পুনর্বাসনে এ পাঁচটি অংশীজনের যুগপৎ ভূমিকা চাই।

বি-রাজনীতিকরণ ও অতি-রাজনীতিকরণের মাঝামাঝি থাকুক শিক্ষাঙ্গণ।

স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তি হিসেবে রাজনীতি করা, রাজনৈতিক মতাদর্শে অনুরক্ত বা আকর্ষিত হওয়া, কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ, সে সুবাদে নেতৃত্বের বিভিন্ন সিঁড়ি আরোহন সবটাই আইন ও সংবিধান সম্মত এবং সুষ্ঠু সমাজ বিকাশের সহায়ক রীতি ও পদ্ধতি। তাহলে বাংলাদেশে এ মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংগঠন নিয়ে জাতির এত ভয়াবহ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেন? তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে বলা যায়, বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গণের ভয়াবহ রূপ, কিছু অপ-রাজনৈতিক শক্তি ও ব্যক্তি কর্তৃক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করা, শিক্ষার্থীদের উপর এক শ্রেণির রাজনৈতিক লেবাসধারী গুণ্ডা-পাণ্ডার শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা এবং সর্বোপরি শিক্ষা প্রশাসনের নির্লজ্জ দলবাজি, অদক্ষতা, নির্লিপ্ততা, দুর্বল নৈতিকতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে চরম অসহায়ত্ব। এ দুই অবস্থার দুই ধরনের প্রকৃতি ও প্রেক্ষাপট। প্রথমটি কেতাবি ধারণা বা তত্ত্ব। দ্বিতীয়টি দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এ দুয়ের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে অনেকেই মতামত দিচ্ছেন শিক্ষাঙ্গণ থেকে 'দলীয় রাজনীতি' নিষিদ্ধ করে দিলেই অবস্থার উন্নতি হতে পারে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, এ অরাজক অবস্থা হঠাৎ করে এক দুই মাস বা বছরে সৃষ্টি হয়নি। তিলে তিলে গড়ে ওঠা এ মহাদানবীয়তার আশ্রয়-প্রশ্রয়, লালন-পালনের দায় আমাদের সবার। তাই এ দায় স্বীকার করে নিয়ে সবাইকে অত্যন্ত সতর্ক ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু রাজনীতি বন্ধের ফাঁকা বুলি দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল দিবে না। রাজনীতি সত্যিকার অর্থে অনেক ক্যাম্পাসেই এখন নেই, তাই বলে টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, হল-হোস্টেলের সিট দখল, ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন-পীড়ন বন্ধ হয়নি। আবার 'রাজনীতি এমন একটি প্রক্রিয়া যা কারও নির্দেশে বন্ধ হয় না, কারও নির্দেশে শুরুও হয় না। তবে রাজনীতিকে শুদ্ধ ও সুস্থ ধারায় বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া যায়। যে বুয়েট ক্যাম্পাসে নির্মম হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত হলো সে ক্যাম্পাসে সত্যিকার অর্থে কোনো রাজনীতি ছিল না। ছিল সরকারি দলের তকমাধারী একদল বিকৃত মানসিকতার গুন্ডা ছাত্রের ত্রাসের রাজত্ব। যা বুয়েট প্রশাসন, নিকটবর্তী পুলিশ সবার প্রচ্ছন্ন মদত পেয়ে গেছে।

বুয়েটে আবরারের নির্মম হত্যাকণ্ডের আগে ঐ ক্যাম্পাসে অনুরূপ ঘটনা আর ঘটেনি তা নয়। ঘটেছে অসংখ্য বার, নির্যাতিত হয়ে ক্যাম্পাসও ছেড়েছে অনেকে। অভিযোগও হয়েছে কিন্তু প্রতিকার হয়নি। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ কিংবা মিডিয়ায় প্রকাশও হয়নি। তবে ক্যাম্পাসে সবাই তা কম-বেশি জানত, সবার কেন যেন গা সহা ভাব এবং গা বাঁচিয়ে চলাটাই হয়ে গিয়েছিল নিজেকে নিরাপদ রাখার দুর্বলতম কৌশল। শুধু বুয়েটে

নয়, চুয়েট, রুয়েট, খুয়েট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কোনো প্রতিষ্ঠানই এ দুর্বৃত্তায়নের বাইরে নেই বা ছিল না। নির্যাতনের রকম ও ধরনে উনিশ-বিশ ছিল। প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ছিল অভিন্ন। আবরার মরে গিয়ে বেঁচে গেল। সিরিয়াস পঙ্গুত্ব নিয়ে আবরার যদি বেঁচে যেত তবু কেউ তার কোনো খোঁজ নিত কি না আমি সন্দিহান। আবরারের মৃত্যু কারো কারো কাছে এখনও দুর্ঘটনা। আর একটু হুশ-আক্কেলের সাথে কাজটি করলে নাকি এ দুর্ঘটনা ঘটত না। কয়েকজন অতিরিক্ত 'পান' করায় এমন অঘটন ঘটে গেল বলে প্রকাশ্যে মৃদু আক্ষেপ দেখেছি। কোনো কোনো দুর্ঘটনা বা অঘটন ইতিহসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, যেমন — ছোট্ট একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করে। যেমনটি হয়েছিল ঢাকার রাজপথে বেপরোয়া বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুজন কিশোর ছাত্রের মৃত্যু পরবর্তীকালে লাগাতার সড়ক অবরোধ এবং মন্ত্রী, এমপি, পুলিশ কর্মকর্তাসহ অনেকের বৈধ কাগজপত্র ছাড়া যানবাহন সনাক্তকরণ, ভিআইপিদের উল্টো পথে চলা গাড়িগুলোকে সোজা পথ দেখিয়ে দেওয়া। জাঁদরেল ভিআইপিদের রাজপথে কিশোরদের কাছে মাপ চাওয়া। একইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত কোটা বিরোধী আন্দোলনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। বুয়েটের সর্বশেষ দুর্বৃত্তপনার নির্মম বলি আবরারও জীবন দিয়ে দেশের সকল কোমলমতি ছাত্রছাত্রী, তাদের পিতামাতা, ভাইবোন, চিন্তাশীল সাধারণ মানুষ, দেশের শিক্ষক সমাজ, সরকার, সবার চিন্তা চেতনায় প্রবলভাবে আঘাত করেছে। এখন অর্থবহ কিছু একটা না করে কেউ বর্তমান ও ভবিষ্যতের দায় এড়াতে পারবে না। তাই বিষয়টি নিয়ে সুদুরপ্রশারী চিন্তা এবং বাস্তব ও বাস্তবায়ন উপযোগী পদক্ষেপ চাই।

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের নিজস্ব ইতিহাস এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ পাকিস্তান আন্দোলন পূর্বে মুসলিম ছাত্রলীগ, পাকিস্তান সময়ে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৯৫০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পরবর্তীকালে ইসলামি ছাত্র সঙ্ঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক বেশি সমর্পিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে ছাত্র রাজনীতি ক্রমাগতভাবে সহিংস হয়ে ওঠে। সে সহিংসতায় সবসময় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন এগিয়ে থাকত। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাঙ্গনে প্রকৃত অর্থে কোনো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেই। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এখন যা হয় তার একটি নিকৃষ্ট নমুনা জাতি ইতিমধ্যে দেখেছে। পত্রিকান্তরে জানা গেল, স্বাধীনতার পর থেকে ক্যাম্পাসে প্রায় ১৫১টি লাশ পড়েছে। জখমের সঠিক সংখ্যা নির্ণিত হয়নি। তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, পাঠদান বিঘ্নিত হওয়া, হল-হোস্টেল খালি করা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রনেতাদের ক্যাম্পাস ঘিরে ব্যবসা বাণিজ্য, বখরা-কমিশন, নেশা ও মাদক সেবন এবং মাদক ব্যবসা সর্বোপরি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমান্তরাল প্রশাসন পরিচালনা সময়ের বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। উৎকণ্ঠিত জাতি এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায়। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষার মেরুদণ্ডই এসব অরাজকতার কারণে

ভেঙে পড়েছে।

পদক্ষেপ সমূহ এককভাবে সবই সরকারের কাছ থেকে আসতে হবে তা নয়। তাই সম্মিলিতভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে দায়িত্ব নিয়ে এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে হবে। প্রথম দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের উপর। সর্ব প্রথম মৌলিক একটি বিষয়ে দেশের সকল কর্মরত শিক্ষকদের ঐকমত্য সৃষ্টি করতে হবে। তাহচ্ছে, শিক্ষকদের আত্ম-মর্যাদাবোধ ও শিক্ষকসুলভ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এবং দলকানা ও দলদাস-সুলভ মানসিকতা পরিহারের প্রতিশ্রুতি। অপেশাদার, দলকানা, দলদাস-দলদাসী শিক্ষকদের যে শিক্ষাঙ্গণে আধিপত্য থাকবে, সেখানে ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি সবটাই কলুষিত হতে বাধ্য। এই মৌলিক বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে পারেন। তারা তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার পরিধি পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো অবিলম্বে শুরু করতে পারেন।

১. পাঠদান নিয়মিতকরণ, ক্লাসে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের উপস্থিতি নিয়মিতকরণ এবং পাঠপ্রক্রিয়াকে উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক করার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ। ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য উপযুক্ত প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।
২. ক্যাম্পাসের নিয়ম নীতি, আইন-শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার কঠোরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা। অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির বিধান করা।
৩. হল-হোস্টেল প্রশাসনে নিয়মনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও কর্মঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং তাদের যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করা।
৪. ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসে যেসব অনিয়ম, র‍্যাগিং-এর নামে নির্যাতন, বাড়াবাড়ি হয়েছে সেসব বিষয়ে তদন্ত করে নির্যাতিত ও নির্যাতনকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং অপরাধের মাত্রা ও ধরন অনুসারে দণ্ড প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান।
৫. প্রতিষ্ঠানের আইনগত ক্ষমতার আওতায় নিয়মনীতি প্রয়োগ করে ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি অন্তত আগামী দুই বছরের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া।
৬. ২০২০ সালের মধ্যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বজনীন ভোটাধিকারর ভিত্তিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।
৭. ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দলভিত্তিক প্রচারণা প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে পরিগণিত করা।
৮. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দল নিরপেক্ষ শিক্ষকদের প্রক্টরিয়াল বডি, প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর, হোস্টেল সুপার ইত্যাদি দায়িত্ব দেওয়া।
৯. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
১০. পড়াশুনা, গবেষণা, প্রশাসনসহ নানা সৃজনশীল উদ্যোগের জন্য ছাত্র-শিক্ষক উভয়কে পুরষ্কৃত করা।

সরকার ও দেশের দায়িত্বশীল সকল রাজনৈতিক দল শিক্ষাঙ্গনের এ অস্থির সময়কে সুস্থির করার জন্য রাজনৈতিক স্বার্থ বা দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে একটি ঐকমত্যে

উপনীত হবেন, এটি জাতির প্রত্যাশা। শিক্ষাঙ্গন ব্যবস্থাপনায় বাইরের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে নিরপেক্ষ প্রশাসনকে সকল আইনি সহায়তা দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে সরকারের পক্ষ থেকে একটি সর্বদলীয় কমিটি করে সম্ভাব্য করণীয়সমূহ আলোচিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ ঐকমত্যের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে দলীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারে। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, জাতীয় আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হবে। ছাত্রছাত্রীরা অন্তত ক্যাম্পাসের ক্ষুদ্র পরিসরে দলীয় প্রচারণার বদলে মুক্ত মনে রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবে। দলীয় ছাত্র ফোরাম দেশে থাকতে পারে, তারা ক্যামপাসের বাইরে নিজ নিজ দলের জন্য কাজ করবে। স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীগণ ইচ্ছা করলে সরাসরি তাদের পছন্দমতো রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণের অধিকারী হবে। যারা সরাসরি রাজনৈতিক দলের সদস্য হবে তারা আর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশ নিবে না। উন্নত ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাজনৈতিক দল, ছাত্র সমাজ এবং ক্যাম্পাসের মধ্যে যেভাবে রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া হয়, আমরা আমাদের রাজনীতিকে সে সভ্য ও সংস্কৃত পথে প্রবাহিত করতে পারি। এতে বিরাজনীতিকরণ যেমন হবে না, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন মত প্রকাশ, নেতৃত্বের বিকাশ উপযোগী ক্যাম্পাসে মানবিক ও উন্মুক্ত পরিবেশ ফিরে আসবে। বি-রাজনীতিকরণ এবং অতি-রাজনীতিকরণ দুটিই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের উচিত দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থানে সমাজকে রাখার চেষ্টা করা। আমরা বর্তমানে অতিমাত্রায় দলীয়কৃত একটি সমাজের বাসিন্দা। দলের প্রধান নেতা নেত্রীর বিশ্বাস ও বয়ান হবে দলের সবার বিশ্বাস, না হলেও অন্তত-বুলি। এ এক ভয়ংকর সমাজ। ছাত্র সমাজকে এ ভয়ংকর প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

List of Countries practice types of Parliament, electoral system with specific proportional representation (PR) system

Country	Body	Type of body	Type of proportional system		List type(if applicable)		Variation of open lists (if applicable)	Allocating formula	Electoral threshold	Constituencies	Governmental system	Notes
Albania	Parliament (Kuvendi)	Unicameral national legislature		Party-list PR	Open list		?	Highest averages method (D'Hondt method)	4% nationally or 2.5% in a district	Counties		
Algeria	People's National Assembly	Lower house of national legislature		Party-list PR	Open list		?	Largest remainder method(Hare quota)	5% of votes in respective district.[124]			
Angola	National Assembly	Lower house of national legislature		Party-list PR	Closed list		—	Highest averages method (D'Hondt method)	[citation needed]	5 member districts and nationwide		Double simultaneous vote use to elect the President and the National Assembly at the same election.
Argentina	Chamber of Deputies	Lower house of national legislature		Party-list PR	Closed list		—	Highest averages method (D'Hondt method)	3% of registered voters			
Armenia	National Assembly			Party-list PR with majority jackpot and minority jackpot [125]	Open list		?	Largest remainder method (? quota)	5% (parties), 7% (blocs)			Party lists run-off, but only if necessary to ensure stable majority of 54% if it is not achieved either immediately (one party) or through building a coalition.[126][127] If a party would win more than 2/3 seats, at least 1/3 seats are distributed to the other parties.
					Closed list		—	Largest remainder method (? quota)				

Aruba (Kingdom of the Netherlands)				Party-list PR									
Australia	Senate	Upper house of national legislature		Single transferable vote (STV)	—			—					
Austria	National Council	Lower house of national legislature		Party-list PR	Open list			More open: 14% on the district level (among votes for the candidates party)	Largest remainder method (Hare quota)	4%	Single-member districts within federal states (Länder)	Parliamentary republic	
					Open list			More open: 10% on the regional (state) level (among votes for the candidates party)	Largest remainder method(Hare quota)		Federal states (Länder)		
					Open list			More open: 7% of the on the federal level (among votes for the candidates party)	Highest averages method (D'Hondt method)		Single federal (nationwide) constituency		
Belgium				Party-list PR						5%			
Bénin				Party-list PR									

Bolivia	Chamber of Deputies	Lower house of national legislature		Additional member system (AMS) - MMP (fixed number of seats - no leveling seats)	Closed list					3%			Ballots use the double simultaneous vote: voters cast a single vote for a presidential candidate and their party's list and local candidates at the same time (vote splitting is not possible/ allowed)
	Chamber of Senators	Upper house of national legislature		Party-list PR	Closed list				Highest averages method (D'Hondt method)				
Bosnia and Herzegovina				Party-list PR									
Brazil	Chamber of Deputies	Lower house of national legislature		Party-list PR	Open list			?			States and Federal District	Presidential Republic	
Bulgaria				Party-list PR						4%			
Burkina Faso				Party-list PR									
Burundi				Party-list PR						2%			
Cambodia				Party-list PR									
Cape Verde				Party-list PR									
Chile				Party-list PR									
Colombia				Party-list PR									
Costa Rica				Party-list PR									
Croatia				Party-list PR						5%			
Cyprus				Party-list PR									
Czech Republic				Party-list PR						5%			
Denmark	Folketing	Unicameral national legislature		Party-list PR	Open list				Highest averages method (D'Hondt method)	2%		Parliamentary system	135 constituency seats, 40 leveling seats

Dominican Republic				Party-list PR									
East Timor				Party-list PR									
El Salvador				Party-list PR									
Equatorial Guinea				Party-list PR									
Estonia				Party-list PR						5%			
European Union	European Parliament	Lower house of supranational legislature		varies by state					Party-list PR in 25 member states				
					—			—	Single transferable vote (STV) in Ireland and Malta				
Faroe Islands				Party-list PR									
Fiji				Party-list PR						5%			
Finland				Party-list PR									
Germany				Mixed-member proportional representation (MMP)	Closed list			—		5% regionally (or 3 district winners)			
Greece				Party-list PR						3%			Nationwide closed lists and open lists in multi-member districts. The winning party used to receive a majority bonus of 50 seats (out of 300), but this system will be abolished two elections after 2016.[128] In 2020 parliament voted to return to the majority bonus two elections thereafter.[129]
Greenland				Party-list PR									

Guatemala				Party-list PR									
Guinea-Bissau				Party-list PR									
Guyana				Party-list PR									
Honduras				Party-list PR									
Iceland				Party-list PR									
Indonesia				Party-list PR						4%			
Ireland		Lower house of national legislature		Single transferable vote (STV)									
Israel				Party-list PR						3.25%			
Kazakhstan				Party-list PR						7%			
Kosovo				Party-list PR									
Latvia	Saeima	Unicameral national legislature		Party-list PR	Open list			Most open	Highest averages method (Sainte-Laguë method)	5%	5 lti-member constituencies consisting of municipalities[130]	Parliamentary republic	
Lebanon				Party-list PR									
Lesotho				Mixed-member proportional representation (MMP)									variant using a mixed single vote
Liechtenstein				Party-list PR						8%			
Luxembourg				Party-list PR									
Macedonia				Party-list PR									
Malta				Single transferable vote (STV)	—			—					
Moldova				Party-list PR						6%			
Montenegro				Party-list PR						3%			
Mozambique				Party-list PR									
Namibia				Party-list PR									

Nether-lands				Party-list PR									
New Zealand				Mixed-member proportional representation (MMP)						5% or 1 district won			
Nepal				Mixed list						3%			
Norway				Party-list PR						4%			
Paraguay				Party-list PR									
Peru				Party-list PR						5%			
Poland				Party-list PR						5% threshold or more for single parties, 8% or more for coalitions or 0% or more for minorities			
Portugal				Party-list PR									
Romania				Party-list PR									
Rwanda				Party-list PR									
San Marino				Party-list PR					3.5%				If needed to ensure a stable majority, the two best-placed parties participate in a run-off vote to receive a majority bonus.
São Tomé and Príncipe				Party-list PR									
Serbia				Party-list PR						3%			
Sint Maarten				Party-list PR									
Slovakia				Party-list PR						5%			

Slovenia				Party-list PR						4%			
South Africa				Party-list PR									
Spain	Congress of Deputies	Lower house of national legislature		Party-list PR[131]	Closed list			—	Highest averages method (D'Hondt method)	3%	Provinces of Spain	Parliamentary system	
Sri Lanka	Parliament			Party-list PR[132][133][134]	Open list (for 196/225 seats)			Panachage (up to 3 preference votes)[135]	Highest averages method (D'Hondt method)	12.5% (per constituency)	Constituencies	Semi-presidential system	
					Closed list (for 29/225 seats)			—	?	No threshold	None (single nationwide constituency)		
Suriname	National Assembly			Party-list PR[136]	Open list			Most open	Highest averages method (D'Hondt method)	No threshold	Districts of Suriname	Assembly-independent republic	
Sweden	Riksdag			Party-list PR[137][138]	Open list			More open (5% of the party vote to override the default party-list)[139]	Highest averages method (Sainte-Laguë method)	4% nationally or 12% in a given constituency	Counties of Sweden (some counties are further subdivided)	Parliamentary system	Leveling seats
Switzerland	National Council	Lower house of national legislature		Party-list PR[140]	Open list			Panachage	Highest averages method (Modified D'Hondt method: Hagenbach-Bischoff system)	No threshold	Cantons of Switzerland	Semi-direct democracy under an assembly-independent[141][142] directorial republic	
	Council of States (only to elect Councillors in: • Jura[143] • Neuchâtel)[143]			Party-list PR[144]	Open list			Most open	?	No threshold[145]	None (single canton-wide constituency)[146]		

Thailand	House of Representatives	Lower house of national legislature		Mixed-member proportional representation[147]	Closed list			—	Largest remainder method (? quota)	No threshold	None (single nationwide constituency)	Parliamentary system under a constitutional monarchy	Next elections are to be held under parallel voting
Togo	National Assembly			Party-list PR[148]	Closed list			—	Highest averages method (?)	No threshold	Constituencies	Presidential system	
Tunisia	Assembly of the Representatives of the People			Party-list PR[149]	Closed list			—	Largest remainder method (? quota)	No threshold	Constituencies	Semi-presidential system	
Turkey	Grand National Assembly			Party-list PR[150]	Closed list			—	Highest averages method (D'Hondt method)	7%	Provinces of Turkey (some provinces are further subdivided)	Presidential system	
Uruguay	Chamber of Representatives	Lower house of national legislature		Party-list PR[151][152]	Closed list			—	Highest averages method (D'Hondt method)	No threshold	Departments of Uruguay	Presidential system	Ballots use the double simultaneous vote, the same ballot is used for electing the president (first round) and the two chambers
	Chamber of Senators	Upper house of national legislature									None (single nationwide constituenc		

পরিশিষ্ট-২

Legislatures of sovereign states : name, types, electoral system, population and number of members...

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level		Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Afghanistan	Leadership Council of Afghanistan (Pashto: رهبری شورٰی, romanized: *Rahbarī Shūrā*)[3]		Unicameral		No fixed term	Appointment by the supreme leader	Aprx. 30[4]	1,340,608[a]
Albania	Parliament of Albania (Albanian: *Kuvendi i Shqipërisë*)		Unicameral		4	Closed list proportional representation with the D'Hondt method by county with a 3% threshold	140	20,226
Algeria	Parliament of Algeria (Arabic: مجلس الجزائري, French: *Parlement Algérien*)	People's National Assembly (Arabic: المجلس الشعبي الوطني, romanized: *al-Majlis al-Sha'abi al-Watani*; Berber languages: Asqamu Aɣerfan Aɣelnaw; French: *Assemblée populaire nationale, APN*)	Lower		5	Open list proportional representation with the largest remainder method by province	407	80,303
		Council of the Nation (Arabic: مجلس الأمة, romanized: *Majlis al-Ummah*, French: *Conseil de la nation*)	Upper		6	Elected by popular wilaya assemblies and communal people's assemblies, and appointed by the President	144	257,638
Andorra	General Council of Andorra (Catalan: *Consell General d'Andorra*)		Unicameral		4	Parallel voting: Closed list proportional representation with the largest remainder method nationwide and block vote by parish	28	2,789
Angola	National Assembly (Portuguese: *Assembleia Nacional*)		Unicameral		4	Closed list proportional representation with the D'Hondt method nationwide and by province	220	84,081
Antigua and Barbuda	Parliament of Antigua and Barbuda[note 2]	House of Representatives	Lower		5	First-past-the-post	17	4,305
		Senate	Upper		5	Appointed by the Governor-General, representing the monarch, on the advice of the Prime Minister and Leader of the Opposition	19	4,811
Argentina	National Congress of Argentina (Spanish: *Congreso de la Nación Argentina*)	Chamber of Deputies of the Nation (Spanish: *Cámara de Diputados de la Nación*)	Lower		4	Closed list proportional representation with the D'Hondt method by province with a 3% threshold	257	156,097
		Honorable Senate of the Nation (Spanish: *Honorable Senado de la Nación Argentina*)	Upper		6	Partial block voting by province	72	557,181

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level	Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Armenia	National Assembly of Armenia (Armenian: Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով, *Hayastani Hanrapetyut'yan Azgayin zhoghov*) (Abbreviated: Ազգային ժողով, ԱԺ *Azgayin Zhoghov, AZh*) *Informal: Parliament of Armenia (Armenian: խորհրդարան, khorhrdaran)*		Unicameral	5	Closed-list proportional representation in a nationwide constituency and open-list proportional in district constituencies, with a 5% or top-3 national threshold (or 7% for alliances)[b][5]	105	24,902
Australia	Parliament of Australia[note 2]	House of Representatives	Lower	3	Instant-runoff voting	151	162,914
		Senate	Upper	6	Single transferable vote by state/territory	76	323,684
Austria	Austrian Parliament (German: *Österreichisches Parlament*)	National Council (German: *Nationalrat*)	Lower	5	Open list proportional representation with the D'Hondt method in constituencies with a 4% threshold	183	43,895
		Federal Council (German: *Bundesrat*)	Upper	5 and 6	Elected by state legislatures	61	129,563
Azerbaijan	National Assembly (Azerbaijani: *Milli Məclis*)		Unicameral	5	First-past-the-post	125	73,320
Bahamas, The	Parliament of the Bahamas	House of Assembly	Lower	5	First-past-the-post	39	9,326
		Senate	Upper	5	Appointed by the Governor-General, representing the monarch, on the advice of the Prime Minister and Leader of the Opposition	16	22,103
Bahrain	National Assembly (Arabic: المجلس الوطني البحريني, *Al-majlis al-wataniu al-bahrayniu*)	Council of Representatives (Arabic: مجلس النواب, *Majlis an-nuwab*)	Lower	4	Two-round system	40	30,864
		Consultative Council (Arabic:مجلس الشورى, *Majlis al-shura*)	Upper	4	Appointed by the king	40	30,864
Bangladesh	National Parliament (Bengali: জাতীয় সংসদ, *Jatiya Sangsad*)		Unicameral	5	First-past-the-post	350	466,909
Barbados	Parliament of Barbados	House of Assembly	Lower	5	First-past-the-post	30	9,486
		Senate	Upper	5	Appointed by the President on the advice of the Prime Minister and Leader of the Opposition	21	13,551

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level		Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Belarus	National Assembly of the Republic of Belarus (Belarusfsian: Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь, romanized: *Nacyjanalny schod Respubliki Bielaruś* / Russian: Национальное собрание Республики Беларусь, romanized: *Natsionalnoye sobran'ye Respubliki Belarus'*)	House of Representatives (Belarusfsian: Палата прадстаўнікоў, romanized: *Palata pradstaŭnikoŭ* / Russian: Палата представителей)	Lower		4	Two-round system	110	85,997
		Council of the Republic (Belarusfsian:Савет Рэспублікі, romanized: *Saviet Respubliki* / Russian: Совет Республики)	Upper		4	Elected by regional councils, and appointed by the President	64	147,773
Belgium	Federal Parliament (Dutch:*Federaal Parlement* / French:*Parlement fédéral* / German:*Föderales Parlament*)	Chamber of Representatives (Dutch: *Kamer van Volksvertegenwoordigers* / French: *Chambre des Représentants* / German: *Abgeordnetenkammer*)	Lower		5	Open list proportional representation with the D'Hondt method by province with a 5% threshold	150	74,000
		Senate (Dutch: *Senaat* / French: *Sénat* / German: *Senat*)	Upper		5	Elected by community and regional parliaments	60	185,000
Belize	National Assembly	House of Representatives	Lower		5	First-past-the-post	31	10,748
		Senate	Upper		5	Appointed by the Governor-General, representing the monarch, on the advice of the Prime Minister and Leader of the Opposition	12	27,766
Benin	National Assembly (*Assemblée nationale*)		Unicameral		4	Proportional representation with the largest remainder method in constituencies	83	115,648
Bhutan	Parliament of Bhutan[note 3]	National Assembly (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། *Gyelyong Tshogdu*)	Lower		5	First-past-the-post	47	15,072
		National Council (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། *Gyelyong Tshogde*)	Upper		4	First-past-the-post, and appointed by the king	25	28,337

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level		Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Bolivia	Plurinational Legislative Assembly (*Asamblea Legislativa Plurinacional*)	Chamber of Deputies (*Cámara de Diputados*)	Lower		5	Closed list mixed-member proportional representation: Proportional representation with the D'Hondt method by department and first-past-the-post	130	83,905
		Chamber of Senators (*Cámara de Senadores*)	Upper		5	Closed list proportional representation with the D'Hondt method by department	36	302,993
Bosnia and Herzegovina	Parliamentary Assembly (Parlamentarna skupština / Парламентарна скупштина)	House of Representatives (Predstavnički dom / Zastupnički dom / Представнички дом)	Lower		4	Open list proportional representation with the largest remainder method in constituencies	42	91,422
		House of Peoples (Dom naroda / Дом народа)	Upper		4	Serbs elected by the National Assembly of Republika Srpska, and Bosniaks and Croats elected by the House of Peoples of the Federation of Bosnia and Herzegovina	15	255,982
Botswana	Parliament of Botswana	National Assembly (*Palamente ya Botswana*)	Unicameral		5	First-past-the-post, and appointed by the President	65	32,211
Brazil	National Congress (*Congresso Nacional*)	Chamber of Deputies (*Câmara dos Deputados*)	Lower		4	Open list proportional representation with the D'Hondt method by state	513	371,798
		Federal Senate (*Senado Federal*)	Upper		8	Partial block voting by state	81	2,354,724
Brunei	Legislative Council (*Majlis Mesyuarat Negara*)		Unicameral		no time-frame	Appointed by the Sultan	36	11,355
Bulgaria	National Assembly (Народно събрание *Narodno sabranie*)		Unicameral		4	Closed list proportional representation with the largest remainder method by constituency with a 4% threshold	240	30,685
Burkina Faso	National Assembly (*Assemblée nationale*)		Unicameral		5	Proportional representation with the D'Hondt method nationwide and in constituencies	127	126,281
Burundi	Parliament (*Parlement*)	National Assembly (*Assemblée nationale*)	Lower		5	Closed list proportional representation with the D'Hondt method in constituencies with a 2% threshold	121	74,570
		Senate (*Sénat*)	Upper		5	Elected by the communal councils	43	179,577
Cambodia	Parliament (សភាតំណាងរាស្ត្រ *Sâphéa Tâmnang Réastr*)	National Assembly (រដ្ឋសភា *Rôdthsâphéa*)	Lower		5	Closed list proportional representation with the D'Hondt method by province	123	108,852
		Seate (ព្រឹទ្ធសភា *Prœ̆thsâphéa*)	Upper		6[6]	Appointed by the monarch, elected by the National Assembly and commune councils	61	219,490

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level	Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Cameroon	Parliament (*Parlement*)	National Assembly (*Assemblée nationale*)	Lower	5	First-past-the-post and Block vote: If no list obtains an absolute majority, the one with the highest number of votes is allocated half of the seats; the remainder is allocated to the other best-placed lists through proportional representation	180	97,021
		Senate (*Sénat*)	Upper	5	Elected by municipal councils, and appointed by the president	100	174,638
Canada	Parliament / *Parlement*	House of Commons / *Chambre des communes*	Lower	4 years, unless elections are called earlier	First-past-the-post voting	338	104,571
		Senate / *Sénat*	Upper	Until age 75, or resignation.	Appointed by the governor general, representing the monarch, on the advice of the Prime Minister	105	318,825
Cape Verde	National Assembly (*Asembleia Nacional*)		Unicameral	5	Closed list proportional representation with the D'Hondt method in constituencies	72	4,990
Central African Republic	National Assembly (*Assemblée nationale*)		Unicameral	5	Two-round system	131	38,951
Chad	National Assembly (Assemblée nationale / الجمعية الوطنية)		Unicameral	4	Block voting: If no list obtains an absolute majority, the seats are allocated through proportional representation	188	66,640
Chile	National Congress (*Congreso Nacional*)	Chamber of Deputies (*Cámara de Diputados*)	Lower	4	Binomial voting system (To become open list proportional representation with the D'Hondt method in constituencies by the next election)	155	145,021
		Senate of the Republic (*Senado de la República*)	Upper	8	Binomial voting system	38	457,963
China, People's Republic of	National People's Congress (**全国人民代表大会** *Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì*)[note 4]		Unicameral	5	Elected by municipal, regional and provincial congresses, and People's Liberation Army	2,980	448,518
Colombia	Congress (*Congreso*)	Chamber of Representatives (*Cámara de Representantes*)	Lower	4	Open or closed list proportional representation (depending on the political party) with the D'Hondt method by state	166	279,556
		Senate (*Senado*)	Upper	4	Open or closed list proportional representation (depending on the political party) with the D'Hondt method nationwide with a 3% threshold	102	454,964

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level		Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Comoros	Assembly of the Union (Assemblée de l'Union)		Unicameral		5	Two-round system, and elected by the local assemblies	33	24,181
Congo, Democratic Republic of the	Parliament (*Parlement*)	National Assembly (*Assemblée nationale*)	Lower		5	Parallel voting: Open list proportional representation with the largest remainder method in constituencies and first-past-the-post voting	500	143,425
		Senate (*Sénat*)	Upper		5	Elected by the provincial assemblies	108	664,008
Congo, Republic of the	Parliament (*Parlement*)	National Assembly (*Assemblée nationale*)	Lower		5	Two-round system	151	28,537
		Senate (*Sénat*)	Upper		5	Elected by district, local, and regional councils	52	83,966
Costa Rica	Legislative Assembly (*Asamblea Legislativa*)		Unicameral		4	Closed list proportional representation with the largest remainder method by province	57	75,468
Croatia	Croatian Assembly[note 3] (Hrvatski sabor)		Unicameral		4	Open list proportional representation with the D'Hondt method in constituencies with a 5% threshold	151	28,414
Cuba	National Assembly of People's Power (*Asamblea Nacional del Poder Popular*)		Unicameral		5	Popular vote and approval by special candidacy commissions	605	18,308
Cyprus	House of Representatives (Βουλή των Αντιπροσώπων *Vouli Antiprosópon* / Temsilciler Meclisi)		Unicameral		5	Open list proportional representation with the largest remainder method by constituency	56	18,632
Czech Republic	Parliament of the Czech Republic (Parlament České republiky)	Chamber of Deputies (Poslanecká sněmovna)	Lower		4	Open list proportional representation with the D'Hondt method by region with a 5% threshold	200	52,811
		Senate (Senát)	Upper		6	Two-round system (staggered elections)	81	130,397
Denmark	People's Assembly[note 3] (Folketinget)		Unicameral		4	Open list proportional representation with the D'Hondt method in constituencies with a 2% threshold including the Faroe Islands and Greenland seats	179	30,969
Djibouti	National Assembly (Assemblée nationale / الجمعية الوطنية)		Unicameral		5	Block vote and closed list proportional representation by constituencies: The list obtaining an absolute or relative majority of votes is allocated 80% of the seats; the remainder is allocated to the other best-placed lists which obtained at least 10% of the valid votes through proportional representation; if no other list obtains 10% of the valid votes, the remaining seats will be allocated to the party which won the majority or relative majority of the valid votes	65	12,587

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level	Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Dominica	House of Assembly		Unicameral	5	First-past-the-post voting, and appointed by the President	32	3,394
Dominican Republic	National Congress (*Congreso Nacional*)	Chamber of Deputies (*Cámara de Diputados*)	Lower	4	Open list proportional representation with the D'Hondt method by province and nationwide with a 1% threshold for the nationwide seats	190	51,520
		Senate (*Senado*)	Upper	4	First-past-the-post voting	32	293,088
East Timor	National Parliament (Parlamentu Nasionál / *Parlamento Nacional*)		Unicameral	5	Closed list proportional representation with the D'Hondt method nationwide with a 3% threshold	65	16,408
Ecuador	National Assembly (*Asamblea Nacional*)		Unicameral	4	Parallel voting: Closed list proportional representation in a nationwide constituency and first-past-the-post voting	137	116,802
Egypt	Parliament (برلمان)	Senate (مجلس الشيوخ *Majlis Alshuyukh*)	Upper	5		300	
		House of Representatives (مجلس النواب *Majlis Al-Nuwab*)	Lower	5	Parallel voting: First-past-the-post voting, block vote, and appointed by the President	596	150,983
El Salvador	Legislative Assembly (*Asamblea Legislativa*)		Unicameral	3	Open list proportional representation with the largest remainder method by department and nationwide	84	68,382
Equatorial Guinea	Parliament (*Parlamento / Parlement / Parlamento*)	Chamber of Deputies (*Cámara de los Diputados / Chambre des députés / Câmara dos Deputados*)	Lower	5	Closed list proportional representation in constituencies with a 10% threshold	100	16,220
		Senate (*Senado / Sénat / Senado*)	Upper		Closed list proportional representation with a 10% threshold, and appointed by the President	70	23,171
Eritrea	National Assembly (*Hagerawi Baito*)		Unicameral	5	Popular vote	104	50,878
Estonia	State Assembly[note 3] (Riigikogu)		Unicameral	4	Open list proportional representation with the D'Hondt method in constituencies with a 5% threshold	101	12,814
Eswatini	Parliament (Liblanda)	House of Assembly[note 5]	Lower	5	majority	55	22,181
		Senate (Indlu yeTimphunga)	Upper		Appointed by the King	30	40,666

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level			Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Ethiopia	Parliament[note 5]	House of Peoples' Representatives (የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት *Yehizbtewekayoch Mekir Bet*)	Lower			5	First-past-the-post voting	547	135,134
		House of Federation (የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት *Yefedereshn Mekir Bet*)	Upper			5	Elected by State Councils	112	659,986
Federated States of Micronesia	Congress		Unicameral			4	First-past-the-post voting	14	7,642
Fiji	Parliament		Unicameral			4	Open list proportional representation with the D'Hondt method nationwide with a 5% threshold	50	16,745
Finland	Parliament (Eduskunta / Riksdagen)		Unicameral			4	Open list proportional representation with the D'Hondt method in constituencies, and first-past-the-post for Åland's lone seat	200	25,900
France	Parliament (*Parlement*)	National Assembly (*Assemblée nationale*)	Lower			5	Two-round system	577	113,258
		Senate (*Sénat*)	Upper			6	Elected indirectly by officials including regional councilors, department councilors, mayors, city councilors, and members of the National Assembly; two-round or proportional by department depending on the number of seats.	348	187,787
Gabon	Parliament (*Parlement*)	National Assembly (*Assemblée nationale*)	Lower			5	First-past-the-post voting, and appointed by the President	121	12,190
		Senate (*Sénat*)	Upper			6	Indirectly elected by local and départemental councillors	102	14,460
Gambia	National Assembly		Unicameral			5	First-past-the-post voting, and appointed by the President	58	25,673
Georgia	Parliament of Georgia (საქართველოს პარლამენტი *Sak'art'velos Parlamenti*)		Unicameral			4	Parallel voting: Closed list proportional representation in a nationwide constituency with a 5% threshold, and first-past-the-post	150	29,794

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level	Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Germany	Federal Diet[note 3] (*Bundestag*)		Lower house	4	Closed list mixed-member proportional representation with the Sainte-Laguë method by state with a 5% threshold, and first-past-the-post	736	113,031
	Federal Council[note 3] (*Bundesrat*)		Upper house	Dependent on individual state elections	Delegated from state governments	69	1,185,501
Ghana	Parliament		Unicameral	4	First-past-the-post voting	275	106,286
Greece	Hellenic Parliament[note 3] (Βουλή των Ελλήνων *Vouli ton Ellinon*)		Unicameral	4	Open list reinforced proportional representation with the D'Hondt method in constituencies with a 3% threshold	300	35,958
Grenada	Parliament	House of Representatives	Lower	5	First-past-the-post voting	15	7,333
		Senate	Upper	5	Appointed by the government and by the leader of opposition	13	8,461
Guatemala	Congress of the Republic (*Congreso de la República*)		Unicameral	4	proportional closed list	160	80,557
Guinea	National Assembly (*Assemblée nationale*)		Unicameral	5	proportional closed list	114	88,227
Guinea-Bissau	National People's Assembly (Assembleia Nacional Popular)		Unicameral	4	proportional closed list	100	13,454
Guyana	National Assembly		Unicameral	5	popular vote and appointed by the President	65	11,583
Haiti	Haitian Parliament (Parlement Haïtien / Palman Ayisyen)	Chamber of Deputies (Chambre des députés / Chanm Depite)	Lower	4	proportional	119	98,181
		Senate (Sénat / Sena)	Upper	6		30	323,997
Honduras	National Congress (*Congreso Nacional*)		Unicameral	4	proportional open list	128	58,823
Hungary	National Assembly (Országgyűlés)		Unicameral	4	proportional open list and Scorporo	199	25,860
Iceland	Assembly of All[note 3] (Alþingi)		Unicameral	4	proportional	63	5,080
India	Parliament (संसद Sansad)	House of the People[note 3] (लोक सभा Lok Sabha)	Lower	5	First-past-the-post	543	2,192,379
		Council of States[note 3] (राज्य सभा Rajya Sabha)	Upper	6	Single transferable vote (233 members are elected by the legislative assemblies of the States/Union territories, 12 members are nominated by the President)	245	4,847,900

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level			Term (years)	Electoral system	Seats	Popu-lation per seat
Indo-nesia	People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat)	People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat)	Lower			5	proportional open list	575	467,101
		Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah)	Upper			5	Single non-transferable vote	136	1,974,875
Iran	Islamic Consultative Assembly[note 3] (مجلس شورای اسلامی *Majles-e Showrā-ye Eslāmī*)		Unicameral			4	popular vote	290	259,136
Iraq	Council of Representatives of Iraq[note 3] (مجلس النواب العراقي *Majlis Al-Niwab Al-Iraqi* / ئەنجومەنی نوێنەران *Enjumen-e Nûnerên*)		Unicameral			4	proportional open list	329	95,782
Ireland	Parliament[note 3] (Oireachtas)	President of Ireland	Presi-dent-in-Par-liament			7	Instant-runoff voting	N/A	N/A
		House of Representatives of Ireland (Dáil Éireann)[note 3]	Lower			5	Proportional Representation Single Trans-ferable Vote	160	27,640
		Senate of Ireland[note 3] (Seanad Éireann)	Upper			5	Appointed by the prime minister, elected by local and national elected representatives, and elected by graduates of universities	60	76,470
Israel	Assembly[note 3] (כנסת *Knesset*)		Unicameral			4	proportional closed list	120	61,768
Italy	Parliament (*Parlamento*)	Chamber of Deputies (*Camera dei Deputati*)	Lower			5	parallel voting (245 seats by proportional representation, 147 seats by first past the post and 8 abroad by proportional repre-sentation)	400	152,738
		Senate of the Republic (*Senato della Repubblica*)	Upper			5	parallel voting (122 seats by proportional representation, 74 seats by first past the post and 4 abroad by proportional representa-tion), 5 members appointed by the Presi-dent and a former former President by right	200	296,580
Ivory Coast	Parliament (Parlement)	National Assem-bly (Assemblée nationale)	Lower			5	majority	255	294,529
		Senate (Sénat)	Upper			5	Elected by district and provincial councils, and appointed by the President	120	197,837
Jamaica	Parliament	House of Representatives	Lower			5	First-past-the-post voting	63	45,860
		Senate	Upper			5	Appointed by the Governor General, repre-senting the monarch.	21	137,580

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level	Term (years)	Electoral system	Seats	Popu-lation per seat
Japan	Diet (国会 *Kokkai*)	House of Representatives (衆議院 *Shūgiin*)	Lower	4	proportional and First-past-the-post voting	465	270,817
		House of Councillors (参議院 *Sangiin*)	Upper	6	proportional and Single non-transferable vote	245	514,000
Jordan	Parliament (مجلس الأمة *Majlis al-Umma*)	Assembly of Deputies (مجلس النواب *Majlis al-Nuwaab*)	Lower	4	Single non-transferable vote	130	46,760
		Senate (مجلس الأعيان *Majlis al-Aayan*)	Upper	6	Appointed by the monarch	75	93,520
Kazakh-stan	Parliament (Парламенті *Parlamenti*)	Assembly[note 3] (Мәжіліс *Májilis*)	Lower	5		107	207,854
		Senate (Сенаты *Senaty*)	Upper	6	Appointed by the President and elected by local assemblies	49	340,527
Kenya	Parliament (Bunge)	National Assembly (Bunge la Taifa)	Lower	5	parallel	349	126,182
		Senate (Seneti)	Upper	5	Popular vote and appointed by the President	67	657,278
Kiribati	House of Assembly (Maneaba ni Maungatabu)		Unicameral	4	popular vote and appointed by Rabi Council of Leaders	46	2,239
Korea, North	Supreme People's Assembly (최고인민회의 / 最高人民會議 *Ch'oe-go In-min Hoe-ŭi*)		Unicameral	5	popular vote	687	36,390
Korea, South	National Assembly (국회 / 國會 *Gukhoe*)		Unicameral	4	majority and proportional	300	166,691
Kuwait	National Assembly (مجلس الأمة *Majlis al-Umma*)		Unicameral	4	popular vote and appointed by the prime minister	50	71,328
Kyrgyz-stan	Supreme Council (Жогорку Кеңеш *Joğorku Keñeş*)		Unicameral	5	popular vote	90	44,690
Laos	National Assembly (ສະພາແຫ່ງຊາດ *Sapha Heng Xat*)		Unicameral	5	one-party state closed list	115	48,148
Latvia	Parliament[note 3] (Saeima)		Unicameral	4	proportional closed list	100	20,703
Lebanon	Parliament (Parlement)	Chamber of Deputies (مجلس النواب *Majlis an-Nuwwab*) [note 6]	Unicameral	4	proportional/party list	128	33,000
Lesotho	Parliament (Palamente)	National Assembly	Lower	5	popular vote and proportional	120	16,927
		Senate	Upper	5	appointed by principal chiefs and by the ruling party	33	61,556

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level	Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Liberia	Legislature	House of Representatives	Lower	6	majority	73	47,624
		Senate	Upper	9	majority	30	115,896
Libya	House of Representatives (مجلس النواب *Majlis an-Nuwwab*)		Unicameral		Parallel voting: First-past-the-post, single non-transferable vote, and proportional representation	200	28,353
Liechtenstein	Diet[note 3] (Landtag)		Unicameral	4	proportional closed list	25	1,451
Lithuania	Parliament[note 3] (Seimas)		Unicameral	4	proportional	141	21,658
Luxembourg	Chamber of Deputies (D'Chamber / Chambre des députés / Abgeordnetenkammer)		Unicameral	5	Open list proportional representation, allocated by the D'Hondt method in four constituencies	60	8,484
Madagascar	Parliament (Palemanta / Parlement)	National Assembly (Antenimieram-Pirenena / Assemblée nationale)	Lower	5		160	137,078
		Senate (Antenimierandoholona / Sénat)	Upper	5		33	664,430
Malawi	National Assembly		Unicameral	5	First-past-the-post voting	193	76,809
Malaysia	Parliament (Parlimen)	House of Representatives[note 7] (Dewan Rakyat)	Lower	5	First-past-the-post voting	222	127,631
		Senate[note 8] (Dewan Negara)	Upper	3	26 appointed by the State Legislative Assemblies, 2 for each state and 44 appointed by the Yang di-Pertuan Agong, of which 4 are for the Federal Territories.	70	404,773
Maldives	People's Assembly[note 3] (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް *Rayyithunge Majilis*)		Unicameral	5	First-past-the-post voting	85	4,266
Mali	National Assembly (Assemblée nationale)		Unicameral	4	147 elected in single or multi-member constituencies, using a runoff system. 13 elected by overseas Malians.	160	90,732
Malta	Parliament (Il-Parlament)	President of Malta	President-in-Parliament	5	Appointed by the House of Representatives	N/A	N/A
		House of Representatives (Kamra tad-Deputati)	Unicameral	5	Single transferable vote	69	5,950
Marshall Islands	Legislature (Nitijeļā)		Unicameral	4	Single and multi-member constituencies	33	2,060

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level		Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Mauritania	Parliament (البرلمان *Barlamene*)	National Assembly (الجمعية الوطنية *Al Jamiya al-Wataniyah*)	Unicameral		5	Runoff election	146	37,888
Mauritius	National Assembly (Assemblée nationale)		Unicameral		5		65	17,614
Mexico	Congress of the Union (*Congreso de la Unión*)	Chamber of Deputies (*Cámara de Diputados*)	Lower		3	Parallel voting: Largest remainder method (Hare quota) (200 seats) / FPTP (300 seats)	500	227,821
		Chamber of Senators (*Cámara de Senadores*)	Upper		6	Parallel voting: Largest remainder method (Hare quota)	128	889,926
Moldova	Parliament (Parlamentul)		Unicameral		4		101	33,498
Monaco	National Council (Conseil National)		Unicameral		5	Panachage under party-list proportional representation (16), party-list proportional representation (8)	24	1,473
Mongolia	State Great Assembly[note 9] (Улсын Их Хурал *Ulsyn Ikh Khural*)		Unicameral		4	Plurality-at-large voting	76	36,245
Montenegro	Assembly (Skupština / Скупштина)		Unicameral		4	Closed list proportional representation using the D'Hondt method in a single nationwide constituency with a 3% electoral threshold with lower thresholds for minority groups under certain circumstances	81	7,719
Morocco	Parliament (البرلمان المغربي / Parlement)	House of Representatives (مجلس النواب *Majlis al-Nuwab* / Chambre des représentants)	Lower		5	Mixed member majoritarian: Single non-transferable vote for 305 seats, 60 seats reserved for women and 30 seats reserved for young people under 40 by proportional representation	395	100,444
		House of Councillors (مجلس المستشارين *Majlis al-Mustasharin*, Chambre des conseillers)	Upper		6	Indirect election: 72 members are elected at the Kingdom's regional level, 20 in each region by a single electoral college made up of all those in the relevant region that have been elected to specific professional associations, 8 in each region by an electoral college made up of those elected from the most representative employers' professional organizations, 20 by a nationwide electoral college made up of employees	270	120,905
Mozambique	Assembly of the Republic (Assembleia da República)		Unicameral		5	proportional party list	250	85,588

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level		Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Myanmar (Burma)	Assembly of the Union (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် Pyidaungsu Hluttaw)	House of Representatives (ပြည်သူ့လွှတ်တော် Pyithu Hluttaw)	Lower		5	popular vote and appointed by the military	440	137,000
		House of Nationalities (အမျိုးသားလွှတ်တော် Amyotha Hluttaw)	Upper		5	popular vote and appointed by the military	224	269,107
Namibia	Parliament	National Assembly	Lower		5	Closed list proportional representation and appointments by the President	104	26,923
		National Council	Upper		6	Indirect election by Regional Councils	26	80,769
Nauru	Parliament		Unicameral		3	Dowdall system	19	521
Nepal	Federal Parliament (संघीय संसद Sanghiya Sansad)	House of Representatives (प्रतिनिधि सभा; Pratinidi Sabha)	Lower		5	Mixed member majoritarian (165 members elected through First-past-the-post voting and 110 elected through proportional representation voting method)	275	105,392
		National Assembly (राष्ट्रिय सभा; Rastriya Sabha)	Upper		6	*Indirect single transferable vote and 3 members appointed by the President*	59	491,233
Netherlands	States General (Staten-Generaal)	House of Representatives (Tweede Kamer, *Second Chamber*)	Lower		4	Party-list proportional representation	150	111,533
		Senate (Eerste Kamer, *First Chamber*)	Upper		4	Indirect party-list proportional (by members of the states-provincial and the Caribbean Electoral colleges for the Senate)	75	223,066
New Zealand	Parliament (Pāremata)	House of Representatives (Whare o ngā Māngai)	Unicameral		3	mixed-member proportional representation	120	33,566
Nicaragua	National Assembly (Asamblea Nacional)		Unicameral		5		90	64,034
Niger	National Assembly (Assemblée nationale)		Unicameral		5		171	139,210
Nigeria	National Assembly	House of Representatives	Lower		4		360	388,898
		Senate	Upper		4		109	1,284,436
North Macedonia	Assembly (Собрание *Sobranie*)		Unicameral		4		120	16,736
Norway	Great Assembly[note 3] (Stortinget / Stuorradiggi)		Unicameral		4	proportional mixed	169	29,785
Oman	*Council of Oman* (مجلس عُمان)	*Consultative Assembly* (مجلس الشورى *Majlis al-Shura*)	Lower		4		84	33,017
		Council of State (مجلس الدولة *Majlis al-Dawla*)[7]	Upper		4		85	32,628

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level			Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Pakistan	Parliament of Pakistan (پارلیمنٹ)	National Assembly (ایوان زیریں پاکستان)	Lower			5		342	537,023
		Senate (ایوان بالا / ایوانِ بالا)	Upper			6		104	1,735,000
Palau	National Congress (Olbiil era Kelulau)	House of Delegates[note 5]	Lower			4	majority	16	1,309
		Senate[note 5]	Upper			4	majority	13	2,328
State of Palestine	Legislative Council (المجلس التشريعي *Al-Majlis al-Tashrīʿiyy*)		Unicameral					132	32,277
Panama	National Assembly (*Asamblea Nacional*)		Unicameral			5		71	47,969
Papua New Guinea	National Parliament		Unicameral			5		109	56,766
Paraguay	Congress (*Congreso*)	Chamber of Deputies (*Cámara de Diputados*)	Lower			5		80	80,681
		Chamber of Senators (*Cámara de Senadores*)	Upper			5		45	143,434
Peru	Congress of the Republic (*Congreso de la República / Rimana Wasin*)		Unicameral			5		130	217,082
Philippines	Congress (Kongreso)	House of Representatives (Kapulungan ng mga Kinatawan / Mababang Kapulungan / Cámara de Representantes)	Lower			3	Parallel voting: Largest remainder method via closed lists with a three-seat cap (20% of seats), and first-past-the-post voting (80% of seats)	304	341,364
		Senate (Senado / Mataas na Kapulungan)	Upper			6	bloc voting. Voter is allocated 12 votes. 1/2 of the seats are contested every 3 years with the 12 elected senators having the largest portion of the National Popular Vote	24	4,323,958
Poland	Parliament of Poland National Assembly (Zgromadzenie Narodowe[note 10])	Sejm[note 3] (Sejm)	Lower			4	proportional open list	460	83,697
		Senate (Senat)	Upper			4	majority	100	385,010
Portugal	Assembly of the Republic (*Assembleia da República*)		Unicameral			4	proportional party list	230	45,920
Qatar	*Consultative Assembly*[note 11] (مجلس الشورى *Majlis ash-Shura*)		Unicameral					35	52,958

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level		Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Romania	Parliament (Parlamentul)	Chamber of Deputies (Camera Deputaților)	Lower		4		329	58,416
		Senate (Senat)	Upper		4		137	139,005
Russia	Federal Assembly (Федеральное Собрание *Federalnoye Sobraniye*)	State Duma[note 3] (Государственная Дума *Gosudarstvennaya Duma*)	Lower		5	parallel (First-past-the-post voting for 225 members and proportional party list for 225 members)	450	318,000
		Federation Council (Совет Федерации *Sovet Federatsii*)	Upper		dependent on individual elections in the federal subjects (4 or 5)	senators are delegated from the executive and legislative bodies of the federal subjects	170	862,048
Rwanda	Parliament (Inteko Ishinga Amategeko / Parlement)	Chamber of Deputies (Umutwe w'Abadepite / Chambre des députés)	Lower		5		80	146,121
		Senate (Umutwe wa Sena / Sénat)	Upper		8		26	449,603
Saint Kitts and Nevis	National Assembly		Unicameral		5		15	3,686
Saint Lucia	Parliament	House of Assembly	Lower		5		17	10,221
		Senate	Upper				11	15,796
Saint Vincent and the Grenadines	House of Assembly		Unicameral		5		21	5,714
Samoa	Parliament (Palemene) [note 2]	Legislative Assembly[note 3] (Fono Aoao Faitulafono)	Unicameral		5		51	3,916
San Marino	Grand and General Council (Consiglio Grande e Generale)		Unicameral		5		60	536
São Tomé and Príncipe	National Assembly (Assembleia Nacional)		Unicameral		4		55	3,330

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level		Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Saudi Arabia		Consultative Assembly (مجلس الشورى *Majlis Ash-Shura*) [note 12]	non-parliamentary		4	Appointed by the King	150	220,000
Senegal	Parliament	National Assembly (Assemblée nationale)	Unicameral		5		150	85,701
Serbia	National Assembly (Народна скупштина / Narodna skupština)		Unicameral		4		250	28,482
Seychelles	National Assembly (Assemblée nationale / Lasanble Nasyonal)		Unicameral		5		31	2,709
Sierra Leone	Parliament		Unicameral		5		146	40,136
Singapore	Parliament (Parlimen / 国家议会 *Guójiā yìhuì* / நாடாளுமன்றம் *Nāṭāḷumaṉṟam*)		Unicameral		5	First-past-the-post voting (MP) (in single member constituencies), Party block voting (in group representation constituencies), and appointed by the President (NMP)	103	52,360
Slovakia	National Council (Národná rada)		Unicameral		4		150	35,980
Slovenia	Parliament (Državni zbor Republike Slovenije)	National Assembly (Državni zbor)	Lower		4	Open list proportional representation with a 4% election threshold	90	22,779
		National Council (Državni svet)[8]	Upper		5	First-past-the-post indirect elections held within 'functional' interest organisations and 'local' interest communities by electoral bodies (electors).	40	51,254
Solomon Islands	National Parliament		Unicameral		4		50	10,460
Somalia	Federal Parliament (Baarlamaanka Federaalka / البرلمان الاتحادي)	House of the People[note 5]	Lower		4	Appointed by president	275	36,675
		Senate[note 5]	Upper		4	majority	54	180,100
South Africa	Parliament	National Assembly	Lower		5		400	126,466
		National Council of Provinces	Upper				90	562,075
South Sudan	National Legislature	National Legislature Assembly	Lower				170	48,591
		Council of States	Upper			Appointed by President	50	165,210

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level			Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
Spain	General Courts[note 3] (*Cortes Generales*)	Congress of Deputies (*Congreso de los Diputados*)	Lower			4, unless elections are called earlier.	proportional closed list	350	131,894
		Senate (*Senado*)	Upper			4, unless elections are called earlier.	208 are appointed through general election and 57 when regional legislatures are renewed, which not always happens at the same date	265	173,545
Sri Lanka	Parliament (ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව / இலங்கை பாராளுமன்றம்)		Unicameral			5		225	90,122
Sudan	National Legislature	National Assembly (*Majlis Watani*)	Lower			6		426	68,653
		Council of States (*Majlis Welayat*)	Upper			6		50	617,880
Suriname	National Assembly (Nationale Assemblée)		Unicameral			5		51	10,470
Sweden	Parliament (Riksdagen)		Unicameral			4	Open list[9] proportional representation through the Sainte-Laguë method with a 4% election threshold[10] in constituencies based upon the Counties of Sweden	349	27,286
Syria	People's Assembly (مجلس الشعب *Majlis al-Sha'ab*)		Unicameral			4		250	86,964
Switzerland	Federal Assebly (Bundesversammlung, Assemblée fédérale, Assemblea federale, Assamblea federala)	National Council (Nationalrat, Conseil national, Consiglio nazionale, Cussegl naziunal)	Lower			4	Open-list proportional with panachage and apparentment by canton.[11]	200	40,000
		Council of States (Ständerat, Conseil des États, Consiglio degli Stati, Cussegl dals chantuns)	Upper			4	Each canton has one or two seats, two-round or proportional representation depending on the canton.	46	173,913
Tajikistan	Supreme Assembly (Маҷлиси Олии *Majlisi Oli*)	Assembly of Representatives (Маҷлиси намояндагон *Majlisi namoyandagon*)	Lower			5		63	123,809
		National Assembly (Маҷлиси миллии *Majlisi Millii*)	Upper			5		33	236,363

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level	Term (years)	Electoral system	Seats	Popu-lation per seat
Tanza-nia	National Assembly (Bunge)		Unicameral	5		384	120,974
Thailand	National Assem-bly (รัฐสภา *Ratthasapha*)	House of Representa-tives (สภาผู้แทนราษฎร *Sapha Phuthaen Ratsadon*)	Lower	4	mixed-member proportional representa-tion, 350 are first-past-the-post and 150 is party-list	500	140,997
		Senate (วุฒิสภา *Wutthisapha*)	Upper	5	elected by coup d'état government	250	-
Togo	National Assembly (Assemblée nationale)		Unicameral	5		91	76,434
Tonga	Legislative Assembly (Fale Alea)		Unicameral			25	3,962
Trinidad and Tobago	Parliament	House of Representatives	Lower	5		41	32,139
		Senate	Upper			31	42,506
Tunisia	Assembly of the Representatives of the People (مجلس نواب الشعب *Majless Noweb al Shaab*)		Unicameral	5		217	49,188
Turkey	Grand National Assembly of Turkey (Türkiye Büyük Millet Meclisi)		Unicameral	5	Closed list proportional representation D'Hondt method with a 7% electoral threshold for political parties or political alliances	600	135,862
Turk-menistan	National Council (Milli Geňeş)	Assembly (Mejlis)	Lower	5	majority voting in single member constit-uencies.	125	41,360
		People's Council (Halk Maslahaty)	Upper	5	indirect election of 48 seats by members of provincial and capital city People's Councils, presidential appointment of 8 seats.	56	92,321
Tuvalu	Parliament (Palamene)		Unicameral	4		15	666
Uganda	Parliament (Bunge)		Unicameral	5		529	87,839
Ukraine	Supreme Council (Верховна Рада *Verkhovna Rada*)		Unicameral	5		450	101,248
United Arab Emirates	Federal National Assembly (المجلس الوطني الإتحادي *Maj-lis Watani Ittihad*)		Unicameral	4		40	206,601
United Kingdom	Parliament	House of Commons	Lower	5	First-past-the-post voting in single member constituencies.	650	95,787
		House of Lords	Upper	Life (life and hered-itary peers) Until end of religious term[note 13] (bishops)	Life peers appointed by the Sovereign on advice of Prime Minister[note 14]. 92 are elected by and from hereditary peers using preferential voting. 26 Lords Spiritual are bishops of the Church of England, chosen by the Church mainly based on seniority (except that female bishops are appoint-ed regardless of seniority).	782[note 15]	86,700

mber or observer state	Overall name of legislature	Name of house(s)	House level			Term (years)	Electoral system	Seats	Population per seat
United States	Congress	House of Representatives	Lower			2	Depends on the state, mainly First-past-the-post voting, in single-member constituencies.	435	722,636
		Senate	Upper			6	Depends on the state, mainly First-past-the-post voting. One-third of the Senate goes up for election every two years. Each state has two senators.	100	N/A
Uruguay	General Assembly (*Asamblea General*)	Chamber of Representatives (*Cámara de Representantes*)	Lower			5		99	33,195
		Chamber of Senators (*Cámara de Senadores*)	Upper			5		30	109,543
Uzbekistan	Supreme Assembly (Oliy Majlis / Олий Мажлис)	Legislative Chamber (Qonunchilik palatasi / Қонунчилик палатаси)	Lower			5		150	194,156
		Senate (Senati / Сенати)	Upper			5		100	291,234
Vanuatu	Parliament (Parlement)		Unicameral			4		52	4319
Vatican City	Pontifical Commission (Pontificia Commissione / Pontificia Commissio)		Unicameral			5		7	114
Venezuela	National Assembly (*Asamblea Nacional*)		Unicameral			5		277	175,430
Vietnam	National Assembly (*Quốc hội*)		Unicameral			5		500	176,385
Yemen	Parliament	House of Representatives (مجلس النواب *Majlis al-Nuwaab*)	Lower			6		301	81,485
		Shura Council (*Majlis ash-Shura*)[12]	Upper			Life		111	220,963
Zambia	National Assembly		Unicameral			5		166	87,284
Zimbabwe	Parliament	House of Assembly	Lower			5		210	61,971
		Senate	Upper			5		40	325,350

Source:

1. ^ Assuming membership of 30. This is only an estimate; the size of the council is not fixed and the membership is not fully verified.[4]
2. ^ There are three compensation mechanisms in addition of the basis 101 seats: if a party wins a majority then they win a majority jackpot of 54% of the seats; if a party wins over two-thirds of the seats then other parties receive additional seats to have no party above two-thirds; if no party can form a government in 6 days then a runoff election between the top-2 is held, with a 54% seats majority jackpot. Four additional seats are elected for national minorities.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legislatures_by_country

পরিশিষ্ট-৩

Government agencies under Ministries and Divisions in Bangladesh
Legislative]

- Jatiya Sangsad
  - Office of the Speaker of the Jatiya Sangsad
  - Sangsad committees
  - Parliament Secretariat
- Sangsad Television
- Sangsad Library

Judicial branch
Supreme Court]

- Supreme Court
  - Appellate Division
  - High Court Division
- Chief Justice
- Attorney General

District Courts]
Civil Courts

- District Judge Court
- Additional District Judge Court
- Joint District Judge Court
- Senior Assistant Judge Court
- Assistant Judge Court

Criminal Courts

- Session Judge Court
  - District Judge Court
    - District Session Judge Court
    - Additional District Session Judge Court
    - Joint District Session Judge Court
- Magistrate Court
  - District Magistrate Court
    - Chief Judicial Magistrate Court

- Additional Chief Judicial Magistrate Court
        - Senior Judicial Magistrate Court
        - Judicial Magistrate Court

Metropolitan Courts]
Criminal Courts
    - o Metropolitan Judge Court
        - Metropolitan Session Judge Court
        - Additional Metropolitan Session Judge Court
        - Joint Metropolitan Session Judge Court
    - o Metropolitan Magistrate Court
        - Chief Metropolitan Magistrate Court
        - Additional Chief Metropolitan Magistrate Court

Specialized Courts and Tribunals]
- Constitutional Court
    - o None
- Administrative Court
    - o Administrative Tribunals
- Finance Court
    - o Money Loan Courts
    - o Insolvency Courts
    - o Income Tax Appellate Tribunals
    - o Special Tribunal for Share Market Scam
- Labour Court
    - o Labour Courts
- Court of Justice
    - o International Crimes Tribunal
- Social Court
    - o Druto Bichar Tribunal
    - o Bangladesh Cyber Tribunal

Executive branch]

President's Office
- Bangabhaban
    - o Public Division
    - o Personal Division
    - o Toshakhana

Prime Minister's Office
- Cabinet Division
- Armed Forces Division
    - o Bangladesh Navy
    - o Bangladesh Air Force
    - o Bangladesh Army
- Offices
    - o National Economic Council
    - o Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA)
    - o Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA)
    - o Bangladesh Investment Development Authority
    - o Board of Investment
    - o Privatization Commission, Bangladesh
    - o Public-Private Partnership Authority (PPPA)
    - o Governance Innovation Unit (GIU)
    - o National Security Intelligence (NSI)
    - o National Skills Development Authority (NSDA)
    - o NGO Affairs Bureau
    - o Special Security Force
    - o Sub-regional Co-operation Cell (SRCC)
    - o Private Export Processing Zone (PEPZ)
- Project
    - o Ashrayan Project (Human Resource Development)
    - o Access to Information (A2I) Programme (ICT Services)
    - o Development Assistance for Special Area (except CHT)

Ministry of Chattogram Hill Tracts Affairs
- Chattogram Hill Tracts Development Board
- Refugee Rehabilitation Task Force
- Khagrachhari Hill District Council
- Chattogram Hill Tracts Regional Council
- Bandarban Hill District Council
- Rangamati Hill District Council

Ministry of Primary and Mass Education
- Bureau of Non-Formal Education
- National Academy for Primary Education

- Directorate of Primary Education

Ministry of Agriculture

- Agencies
    - Agriculture Information Service (AIS)
    - Department of Agricultural Marketing
    - Department of Agricultural Extension
    - National Institute of Biotechnology
    - Cotton Development Board
    - Barind Multipurpose Development Authority
    - Bangladesh Agricultural Research Institute
    - Bangladesh Agricultural Research Council
    - Bangladesh Sugarcane Research Institute
    - Bangladesh Rice Research Institute
    - Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
    - Bangladesh Jute Research Institute (BJRI)
    - Bangladesh Institute of Research and Training on Applied Nutrition
    - Soil Resources Development Institute
    - SAARC Agriculture Centre (SAC)
    - Seed Certification Agency
- Enterprises
    - Bangladesh Agricultural Development Corporation

Ministry of Civil Aviation and Tourism

- Bangladesh Parjatan Corporation (Tourism Corporation)
- Bangladesh Tourism Board
- Civil Aviation Authority, Bangladesh
- Limited Company
    - Bangladesh Biman

Ministry of Commerce

- Bangladesh Competition Commission
- Office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms
- Office of Chief Controller of Imports and Exports
- The Institute of Cost and Management Accountants
- The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh
- Directorate of National Consumer Rights Protection
- Trading Corporation of Bangladesh (TCB)

- Bangladesh Tea Board
- Bangladesh Tariff Commission
- Bangladesh Foreign Trade Institute
- Bangladesh Export Promotion Bureau
- Bangladesh Tea Research Institute

Ministry of Road Transport and Bridges

- Road Transport and Highways Division
    - Dhaka Transport Coordination Authority
    - Bangladesh Road Transport Authority
    - Bangladesh Road Transport Corporation
    - Roads and Highways Department
- Bridges Division
    - Bangladesh Bridge Authority

Ministry of Cultural Affairs

- Department of Archives and Libraries
- Department of Public Libraries
- Nazrul Institute
- Bengali Academy
- Bangladesh Copyright Office
- Bangladesh National Museum
- Bangladesh Folk Arts and Crafts Foundation

Ministry of Defence

- Controller General of Defence Finance
- The National Defence College
- Directorate General of Defence Purchase
- Bangladesh Ordnance Factories
- Bangladesh Meteorological Department
- Survey of Bangladesh
- Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization
- Military Institute of Science & Technology
- Defence Services Command and Staff College
- Office Of The Chief Administrative Officer
- Department of Military Lands and Cantonments

Ministry of Food

- Directorate General of Food

Ministry of Education

- Secondary and Higher Education Division
    - International Mother Language Institute
    - Bangladesh Scouts
    - Higher Education Quality Enhancement Project
    - National Computer Training and Research Academy
    - National Curriculum and Textbook Board
    - National Education Management Academy
    - Department of Inspection and Audit
    - Bangladesh National Commission of UNESCO
    - Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS)
    - University Grants Commission
    - Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority
    - Directorate of Secondary and Higher Education
    - Education Engineering Department
    - Prime Minister's Education Assistance Trust
    - Secondary and Higher Secondary Education Board:
        - Dhaka Education Board
        - Chittagong Education Board
        - Sylhet Education Board
        - Comilla Education Board
        - Dinajpur Education Board
        - Jessore Education Board
        - Rajshahi Education Board
        - Barisal Education Board
- Technical and Madrasah Education Division
    - Bangladesh Technical Education Board
    - Bangladesh Madrasa Education Board
    - Directorate of Technical Education

Ministry of Power, Energy and Mineral Resources

- Power Division
    - Agencies
        - Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA)

        - Rural Electrification Board
        - Bangladesh Power Development Board
        - Power Cell
    - Limited companies
        - Dhaka Electric Supply Company Limited
        - Dhaka Power Distribution Company Limited
        - Ashuganj Power Station Company Limited.
        - Electricity Generation Company Limited.
        - West Zone Power Distribution Company Limited.
        - Rural Power Company Limited
        - Power Grid Company of Bangladesh
        - Coal Power Generation Company Bangladesh Limited
- Energy and Mineral Resources Division
    - Agencies
        - Geological Survey of Bangladesh
        - Bureau of Mineral Development
        - Bangladesh Energy Regulatory Commission
        - Bangladesh Petroleum Institute
        - Bangladesh Petroleum Corporation
        - Geological Survey of Bangladesh
        - Bangladesh Hydrocarbon Unit
        - Department of Explosives
        - Energy Security Fund
    - Limited companies
        - Bakhrabad Gas Distribution Company Limited
        - Eastern Refinery Limited
        - Sylhet Gas Fields Limited
        - Titas Gas Transmission and Distribution Company
        - Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation
        - Converting Natural Gas Company Limited
        - Karnaphuli Gas Distribution Company Limited
        - Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited
        - Bangladesh Gas Fields Company Limited

Ministry of Environment and Forest

- Bangladesh Climate Change Trust
- Department of Environment

- Forest Department
- Bangladesh National Herbarium
- Bangladesh Forest Research Institute (BFRI)
- Bangladesh Forest Industries Development Corporation
- Forestry Development and Training Centre, Kaptai
- Bangladesh Forest College

Ministry of Public Administration]
- Bangladesh Employees Welfare Board (BKKB)
- Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC)
- Bangladesh Public Service Commission
- Bangladesh Civil Service Administration Academy
- BIAM Foundation
- Department of Printing and Publications
- Department of Government Transport
- Bangladesh Government Press
- Government Printing Press
- Bangladesh Forms and Publication Office
- Bangladesh Stationery Office

Ministry of Fisheries and Livestock
- Department of Livestock
- Bangladesh Fisheries Research Institute
- Department of Livestock Services
- Department of Fisheries
- Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI)
- Bangladesh Fisheries Development Corporation
- Marine Fisheries Academy
- Bangladesh Veterinary Council

Ministry of Finance]
- **Finance Division**
    - Office of the Controller General of Accounts
    - Investment Corporation of Bangladesh
    - The Security Printing Corporation (Bangladesh) Ltd.
    - Financial Management Reform Program
    - Comptroller and Auditor General of Bangladesh
    - Bangladesh House Building Finance Corporation

    - Pay and Services Commission 2013
- Economic Relations Division
- Internal Resources Division
    - Bangladesh Customs
    - Chittagong Custom House
    - National Board of Revenue
    - Department of National Savings
    - Dhaka Custom House
- **Bank and Financial Institutions Division**
    - Agencies
        - Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
        - Bangladesh Institute of Bank Management
        - Bangladesh Bank
        - Bangladesh Securities and Exchange Commission
        - Bangladesh Insurance Development and Regulatory Authority
        - Microcredit Regulatory Authority
    - Enterprises
        - Chittagong Stock Exchange
        - Dhaka Stock Exchange
        - Sadharan Bima Corporation
        - Jiban Bima Corporation
    - State Owned Commercial Banks
        - Sonali Bank Limited
        - Agrani Bank Limited
        - Rupali Bank Limited
        - Janata Bank Limited
        - BASIC Bank Limited
        - Bangladesh Development Bank Limited
    - State Owned Specialized Banks
        - Bangladesh Krishi Bank
        - Rajshahi Agricultural Development Bank

Ministry of Foreign Affairs
- American Institute of Bangladesh Studies
- Permanent Representative of Bangladesh to the United Nations
- Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)
- Bangladesh Institute of Law and International Affairs

- Foreign Service Academy
- List of diplomatic missions of Bangladesh

Ministry of Health and Family Welfare

- Health Service Division
    - Disease International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh
    - Department of Drug Administration
    - Directorate General of Nursing and Midwifery
    - Directorate General of Health Services
    - Health Economics Unit
    - Department of Public Health Engineering
    - Bangladesh Nursing and Midwifery Council
    - Health Engineering Department
    - Institute of Epidemiology Disease Control And Research
- Medical Education And Family Welfare Division
    - National Population Research and Training Center
    - Directorate General of Family Planning

Ministry of Home Affairs

- Public Security Division
    - Bangladesh Police
    - Border Guard Bangladesh
    - Bangladesh Coast Guard
    - Bangladesh Ansar and VDP
    - Dhaka Metropolitan Police
    - Rapid Action Battalion
- Security Service Division
    - Department of Narcotics Control
    - Department of Immigration & Passport
    - Department of Fire Service & Civil Defence
    - Department of Prison

Ministry of Housing and Public Works

- Public Works Department
- Department of Architecture
- Housing and Building Research Institute
- Directorate of Government Accommodation

- National Housing Authority
- Urban Development Directorate
- City Development Authorities
    - Capital Development Authority (RAJUK)
    - Chittagong Development Authority (CDA)
    - Khulna Development Authority
    - Rajshahi Development Authority
    - Cox's Bazar Development Authority

Ministry of Industries

- Agencies
    - Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)
    - Bangladesh Industrial and Technical Assistance Center (BITAC)
    - Bangladesh Institute of Management (BIM)
    - Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT)
    - National Productivity Organization (NPO)
    - Boilers (Bangladesh)
    - Bangladesh Accreditation Board
    - Small and Medium Enterprise Foundation (SMEF)
- Enterprise
    - Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC)
    - Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (BFSIC)
    - Bangladesh Steel and Engineering Corporation (BSEC)
    - Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation (BSCIC)

Ministry of Information

- Press Information Department (Information)
    - Press Institute of Bangladesh
    - Bangladesh Sangbad Sanstha
    - Bangladesh Press Council
- Department of Mass Communication (Broadcasting)
    - Bangladesh Betar
    - Bangladesh Television
    - Sangsad TV
- Department of Films and Publications (Films)
    - Bangladesh Film Development Corporation
    - Bangladesh Film Censor Board

  - Bangladesh Film Archive

Ministry of Textiles and Jute

- Department of Jute
- Bangladesh Handloom Board
- Bangladesh Jute Mills Corporation
- Bangladesh Textile Mills Corporation
- Bangladesh Sericulture Development Board
- Bangladesh Sericulture Research and Training Institute
- Jute Diversification Promotion Center
- Department of Textiles
- Bangladesh Jute Corporation

Ministry of Labour and Employment

- Department of Inspection for Factories and Establishments
- Child Labour Unit
- Minimum Wage Board
- Department of Labour
- Labour Appellate Tribunal
- Central Fund
- National Child Labour Welfare Council

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

- Law and Justice Division
  - Bangladesh Supreme Court
  - Bangladesh Law Commission
  - Bangladesh Judicial Service Commission
  - National Legal Aid Services Organization
  - Directorate of Registration
  - Judicial Administration Training Institute
- Legislative and Parliamentary Affairs Division
  - Bangladesh Law Commission
  - Bangladesh National Human Rights Commission
  - The Attorney General's Office

Ministry of Land

- Land Appeal Board
- Land Record and Survey Department
- Land Reform Board

- Land Administration Training Centre (LATC)

Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives

- Local Government Division
  - Local Government Engineering Department
  - Department of Public Health Engineering
  - National Institute of Local Government
  - Office of the Registrar General, Birth & Death Registration
  - City Corporations of Bangladesh
    - Barisal City Corporation
    - Chittagong City Corporation (CCC)
    - Comilla City Corporation
    - Gazipur City Corporation
    - Khulna City Corporation
    - Dhaka North City Corporation
    - Dhaka South City Corporation
    - Narayanganj City Corporation
    - Rajshahi City Corporation
    - Rangpur City Corporation
    - Sylhet City Corporation
    - Mymensingh City Corporation
  - City Water Supply and Sewerage Authority
    - Dhaka WASA
    - Khulna WASA
    - Chattogram WASA
- Rural Development and Co-operatives Division
  - Department of Cooperatives
  - Bangladesh Rural Development Board (BRDB)
  - Rural Poverty Alleviation Foundation (PDBF)
  - Small Farmer Development Foundation (SFDF)
  - Bangladesh Cooperative Bank
  - Bangladesh Dairy Farmer Co-operative Union Limited (Milk Vita)
  - Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
  - Rural Development Academy (RDA) Bogra
  - Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)

Ministry of Planning]

1. Planning Division

- Bangladesh Institute of Development Studies
- Planning Commission
- National Academy for Planning and Development

2. Statistics and Informatics Division

- Bangladesh Bureau of Statistics

3. Implementation Monitoring and Evaluation Division

- Central Procurement Technical Unit

Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology

- Posts and Telecommunications Division[1]
    - Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
    - Bangladesh Post Office
    - Bangladesh Telecommunications Company Ltd
    - Bangladesh Submarine Cable Company Limited
    - Teletalk Bangladesh Ltd
    - Telephone Shilpa Sangstha
    - Bangladesh Cable Shilpa Limited
    - Bangladesh Communication Satellite Company Limited
- Information and Communication Technology Division[2]
    - Bangladesh Hi-Tech Park
    - Department of Information and Communication Technology
    - Bangladesh Computer Council
    - Controller of Certifying Authority
    - Mailing Operator and Courier Services Licensing Authority
    - Bangladesh Communications Satellite Company Limited
    - Digital Security Agency

Ministry of Religious Affairs

- Office of the Waqf Administrator
- Christian Religious Welfare Trust
- Bangladesh Hajj Office
- Buddhist Religious Welfare Trust
- Islamic Foundation Bangladesh
- Hindu Religious Welfare Trust
- Bangladesh Haj Office, Jeddah

Ministry of Shipping

- Chittagong Port Authority
- Bangladesh Land Port Authority
- National Maritime Institute
- Bangladesh Inland Water Transport Authority
- Bangladesh Inland Water Transport Corporation
- Bangladesh Marine Academy
- Bangladesh Shipping Corporation
- Mongla Port Authority
- Payra Port Authority
- Department of Shipping
- Directorate of Seamen and Emigration Welfare

Ministry of Social Welfare

- National Disabled Development Foundation
- Bangladesh National Social Welfare Council
- Department of Social Services
- Sheikh Zayed Bin Sultan al Nahyan Trust Bangladesh
- Physically Disabled Protection Trust
- Neuro-Developmental Disability Protection Trust

Ministry of Women and Children Affairs

- National Women's Agency
- Bangladesh Shishu Academy
- Department of Women Affairs
- National Trauma Counselling Centre
- Joyeeta Foundation

Ministry of Water Resources

- Institute of Water Modeling
- River Research Institute
- Water Resources Planning Organisation (WARPO)
- Bangladesh Water Development Board
- Bangladesh Haor and Wetland Development Board
- Flood Forecasting and Warning Centre
- Joint River Commission, Bangladesh
- Centre for Environmental and Geographic Information Services

Ministry of Youth and Sports

- Directorate of Sports
- National Sports Council
- Bangladesh Krira Shikkha Protishtan (BKSP) (Bangladesh Sports Education)
- Youth Development Department
- Sheikh Hasina National Youth Center
- Bangabandhu Krirashebi Kalyan Foundation
- Sheikh Hasina National Institute of Youth Development

Ministry of Liberation War Affairs

- Bangladesh Freedom Fighter Welfare Trust
- National Freedom Fighter Council

Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment

Bureau of Manpower Employment and Training

- Bangladesh Institute of Marine Technology
- Wage Earners' Welfare Board (WEWB)
- Wages Earners' Welfare Fund
- Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL)
- Probashi Kallyan Bank

Ministry of Railways

- Bangladesh Railway
- Department of Railway Inspection

Ministry of Science and Technology

- Bangladesh Atomic Energy Commission
- Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research
- National Museum of Science and Technology[3]
- National Institute of Biotechnology[4]
- Bangladesh Computer Council
- Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre[5]
- Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre
- National Museum of Science and Technology
- Bangladesh Hi-Tech Park Authority

- Bangabandhu Hi-Tech City
- Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority
- Bangladesh Oceanographic Research Institute
- Nuclear Power Plant Company Bangladesh Limited
- Bangabandhu Science and Technology Fellowship Trust
- National Council for Science and Technology

Ministry of Disaster Management and Relief

- Cyclone Preparedness Programme (CPP)
- Disaster Management Directorate
- Office of the Refugee Relief and Repatriation Commissioner

Other agencies

- Comptroller and Auditor General of Bangladesh
- Bangladesh Planning Commission
- Bangladesh Election Commission
- Bangladesh Public Service Commission
- Anti-Corruption Commission
- National Human Rights Commission of Bangladesh

Intelligence

National

- Bangladeshi intelligence community
    - National Security Intelligence
    - Special Branch
        - Criminal Investigation Department
        - Counter Terrorism and Transnational Crime Unit

Military]

- Directorate General of Forces Intelligence (DGFI)
    - Directorate of Naval Intelligence
    - Directorate of Air Intelligence
    - Directorate of Military Intelligence
    - Directorate of Counterintelligence
    - Counter Terrorism and Intelligence Bureau

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Government_agencies_in_Bangladesh

পরিশিষ্ট -৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতি

ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী করার জন্য ১২ দফা ও দেশের সামগ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ছয় দফা প্রস্তাবনা

ইউনিয়ন পরিষদের ১২ দফা

১. ইউনিয়নকে সংবিধান নির্দেশিত পূর্ণাঙ্গ 'প্রশাসনিক একক' (Administrative Unit) হিসেবে গড়ে তুলুন।

১.১. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ (৬১ নং আইন)-এর ধারা ৬৩ পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই।

১.২. এ আইনের ধারা ৬৩ সংশ্লিষ্ট 'তৃতীয় তফসিলে' দেওয়া সাতটি বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ইউনিয়ন পর্যায়ের জনবল, কার্যাবলি ও অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে 'হস্তান্তরযোগ্য' লিখে (২০০৯-২০২৩) ১৪ বছর কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কালক্ষেপণ নয়, অবিলম্বে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সমাপ্ত করুন।

১.৩. দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে প্রচলিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ আগামী ২০২৫-এর মধ্যে সমাপ্ত করুন এবং পূর্বে নির্মিত ভবনগুলোর সংস্কার প্রয়োজন। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর থেকে পুরোনো ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা নিন।

১.৪. দেশে নতুন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা সৃষ্টি বন্ধ রাখুন। প্রথমে বিরাজিত পরিষদগুলোর অনুমোদিত জনবল ও অবকাঠামো নিশ্চিত করুন।

১.৫. সরকার থেকে পরিষদের সচিব ও হিসাব সহকারীর বেতন ও পেনশন নিশ্চিত করুন। বেতন বৃদ্ধির পর পরিষদের পক্ষে এ ব্যয় সংকুলান সম্ভব নয়। এখাতে সরকারের বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।

২. ইউনিয়ন পরিষদে পর্যাপ্ত অর্থায়ন চাই এবং অপর্যাপ্ত অর্থায়নের অবসান চাই। পর্যাপ্ত অর্থায়নের দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হলো। যে কোনো একটি গ্রহণ করার দাবি থাকল।

২.১. বিকল্প-১ : ইউনিয়ন পর্যায় থেকে সরকারের যে সব বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও খাতে রাজস্ব, ফি ও সেবামূল্য আদায় করে থাকে তাদের সবাইকে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা থেকে আহরিত অর্থের ২-৫ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব তহবিলে হস্তান্তর করতে হবে। এ বিভাগ বা সংস্থা বা দপ্তর ও খাত সমূহ হচ্ছে, বিদ্যুৎ বিল, সেল ফোন রাজস্ব, বিআরটিএকে দেওয়া যানবাহন কর, আয়কর ও ভ্যাটরাজস্ব, ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনকারী গভীর ও অগভীর নলকূপের রয়ালটি, নিকাহ নিবন্ধন

ফি, ভূমি রাজস্ব, ভূমি হস্তান্তর ফি, ডাকঘরের আয়, বিভিন্ন মামলায় আদায়কৃত আদালতের জরিমানা, ইত্যাদি।

২.২. বিকল্প-২ : প্রতিটি বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর খাতের উপর হস্তান্তরের এ জটিল দায় না চাপিয়ে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য সরকার জাতীয় রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের ৫ শতাংশ + ৫ শতাংশ = ১০ শতাংশ দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষণ করে তা স্থানীয় সরকার বিভাগের জিম্মায় দিবে। সরকার অর্থ, মন্ত্রিপরিষদ ও স্থানীয় সরকার এ তিন মন্ত্রণালয়-এ অর্থ একটি কমিটি বা কমিশনের সহায়তায় জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাসমূহে বণ্টন ও বরাদ্দ করে দিবে।

অন্যান্য অর্থায়ন উৎসসমূহ

২.৩. ইউনিয়নের সীমানায় বাস্তবায়নাধীন সরকারি সকল প্রকল্পের ৫ শতাংশ রয়ালটি ইউনিয়ন পরিষদ পেতে পারে। কারণ এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিষদ এ প্রকল্পসমূহের কারণে নানা সমস্যা মোকাবিলা করে থাকে এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নানাভাবে সহায়তা করে থাকে। এলাকায় অবস্থিত শিল্প ও ব্যবসার করপোরেট করের অংশ, ব্যাংক-বিমার লভ্যাংশের অংশ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকেও একইভাবে তাদের প্রকল্প, ক্ষুদ্র কর্জ বা দাদন ইত্যাদির রয়ালটি পরিষদকে দিতে হবে।

২.৪. সরকারের রাজস্ব বহির্ভূত বাজেট তথা উন্নয়ন বাজেটের ন্যূনপক্ষে ২ শতাংশ দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংরক্ষণ করে তা প্রকল্প প্রস্তাবের বিপরীতে বরাদ্দ করার বিধান করতে হবে।

২.৫. ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার অন্তর্গত হাট-বাজার, বালুমহল, পাথর মহল, ফেরিঘাট, বাসডিপো, ট্রাকডিপো, মেলা, প্রদর্শনী, সিনেমাসহ সকল বিনোদন ইত্যাদির প্রাপ্ত রাজস্ব একটি স্বচ্ছ নীতিমালার ভিত্তিতে সকল স্থানীয় পরিষদসমূহের সাথে ভাগাভাগি করে দিতে হবে।

৩. জন্ম নিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও এ সম্পর্কিত আপোষ নিষ্পত্তির দায়িত্ব ও-এর সকল ফি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার প্রাপ্য হবে।

৪. জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, আবাসিক, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সনদ দেওয়ার কর্তৃপক্ষ হবে গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ ও শহরে পৌর সভা ও সিটি করপোরেশন। এ কাজ করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

৫. ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম স্ব স্ব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পঞ্চবার্ষিক বা বার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত এবং সমন্বয়ে করতে হবে।

৬. ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নানা পরিপত্রের মাধ্যমে যখন তখন নানা নিয়ন্ত্রণ ও কর্মকাণ্ড চাপানোর প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। কোনো

সরকারি বিভাগের কোনো কাজ কোনো প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে হলে বা পরিষদের সংশ্লিষ্টতা বা সহযোগিতা প্রয়োজন হলে তা আগে আলোচনা বা সমঝোতা করে নিতে হবে। আর্থিক সংশ্লেষ থাকলে সে ব্যাপারে স্বচ্ছতার সাথে যৌথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৭. প্রতিটি পরিষদের স্বচ্ছতার সাথে বার্ষিক সরকারি অডিট নিশ্চিত করতে হবে। তবে পরিষদসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে নিবন্ধিত অডিট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবছরের স্ব স্ব অডিট সম্পাদন করে নিবে।

৮. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণের বিধান সম্বলিত আইনের ৩৪ ধারা অপপ্রয়োগ রোধ কল্পে আইনের এ অংশ সংশোধন ও যৌক্তিক করা প্রয়োজন।

৯. ইউনিয়ন পর্যায়ে 'গ্রাম আদালত' শিরোনামে যে আইনটি কার্যকর আছে, তাতে সত্যিকারের বিচার নিশ্চিত করা যায় না। গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, জনবল, জরিমানা, গ্রাম পুলিশ ও থানার সংশ্লিষ্টতা যৌক্তিকভাবে বাড়াতে হবে।

১০. ইউনিয়ন পরিষদের আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় থানার কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে 'কমিউনিটি পুলিশিং' ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে করতে হবে। থানার একজন সহকারী পুলিশ পরিদর্শককে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযুক্ত রাখতে হবে।

১. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ ও দায়িত্ব হবে সার্বক্ষণিক। সাথে একজন নারী সদস্য ও তিনজন সাধারণ সদস্য পরিষদের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবেন। এ পাঁচ জন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে বেতন-ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন। সরকার তাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তার সমপরিমাণ আর্থিক সম্মানী নির্ধারণ করবেন। বাকি আটজন সদস্য শুধুমাত্র সভায় যোগদানের ভাতা পাবেন। তবে প্রথম চার জন সদস্যের নিয়োগ হবে ইউনিয়যন পরিষদের পাঁচ বছর মেয়াদের ২০ মাস। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সকল সদস্যগণ ২০ মাসের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার এ সুযোগ পাবেন।

১২. ইউনিয়ন পরিষদ কল্যাণ ট্রাস্টের গঠন, কার্যপ্রণালি এবং তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন। ট্রাস্টের মাধ্যমে একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং দুস্থ সহায়তা বৃদ্ধি করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে এবং এ ট্রাস্টের সেবার আওতায় পরিষদের সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশসহ সকল কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

সামগ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণে ছয় দফা

১. একটি একীভূত ও সমন্বিত স্থানীয় সরকার আইন কাঠামো-দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আধুনিক, যুগোপযোগী ও জাতীয় সরকারের সহযোগী সেবা ও উন্নয়নের

দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একীভূত ও সমন্বিত একটি আইন কাঠামো প্রয়োজন।

[ব্যাখ্যা—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত (ইউনিয়ন পরিষদ), পঞ্চায়েত সমিতি (উপজেলা পরিষদ) ও জেলা পরিষদ একটি এক, অভিন্ন ও সমন্বিত আইনে গঠিত ও পরিচালিত হয়। একই দিনে একটি অভিন্ন তফসিলে নির্বাচনও হয়। তাতে একদিকে প্রতিষ্ঠান টেকসই, ব্যয় সাশ্রয়ী ও জবাবদিহিমূলক হয় এবং অপরদিকে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয় ও সহাযোগিতা বৃদ্ধি পায়।]

২. **সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন চাই :** [ব্যাখ্যা—রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের আদলে গঠিত সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংসদীয় পদ্ধতির সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপান্তর করা প্রয়োজন। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো জাতীয় সরকারের আদলে সংসদীয় পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করা হলে চেয়ারম্যান বা মেয়রকেন্দ্রিক একক নেতৃত্বের স্থলে প্রতিটি পরিষদে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। একটি একক তফসিলে একই সময়ে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে এবং এ নির্বাচন হবে সহজ, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী।]

৩. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পৃথক স্থানীয় সরকার ক্যাডার সার্ভিস চাই:** [ব্যাখ্যা—দেশে একটি 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' (Local Government Service) কাঠামো সূচনা করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনবল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য 'স্থানীয় সরকারের পৃথক ক্যাডার' সৃষ্টি করার প্রস্তাব বিবেচনা করার দাবি করছি। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইন ও পৌর আইনে এ বিধান রাখা হয়েছে।]

৪. **স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ বরাদ্দ করা হউক:** [ব্যাখ্যা—দেশের সামগ্রিক কর আহরণ ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করে দেশের কেন্দ্রিভূত রাজস্ব প্রশাসনের মাধ্যমে সকল কর ও রাজস্ব কেন্দ্রীয়ভাবে আহরিত হউক এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ বরাদ্দ করে একটি পরীক্ষামূলক সময়কাল নির্দিষ্ট করে পরবর্তীসময়ে স্থায়ীভাবে অর্থায়ন নীতি কাঠামো তৈরি করা হউক। ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে ঐ বরাদ্দের আকার ও পরিমাণ বাড়তে পারে এবং তা জাতীয় বাজেটের ৩০ শতাংশ এ উন্নীত হতে পারে।]

৫. **সংবিধানে স্থানীয় সরকারের গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করা হউক :** [ব্যাখ্যা-আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সুরক্ষার জন্য কোনো গ্যারান্টি ক্লজ নেই। ফলে এখানে স্থানীয় সরকারের আদল, কাঠামো, কার্যাবলি, অর্থায়ন, ইত্যাদি কোনো টেকসই রূপলাভ করছে না। ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করে স্থায়ীত্বশীল রূপ ও কাঠামো দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের স্থায়ীত্ব ও ধারাবাহিকতার জন্য স্থানীয় সরকারের কতিপয় মৌলিক বিষয়ে গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করার দাবি

করছি।]

৬. স্থায়ী স্থানীয় সরকার ও শাসন কমিশন (Local Government and Governance Commission) গঠন করুন। [ব্যাখ্যা—স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী রাখা এবং সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষায়িত সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্থায়ী 'স্থানীয় সরকার ও শাসন কমিশন' (Local Government and Governance Commission) গঠন করার দাবি করছি। এ কমিশন স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় উন্নয়নের উপর নিয়মিতভাবে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করে আইন, নীতিমালা, অর্থায়ন, পুরস্কার ও শাস্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে আধা-বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও সরকারকে বিশেষায়িত নীতি সহায়তা দিতে পারবেন।]

দাবি সমূহের যৌক্তিকতা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদ দেশের প্রাচীনতম জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর গড়পড়তা বয়স দেড়শো বছরের বেশি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃথক পৃথক আইন, নীতিমালা, সাংগঠনিক কাঠামো ও সেবা কাঠামো যুগোপযোগী নয়। আইনগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সাংগঠনিক কাঠামো , নির্বাচন পদ্ধতির ভিন্নতা ও নানা জটিলতা। নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যয় বহুল, অপচয়ী এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিনষ্টকারী। কাজের ক্ষেত্রসমূহ সাংঘর্ষিক বা রিপিটেটিভ। আন্তঃপ্রতিষ্ঠান কোনো পরিকল্পনা সমন্বয় কাঠামো নেই। নেই ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের মধ্যে পারস্পরিক কর্ম সম্পর্ক। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সবার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। এসব অর্থের বড় একটি অংশ পরিকল্পনাহীনভাবে ব্যয়ের কারণে অপচয় হয়। এ ব্যবস্থার অবসান করে স্থানীয় শাসনে গতি আনতে পারলে দেশের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক স্তিতিশীলতা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাবে। উপরে দেওয়া প্রস্তাবগুলো বিরাজিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আমূল ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। স্থানীয় সরকারের নানা স্তরের প্রতিনিধি, স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসক, স্থানীয় সরকারের গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে এ দাবিনামা প্রস্তুত করা হয়েছে। আশা করি দাবিগুলো আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হবে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

নিবেদক

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতির পক্ষে,
মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন গাজী (বিল্লাল)
০১ জুন ২০২২